চতুর্থ ভাগের সূচী।

নিরন্তর প্রকৃতির মলিনভাবেরই পরিচয় দিতেছে। কিন্তু এই মালিন্যের মধ্যে এমন উৎসাহ, এমন সজীবতা, এমন অধ্যবসায়সহকৃত প্রসন্নতা রহিয়াছে যে, তাহার অসীম শক্তিতে বারিধিবেষ্টিত একটী ক্ষুদ্রদ্বীপ পৃথিবীর ললাটমণিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সমাজচক্রের এইরূপ আবর্ত্তনে সাহিত্যের পূর্ব্বতন অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সমাজ যে ভাবে আকৃষ্ট হয়, সাহিত্য সাধারণতঃ তদনুরূপ ভাবেই সংগঠিত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে সাহিত্যও সমাজসংগঠনে সহায়তা করে। সমাজকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রতিভাশালী লেখক উক্ত অঙ্গের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে সমাজের যথোচিত উপকার হয়। কিন্তু সাধারণ সাহিত্য প্রধানতঃ সামাজিক রুচিস্রোতেই পরিচালিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড যখন বিলাসভাবে অবনত ছিল, উৎকট ভোগাভিলাষে ইংরেজ যখন সুনীতির বন্ধন শিথিল করিয়া ফেলিতেছিল, তখন ইংলণ্ডে প্রধানতঃ বিলাসবাসনার উদ্দীপক কবিতার প্রাধান্য ছিল। আবার ইংলণ্ড যখন আপনার প্রাধান্য ও স্বাধীনতার রক্ষার জন্য ভয়াবহ সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়াছিল, গভীর উচ্ছ্বাস ও আবেগের গম্ভীর তরঙ্গে লোকের হৃদয় যখন আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও কবিতার প্রাধান্য ইংলণ্ডের সাহিত্য হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। উদ্দীপনাময়ী কবিতা ও উৎসাহোদ্দীপক সঙ্গীত সে সময়ে সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ ছিল। লোকের হৃদয় কর্ম্মপ্রবণ ও ধর্ম্মানুরক্ত করিবার জন্য কবি তন্ময় হইয়া লিখিতেন। সমাজ এই কবিতাস্রোতে ভাসমান হইয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিত, সেইরূপ আপনার লক্ষ্যনির্ণয়েও সমর্থ হইয়া উঠিত। এখন এই সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে এখন লোকে অপরিসীম উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে। ইংলণ্ডের সাহিত্যে এখন কবিতার প্রাধান্য অন্তর্হিত ও গদ্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এলিজাবেথের ইংলণ্ড যেমন অ্যানের ইংলণ্ডের সদৃশ নহে, সেইরূপ অ্যানের ইংলণ্ডকে ভিক্টোরিয়ার ইংলণ্ডের সহিত এক শ্রেণীতে নিবেশিত করাও সঙ্গত নহে। পরিবর্ত্তনের যুগে ভিক্টোরিয়ার ইংলণ্ডে লোকের মানসিক ভাব যে বিষয়ের দিকে গিয়াছে, গদ্যপ্রধান সাহিত্যেও সাধারণতঃ সেই বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। সাহিত্যসেবকগণ এখন কর্ম্মনিষ্ঠ সমাজের তৃপ্তিসাধন জন্য অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতেছেন। বিষয়ী লোকে ক্ষণ কালের জন্য সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জনে আমোদ আহ্লাদের জন্য লালায়িত হয়। সমাজ যখন এইরূপ লালসাস্রোতে ভাসমান হইতে থাকে, তখনই বিবিধ উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত সময়ে ইংলণ্ডের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডের সাহিত্যও উপন্যাসপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

পক্ষান্তরে যাঁহারা সর্ব্বদা বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন, সংসারক্ষেত্রে নিরন্তর আপনাদের কর্ম্মশীলতা প্রদর্শন করেন, এবং কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া, যে কোন রূপে হউক, আপনাদের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থপাঠ করিতে পারেন না। বৈষয়িক ব্যাপারের আধিক্যে তাঁহাদের সময় সংক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে

সময় ও বিষয়ানুরাগ, উভয়ই বৃহৎ গ্রন্থপাঠের প্রতিকূল হইয়া উঠে। যে সকল বিষয়ের সহিত তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা সেই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে যত্ন প্রকাশ করেন। অধিকন্তু অল্প সময়ের মধ্যে নানা বিষয় পাঠ করিয়া তাঁহারা আপনাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিতেও সচেষ্ট হয়েন; সমাজের এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় ভিন্ন বিষয়ের দিকে সাহিত্যের গতি হয়। সাহিত্য এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনে নিশ্চেষ্ট থাকে না। এই চেষ্টার ফল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের শ্রীবৃদ্ধি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে ইংলণ্ডের সাহিত্যে এই তিনটি বিশেষ বিষয় ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের সাহিত্য গদ্যপ্রধান হইয়াছে। এই গদ্যপ্রধান সাহিত্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি পুষ্টিলাভ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ এই সাহিত্যে উপন্যাসের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। তৃতীয়তঃ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের উন্নতি হইয়াছে।

কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের এই পরিবর্ত্তন স্বতঃসংঘটিত হয় নাই। বিজ্ঞানে, শিল্পে ও সামাজিক বিষয়ে ইংলণ্ড অপর দেশের নিকটে ঋণী। ইংলণ্ড তাড়িত তত্ত্ব আমেরিকা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; মুদ্রাযন্ত্র হলণ্ডের নিকট লইয়াছেন; সামাজিক বিষয়েও ফ্রান্স ও জর্ম্মনীর মুখাপেক্ষী হইয়াছেন। সাহিত্যেও অপর দেশ হইতে ইংলণ্ডের সাহায্য লাভ হইয়াছে। দুইটি দেশ এ বিষয়ে ইংলণ্ডের সৌভাগ্যের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছে। এই দুই দেশ এক এক সময়ে ইংলণ্ডের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীতেও বিষয় বিশেষে ইংলণ্ডের উপর উহাদের প্রভুত্বের নিদর্শন অন্তর্হিত হয় নাই।

এই শতাব্দীতে চারি দিকে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রসারিত হওয়াতে ইউরোপের পরস্পর বিভিন্ন জনপদগুলি যেন এক কেন্দ্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নানা স্থানে কল কারখানা হওয়াতে ক্রমে শ্রমজীবিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। জনপদে জনপদে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে লোকের শিক্ষানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। প্রতি নগরে নানা বিদ্যার অনুশীলন হওয়াতে বিবিধ সভায় পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া গবেষণার পরিচয় দিতে উদ্যত হইতেছেন। নগরসমূহের বাহ্য সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হইয়াছে। নগরবাসিগণ বিদ্যায় ও সভ্যতায় লোকসমাজের স্পৃহনীয় হইতেছে। নগরসমূহ যেমন শিল্প ও বিজ্ঞানের সাহায্যে পূর্ব্বতন অবস্থা অতিক্রম করিয়া সৌভাগ্যসোপানে আরোহণ করিতেছে, জনপদবর্গও সেই রূপ আপনাদের মধ্যে জ্ঞানালোকের প্রসারণে কৃতসংকল্প হইয়া উঠিতেছে। পক্ষান্তরে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত ধনেরও বৃদ্ধি হইতেছে, সাধারণের অবস্থা উন্নত হইতেছে। নানা জনপদে পরিভ্রমণ ও জনপদবর্গের সহিত আলাপ করিয়া লোকে বহুদর্শী হইতেছে। ফরাসী, ইংরেজ, ইতালীয় ও জর্ম্মণ, পরস্পর মনোগত ভাবের আদান প্রদান করিতেছে। সেকেন্দর শাহের দিগ্বিজয় এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রাধান্যে যেমন গ্রীস, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছিল, সেইরূপ ফরাসী, জর্ম্মণ ইংরেজ প্রভৃতিও বহুকাল বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া ইউরোপীয় সমরের সংঘাতে পরস্পরের

আচার ব্যবহার ও মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছে। এইরূপে এক জনপদের সভ্যতার সংস্রবে অন্য জনপদে সভ্যতা প্রসারিত হইয়াছে। এক জনপদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান অন্য জনপদের সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। এক জনপদের সংঘর্ষে অন্য জনপদের রাজনীতিও পরিবর্ত্তনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। লোকে যেমন দার্শনিক তত্ত্বে অধিকতর অভিনিবেশ দেখাইতেছে, সেইরূপ সমাজতত্ত্বে ও রাজনীতিতে সমদর্শী হইতেছে। এক দিকে দার্শনিক ভাবে অপর দিকে সাম্য নীতিতে তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়াছে। এতদিন তাহারা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিতি করিতেছিল, দরিদ্রভাবে অবসন্ন হইতেছিল, অজ্ঞানান্ধকারে দিক্ নির্ণয়ে অসমর্থ ছিল, এখন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। তাহারা সাম্য নীতির প্রভাবে সমাজের নিম্নস্তর হইতে উন্নত স্তরে উঠিতে আগ্রহযুক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে জর্ম্মণী ও ফ্রান্স তাহাদের প্রধান পরিচালক। জর্ম্মণীর চিন্তাশীল লোকের হৃদয় হইতে যে ভাবপ্রবাহের উৎপত্তি হয় এবং ফ্রান্সের বিপ্লবপ্রয়াসী সমাজ হইতে যে রাজনীতির আবির্ভাব হয়, তাহাতে প্রায় সমগ্র ইউরোপ বিচলিত হইয়া উঠে। মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের এই দুই প্রবাহ দুই দেশ হইতে ইংলণ্ডে উপনীত হয়। উহার অভিঘাতে ইংলণ্ডের সাহিত্য ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও নবীকৃত হইয়া উঠে। উহাতে জনসন্ প্রভৃতির শব্দকাঠিন্য দূরীকৃত হয়, ফিল্ডিং প্রভৃতির উপন্যাসরচনাপ্রণালী সংস্কৃত হয় এবং ড্রাইডেন্ প্রভৃতির কবিতারচনারীতি ভিন্ন দিকে প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপে উহা ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লব না ঘটাইয়া, সমস্ত বিষয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন না করিয়া, ধীরে ধীরে ইংরেজী সাহিত্য নবীন ভাবে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে। কালক্রমে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব ইংরেজী সাহিত্য হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। জর্ম্মণীর সাহিত্যের শক্তিই ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে পরিস্ফুট হইতেছে। এই দার্শনিক ভাবময় বিপুল সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্যসংসারে ফরাসী সাহিত্যকে অপসারিত করিয়া উহার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। জর্ম্মণ সাহিত্যের ভাব ও রচনা-প্রণালী পর্য্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোলরিজ এই বিদেশী সাহিত্যের ভাব অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে কার্লাইল এই বিষয়ে স্বকীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

মহারাণীর রাজত্বে ইংরেজী সাহিত্যে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। এই সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যও গদ্যপ্রধান হইয়াছে, ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় বঙ্গীয় সাহিত্যেও উপন্যাসের প্রাধান্য ঘটিয়াছে এবং ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যেও সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের উন্নতি দেখা দিয়াছে। অধিকন্তু ইংলণ্ডীয় সাহিত্য যেমন ফরাসী ও জর্ম্মণ সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, বঙ্গীয় সাহিত্যও সেইরূপ ইংরেজী সাহিত্যের সাহায্যে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুকরণে অনেক সময়ে আত্মোৎকর্ষের পথ প্রশস্ততর হয়। পৃথিবীর অনেক উন্নতিশীল সাহিত্য অপর সাহিত্যের অনুকরণে পরিপুষ্ট হইয়াছে। এখন ইংরেজী সাহিত্যের

অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্যও পরিপুষ্টিলাভের চেষ্টা করিতেছে। ইংরেজী সাহিত্যের সমক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষুদ্রপ্রাণ শিশুর সদৃশ। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে এই ক্ষুদ্র প্রাণ শিশু মহাপ্রাণ হইবার জন্য পরিপুষ্টির বিষয়সংগ্রহে যেরূপ শক্তি দেখাইয়াছে, তাহা জগতের উন্নতির ইতিহাসের একটি প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। গদ্যপ্রধান বাঙ্গালা সাহিত্যে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধীয় যে সকল প্রবন্ধ বা গ্রন্থাদি প্রচারিত হইতেছে, এবং যে সকল উপন্যাস ভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে, তৎসমুদায় বাঙ্গালীর শক্তিমত্তার অগৌরবকর নিদর্শন নহে।

সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় কবিতার প্রাধান্য থাকে। প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গীয় সাহিত্যে যে কবিতাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই স্রোত অনেক স্থলে প্রসন্নভাবের পরিবর্ত্তে আবিলতায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। সারল্যে ও স্বাভাবিক ভাবে আধুনিক কবিতা প্রাচীন কবিতার উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে নাই। সাধারণতঃ এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, যে, আদিম অবস্থার কবিতা যেরূপ সরল, কোমল ও স্বাভাবিক ভাবোদ্দীপক হয়, আধুনিক অবস্থার কবিতা সেরূপ গুণসম্পন্ন হয় না। এই সিদ্ধান্তের মূলে কিয়দংশ সত্য আছে। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকায় একবার যাহা লিখিত হইয়াছিল, প্রবন্ধের বিষয় বিশদ করিবার জন্য এই স্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—"সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষ প্রায়ই কল্পনাপ্রিয় হইয়া থাকে। স্রোতস্বতী তরঙ্গিণী, সমুন্নত পর্ব্বত, সুচ্ছায় বৃক্ষ, অনন্ত নীল আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয় যেমন এক দিকে তাহার কল্পনার লীলাস্থল হয়, মহত্তর বা নিকৃষ্টতর মানবচরিত্রও সেইরূপ তাহার রসময়ী কবিতার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। এই অবস্থার কবিতা প্রায়ই উদ্দীপনা, উদ্ভাবনা প্রভৃতি গুণে উৎকর্ষ লাভ করে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি উন্নতি লাভ করে বটে, কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধিতে অনেক সময়ে কবিতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না। বাল্মীকি বা হোমর যাহা দেখেন নাই, কল্পনাবলে যাহা ভাবিতে পারেন নাই, বৈজ্ঞানিক বা গণিতজ্ঞের ক্ষমতায় তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। কিন্তু বাল্মীকি বা হোমর কাব্যজগতে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, আজি পর্য্যন্ত কেহই সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই। আদিম অবস্থা মানুষকে অধিকতর সরল এবং তাহার ভাষাকে অধিকতর কবিত্বময় করে। কোমলমতি বালক যখন নীতিশিক্ষার জন্য হিতোপদেশে পথিক ও ব্যাঘ্রের কথা পাঠ করে, তখন ব্যাঘ্রের সেই ভয়ঙ্কর ভাব, সেই বলবতী জীবহিংসাপ্রবৃত্তি, তাহার স্মৃতিপটে নিরন্তর জাগরূক থাকে। ব্যাঘ্রের কথায় তাহার কল্পনা নিরন্তর উদ্দীপিত হইতে থাকে। তাহার বাসগ্রামে ব্যাঘ্র না থাকিলেও এবং সে উহার ভীষণ মূর্ত্তির সহিত পরিচিত না হইলেও, সর্ব্বদাই তাহার মনে হয়, ব্যাঘ্র যেন মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। শিশু যেমন কল্পনাতরঙ্গে আন্দোলিত হয়, সমাজের আদিম অবস্থায় কোমলমতি মানুষও সেইরূপ কল্পনাস্রোতে ভাসমান হইয়া

থাকে। মানুষ সভ্যতার দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার চিন্তাশীলতার সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক ভাবের বৃদ্ধি হয়। তখন সে সরলহৃদয় ভাবুক না হইয়া, প্রগাঢ় চিন্তাশীল দার্শনিক হইয়া উঠে।

"কিন্তু আদিম অবস্থায় সকলেই প্রকৃত কবিত্বের অধিকারী হইতে পারে না। প্রতিভা সকলকে কাব্যজগতের আধিপত্য প্রদান করে না। * * * পূর্ব্বতন অবস্থায় মানুষের ভাষা কবিত্বময় হইলেও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাই প্রকৃত কবি বলিয়া সম্মানিত হয়েন। কবি লোকের সমক্ষে মায়া বিস্তার করেন। এক জন প্রসিদ্ধ লেখক ছায়াবাজীর সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন। অন্ধকারময় গৃহে ছায়াবাজী যেমন দর্শকের সমক্ষে নানা দৃশ্য বিস্তার করে, অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে কবিতাও সেইরূপ মায়া দেখাইয়া লোকের হৃদয় উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলে। আলোকের সঞ্চারে ছায়াবাজীর কৌশল যেমন ক্রমে অন্তর্হিত হয়, সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে জ্ঞানালোকের প্রসারণে কাব্যজগতের সেই চিত্তবিমোহিনী মায়াও ক্রমে অপগত হইতে থাকে। যাহা হউক, সভ্যতার অপূর্ণ অবস্থায় উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি হইলেও যে, সভ্যতার পূর্ণ অবস্থায় কবিতার উৎকর্ষ সাধিত হয় না, এমন নহে। প্রতিভা সহায় হইলে মানব উন্নত অবস্থাতেও কবিত্বশক্তির সবিশেষ পরিচয় দিতে পারে। সভ্যযুগে এমন অনেক কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তৎসমুদয় অদ্যাপি সাহিত্যভাণ্ডারে অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে, এবং যাঁহাদের প্রতিভাগুণে সেই সকল কাব্য পাঠকের হৃদয় অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসোচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত করিতেছে, তাঁহারা অদ্যাপি সমগ্র কবিসমাজে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মিল্টনের ন্যায় কোন কবি সহৃদয়সমাজে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু সভ্যতার আদিম অবস্থায় মিল্টনের আবির্ভাব হয় নাই। মিল্টন সভ্যযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার সুশিক্ষা লাভ হইয়াছিল। লাটিনে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি ইউরোপের নানা দেশে পরিভ্রমণপূর্ব্বক বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনপদের পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিয়া, সংগৃহীত জ্ঞানের সম্প্রসারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইউরোপের প্রচলিত ভাষায় তাঁহার যথোচিত অধিকার ছিল। তিনি দার্শনিকভাবে সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; দার্শনিকভাবে তৎসমুদয়ের আলোচনা করিতেন, দার্শনিক তত্ত্বের সহিত সুগভীর রাজনীতির পরিচয় দিয়া লোকের হৃদয় চমকিত করিয়া তুলিতেন। এইরূপ সভ্যতার অবস্থায়, সভ্যযুগের অনুমোদিত এইরূপ সুশিক্ষায়, রাজনীতি ও দার্শনিক ভাবের এইরূপ জটিলতায়, মিল্টনের প্রতিভা সঙ্কুচিত হয় নাই। মিল্টন যে মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সমগ্র কাব্যজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছে।"

সভ্যতার উৎকর্ষে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক জ্ঞানের প্রাধান্যে বাঙ্গালা কাব্য যে, উন্নতভাব বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহা নহে। প্রতিভাশালী বাঙ্গালী কবি বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য

কাব্যের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার কল্পনা ও ভাবসংগ্রহের সহায় হইয়াছে। তিনি পাশ্চাত্য ভাবের সহিত স্বদেশীয় ভাবের তুলনা বা সামঞ্জস্যরক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কয়েক খানি উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তৎসমুদয় আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষায় অসমর্থ হয় নাই। ভাবের গাম্ভীর্য্যে, বর্ণনার বৈচিত্র্যে, কল্পনার উচ্ছ্বাসে মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহার, পলাশীরযুদ্ধ বা স্বপ্নপ্রয়াণ প্রভৃতি কাব্য উন্নত সাহিত্যের অযোগ্য বিষয় নহে। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনা বাঙ্গালার প্রতিভার প্রধান নিদর্শন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত হইয়া, কবি এইরূপে স্বকীয় প্রতিভা দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ বিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালার যে সকল কবি কল্পনাবিভবে বা চরিত্রাঙ্কনে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যই অনেক সময়ে তাঁহাদের প্রধান পথপ্রদর্শক হইয়াছে। তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রদর্শিত পথে পদার্পণ করিয়া যেখানে চিত্তসংযমের পরিচয় দিয়াছেন, সেই খানেই তাঁহাদের কবিতা জাতীয়ভাবে হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। মেঘনাদবধকার অসামান্য প্রতিভাশালী হইয়াও চিত্তসংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি সংসারে যেমন উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইয়াছেন, অমৃতময়ী বাগ্‌দেবীর আরাধনা স্থলেও সেইরূপ অসংযতভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। কল্পনা তাঁহাকে সর্ব্বদা অনেক উচ্চতর ও অভাবনীয় বিষয়ের দিকে লইয়া যাইত। গম্ভীর ভাব সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় তাঁহার কার্য্যসাধনে নিয়োজিত হইত। বর্ণনা বৈচিত্র্য সর্ব্বদা তাঁহার আনুগত্যস্বীকারে প্রস্তুত থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তিনি শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও স্বকীয় মহাকাব্যে জাতীয় ভাবের সম্মানরক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলতঃ আধুনিক কবিগণ আপনাদের কাব্যে যথোচিত ক্ষমতা প্রকাশ করিলেও সরল ও স্বাভাবিক ভাবে প্রাচীন কবিকুলের নিম্নগণ্য হইয়াছেন। এ অংশে চিরদরিদ্র মুকুন্দরামকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান কালে যে সকল কবি জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের কাব্যই বাঙ্গালা সাহিত্যে আদর লাভ করিয়াছে। এই সকল কাব্যের সংখ্যা অধিক নহে। বিক্টোরিয়ার রাজত্বে ইংরেজী সাহিত্য যেরূপ কাব্যপ্রধান হয় নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যও সেইরূপ কাব্যপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই। কল্পনাবৈচিত্র্য থাকিলেও সারল্য, মাধুর্য্য ও স্বাভাবিক ভাবের অভাবে ইদানীন্তন বাঙ্গালা কাব্য পূর্ব্বতন কাব্যের নিকটে নিঃসন্দেহ পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

যাহা হউক, বিক্টোরিয়ার রাজত্বে গদ্য সাহিত্যের উন্নতিই বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এই ঘটনার জন্যই বিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিক্টোরিয়ার রাজত্বের পূর্ব্বে যে সকল গদ্যগ্রন্থ প্রণীত ও প্রকাশিত হইত, তৎসমুদয়ের রচনা উৎকৃষ্ট ছিল না। উৎকট ও অযথাভাবে সন্নিবেশিত শব্দের আড়ম্বরে উহা শ্রুতিকঠোর হইত। মহারাণীর রাজ্যভার গ্রহণের প্রায় ৩৬।৩৭

বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থের প্রচার হয়। এই সময় হইতে ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে গদ্যরচনা করিতে থাকেন। এই সময়ের গদ্য কিরূপ ছিল নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে—

"দ্বাপর যুগান্তে ভারতবংশে অভিমন্যুসন্ততি মহারাজা পরিক্ষিত সাধু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্ব প্রকারেতে শিষ্ট। এক দিবস মৃগয়াতে কার্য্যক্রমে অমাত্য ও সেনাগণের সঙ্গ হইতে ভিন্ন হইয়া দৈবে দূর বনপ্রবেশ করিয়াছিলেন; অত্যন্ত শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল না পাওয়াতে বিব্রত জল অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল এক রম্যস্থল, কিন্তু জল নিকটের মধ্যে দেখেন না; একজন মৌনব্রতে বসিয়াছে, তাহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে উত্তর না পাইয়া কোপান্বিত হইয়া সেই স্থানে মৃতসর্প ছিল, তাহা সেই মুনির গলায় বেষ্টন করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। সে মুনির পুত্র আসিয়া পিতার বিগতি দেখিয়া উষ্মায় উষ্মাবিত হইয়া জল হস্তে করিয়া শাপ দিল, যেজন মৃতসর্প আমার পিতার গলায় জড়াইয়াছে, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তাহাকে তক্ষক কালসর্প দংশুক। পশ্চাৎকাল বিদিত হইল সে ব্যক্তি ছিল রাজা পরিক্ষিত।" (লিপিমালা।)

এই গদ্য রচনা উৎকৃষ্ট রীতির অনুমোদিত নহে। এই সময়ে যে সকল গদ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের মধ্যে রচনার প্রাঞ্জলতার জন্য একখানি অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একাংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় শিবনিবাসের বাটীতে মহাহর্ষে বিশ্রাম করিতেছেন; সর্ব্বদা আনন্দিত, পুরবাসিরা সর্ব্বক্ষণ উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত, নানা দেশীয় গুণবান্ ব্যক্তি আসিয়া রাজসভায় বসিয়া গুণের পরীক্ষা দিতেছেন; পণ্ডিতেরা ছাত্র সমভিব্যাহারে রাজার নিকটস্থ হইয়া শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন; এই প্রকার প্রত্যহ হইতেছে। দ্বিতীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সভা, সকলেই মহারাজকে প্রশংসা করে, দিনে দিনে রাজ্যের বৃদ্ধি এবং প্রজার বাহুল্য হইতেছে। রাজার পাঁচ পুত্র, কোন অংশে ত্রুটী নাই, যাবদীয় লোক সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে, কিন্তু নবাব সেরাজেরদৌলা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়াছে; মহারাজ চিন্তান্বিত আছেন, দেশাধিকারী দুর্বৃত্ত, কখন কি করে? মধ্যে মধ্যে পণ্ডিতদিগের প্রতি আজ্ঞা করেন, দেখ, দেশাধিকারী দুর্বৃত্ত, আপনারা সকলে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করুন যে দুষ্ট অধিকারী এদেশে না থাকে; কিন্তু অতি গোপনে আরাধনা করিবা, কদাচ প্রচার হয়। এইরূপে নিজ রাজ্যে বাস করিতেছেন।" (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র।)

এই রচনা সরল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের গদ্য রচনার তুলনায় এই রচনাও অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইবে। যাহা হউক, পূর্ব্বে এইরূপ রচনাই প্রশংসনীয় ছিল। সমালোচকগণ এক সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রকারকে বাঙ্গালার আডিসন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। পরবর্ত্তী গদ্যলেখকগণ প্রায় এইরূপ প্রণালীতেই গদ্য লিখিতেন। লিপিমালায় গদ্য, রাজাবলিতে এবং বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় বা সংবাদকৌমুদীতে উৎকর্ষ লাভ করে বটে,

কিন্তু ঐ গদ্যরচনাও তাদৃশ ললিত, কোমল, মধুর বা ওজস্বিতাসম্পন্ন ছিল না। মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজ্যভার গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ও পরে যে গদ্য রচনার প্রচার হয়, তাহাতে অনুপ্রাস ও যমকেরই প্রাধান্য ছিল। প্রথম অবস্থায় লোকে প্রায়শঃ অনুপ্রাসময়ী রচনার পক্ষপাতী হইয়া থাকে। তাহারা উচ্চতর বিষয়ের দিকে যাইতে পারে না। গভীর ভাব সাগরে নিমজ্জিত হইতেও তাহাদের সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু তাহারা এক উচ্চারণের ও এক শ্রেণীর কথাগুলি পরস্পর গ্রথিত দেখিলে আমোদিত হয়। এই জন্য রচনাকার লোক রঞ্জনার্থে অনুপ্রাসের আড়ম্বর করিয়া থাকেন। প্রভাকর-সম্পাদকের গদ্যরচনা এইরূপ ছিল। প্রভাকরে প্রায়শঃ এইরূপ গদ্য দেখা যাইত—

"এই চিত্র চিত্র কোন্ চিত্রে কি চিত্র করিয়াছে? এ চিত্র, এ চিত্র কি চিত্র! অতি বিচিত্র। যিনি ইহার কারক, তাঁহার কি আশ্চর্য্য চিত্র শক্তি! সেই শিক্ষক মহাশয়ের লিপি-নৈপুণ্য কত ব্যাখ্যা করিব? লেখনী লেখনে অশক্ত, বর্ণনে বর্ণাবলী বর্ণবিহ্বলা, কথনে কবিত্ব অসমর্থ।" (সংবাদপ্রভাকর। ১২৬০ সাল।)

এই সময়ের আর এক শ্রেণীর গদ্যেরও কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

"চিত্তবৃত্তি অদৃষ্ট পদার্থ যাহার দ্বারা দৃষ্টাদৃষ্ট যাবৎ পদার্থ প্রকাশ পায়, তাহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি গোমহিষ্যাদিরো আছে, কিন্তু তাহাদিগের বুদ্ধি কেবল আহার নিদ্রাদি বিষয়ে থাকে। মনুষ্যের বুদ্ধি দৃষ্টাদৃষ্ট যাবদীয় পদার্থ বিষয়ে দীপ্তি পায়, আর চক্ষুরাদির অতীত যে পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বলোকে মনুষ্য দেহকে উত্তম কহিয়াছেন। এই বুদ্ধি ব্যক্তিবিশেষে কোন দোষবশতঃ স্থূলা, গুণবিশেষপ্রযুক্ত সূক্ষ্মা হয়েন, সেই সূক্ষ্মতা যাহার দ্বারা হয়, তাহাকে উপায় বলা যায়। এই বুদ্ধিকে মনুষ্য গোমহিষ্যাদি আধারের বিভিন্নতায় নানা কহিয়া থাকেন, ফলতঃ সর্ব্বসাধারণেরই এক, যেমত এক বায়ুকে শরীরের মধ্যে স্থান বিশেষে স্থিতিহেতু প্রাণবায়ু উদান বায়ু ইত্যাদি নানাপ্রকার বলা যায়, তাহার ন্যায় এক বুদ্ধিকে আধার ভেদে নানা কহিয়া থাকেন।" (জ্ঞানার্ণব।)

বিক্টোরিয়ার রাজ্যভার গ্রহণের পর বাঙ্গালা গদ্যের যখন এইরূপ অবস্থা ছিল, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে দুইটি প্রতিভাশালী পুরুষ আবির্ভূত হয়েন। ইঁহাদের প্রতিভাবলে বাঙ্গালা গদ্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়। যাহা নির্জ্জীব ও নিস্তেজ ছিল, শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় যাহা রসহীনতার পরিচয় দিতেছিল, তাহা সজীব ও সতেজ হয়, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা কুসুমস্তবকযুক্ত ও শ্যামল পত্রাবলিপরিবৃত বালতরুর ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই দুই জন প্রতিভাসম্পন্ন সুলেখক সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতিসাধনে অগ্রসর হয়েন। ইঁহাদের রচনা সংস্কৃত শব্দবহুল হইলেও উহা মাধুর্য্যে বা লালিত্যে বিসর্জ্জন দেয় নাই। ইঁহারা এমন সুকৌশলে শব্দবিন্যাস করিয়াছেন, এমন সুনিয়মে প্রত্যেক বাক্যের অর্থ পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন, এমন সুশৃঙ্খলার সহিত রচনার ক্রমোৎকর্ষ

দেখাইয়াছেন যে, ইঁহাদের গদ্য সর্ব্বপ্রকারে উৎকট ভাবের সম্পর্ক শূন্য হইয়াছে। এইস্থলে ইঁহাদের প্রত্যেকের সংস্কৃত শব্দবহুল রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

"ব্রাহ্মণ, আসন পরিগ্রহ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন; যিনি, এই জগন্মণ্ডল প্রলয় জলধি-জলে নিলীন হইলে, মীনরূপ ধারণ করিয়া, ধর্ম্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন; যিনি, বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা, প্রলয়জলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন; যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া, পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন; যিনি, নৃসিংহের আকার স্বীকার করিয়া, নখকুলিশ প্রহার দ্বারা বিষম [illegible] হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন; যিনি দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত ব[illegible] অবতার হইয়া, দেবরাজকে পুনর্ব্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্ব সংস্থাপিত করিয়াছেন; যিনি, জমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া, তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা, মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ভুজবনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন; যিনি, দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে, দশরথগৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া, বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে, সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক, দুর্ব্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন; যিনি, দ্বাপর যুগের অন্তে, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া, দৈত্যবধদ্বারা ভূমির ভার হরিয়া, অশেষ প্রকার লীলা করিয়াছেন; যিনি দেবমার্গ বিপ্লাবনের নিমিত্ত, বুদ্ধাবতার হইয়া দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন; যিনি সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া, ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া, করতলে করাল করবাল ধারণপূর্ব্বক, বেদবিদ্বেষী, ধর্ম্মমার্গপরিভ্রষ্ট, নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন; সেই ত্রিলোকীনাথ, বৈকুণ্ঠস্বামী ভূতভাবন ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।" (বেতালপঞ্চবিংশতি।)

অপর লেখকের রচনা;—

"তাঁহারা কি শুভ দিনে ও কি শুভক্ষণেই সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তরকালে যে অত্যুন্নত অতি দুর্ল্লভ গৌরব পদে অধিরোহণ করেন, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনীজনিত কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে, তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারতভূমিতে সমারূঢ় হয়। যে পরমার্থ বিমিশ্রিত বিদ্যাবলী জলদাম্বুবিদ্ধ পৌর্ণমাসী রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটী অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজালবৎ অদ্ভুত বিদ্যা অবলীলাক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালের বৃত্তান্ত এক কালেই বর্ণন করিতেছে এবং জাহ্নবীজলপবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রাসলিল সুশীতল অবন্তিকায় অতি বিস্তৃত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে,

তাহার আদিম স্থত্র ঐ দিনেই ভারতরাজ্যে পতিত হয়। আরোগ্যরূপ অমূল্যরত্নের আকর স্বরূপ যে আয়ুঃপ্রদ শুভকর শাস্ত্র আবহমানকাল স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় অসংখ্য লোকের রোগজীর্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডলকে স্বাস্থ্যগুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে এবং কোটি কোটি জনের উৎপদ্যমান শোকসন্তাপ ও পতনোন্মুখ বৈধব্যবিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ বিশেষের শক্তিযোগে কখন কখন প্রভাববতী ইউরোপীয় চিকিৎসাকেও অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারতক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমপ্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছে এবং সেদিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ শূরশেখর শিখজাতির হৃদয়চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া অত্যদ্ভুত অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্যভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবলপরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা এক হস্তে হলযন্ত্র ও অপর হস্তে রণশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহপালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছেন, ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়। ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমনপদবীতে আম্রশাখাসমন্বিত সলিলপূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি ও সেই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদিগের পাদাম্বুজরজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।" (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথমভাগ।)

এই রচনার অর্থপরিগ্রহে কোন কষ্ট হয় না। ইহা যেরূপ সুপরিস্ফুট, সেইরূপ হৃদয়াকর্ষক। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে যখন এইরূপ রচনার আবির্ভাব ঘটিল, তখন ঐ সাহিত্য ক্রমোন্নতিপথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাঁহাদের অসীম ক্ষমতায় এই উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল, তাঁহারা উত্তরকালে সাহিত্যের পরিচর্য্যায় উদাসীন থাকেন নাই। যে প্রতিমার দেহ নয়নের অতৃপ্তিকর মৃত্তিকাস্তূপমাত্র ছিল, তাঁহাদের কৌশলে উহা সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহারা দেবপ্রতিমা সুগঠিত করিয়াছেন এবং যথাযথ বর্ণে উহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এখন সংযতচিত্ত সাধকগণ এই প্রতিমার সমক্ষে ভক্তিভরে অবনতমস্তক হইতেছেন এবং ইহার অনন্ত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, সৌন্দর্য্যসাধক সেই মহাপুরুষদ্বয়ের প্রজ্ঞাময়ী প্রতিভার পূজা করিতেছেন। বেতালপঞ্চবিংশতির রচনা শকুন্তলা ও সীতার বনবাসে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। উপাসক সম্প্রদায়ের রচনা সকল স্থলেই অপূর্ব্ব ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিয়াছে। ফলতঃ একজনের রচনা যেরূপ কোমল, অপর জনের রচনা সেইরূপ ওজস্বী। উভয়েই মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সাহিত্যক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং উভয়েই বিবিধতত্ত্ব প্রচার করিয়া, শিক্ষার পথ প্রশস্ততর করিয়াছেন। উভয়েই বিশেষ বিশেষ গুণে চিরবরণীয়। একজনের বিশেষত্ব তাঁহার গ্রন্থের রচনা এবং বিশুদ্ধ বর্ণপাতে অভিজ্ঞতা—অপর জনের বিশেষত্ব তাঁহার গ্রন্থে জ্ঞানের গভীরতা এবং

হৃজ্ঞের বিজ্ঞান ও পুরাবৃত্তের আলোচনা। একজন শাস্ত্রীয় বিচারে আপনার বহুদর্শিতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন; অপর জন দুশ্চিকিৎস্য রোগে নিতান্ত জীর্ণ হইয়াও, পুরাতত্ত্বের বর্ণনায় যে ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে মিল্টন বা স্কটের ক্ষমতাকেও অধঃকৃত করিয়াছে।

বঙ্গের এই দুইজন শ্রেষ্ঠ লেখকের প্রাধান্তকালে একটি মনস্বী পুরুষ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইনি বাঙ্গালা গদ্যে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিয়া, ভিন্নপ্রণালীতে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ইঁহার রচনায় সংস্কৃত শব্দমালার সমাবেশ নাই। চিরপ্রচলিত সরল কথার প্রয়োগ ইঁহার গদ্যের বিশেষত্ব। কাদম্বরীর অনুবাদে যেমন সংস্কৃতানুসারিণী রচনার প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে; ইঁহার রচনাতেও সেইরূপ নিত্যব্যবহার্য্য কথার প্রাধান্য রহিয়াছে। ইঁহার গদ্য রচনা এইরূপ—

"সূর্য্য অস্ত না হইতে হইতে বোট দেওয়ানজীর ঘাটেতে গিয়া লাগিল। বাবুরাম বাবুর শরীরটী কেবল মাংসপিণ্ড—চারিজন মাজিতে কুঁতিয়া ধরাধরি করিয়া উপরে তুলিয়া দিল। বেণীবাবু কুটুম্বকে দেখিয়া "আস্তে আজ্ঞা হউক বস্তে আজ্ঞা হউক" প্রভৃতি নানাবিধ শিষ্টালাপ করিলেন। বাবুর বাটীর চাকর রাম তৎক্ষণাৎ তামুক সাজিয়া আনিয়া দিল। বাবুরাম বাবু ঘোর হুঁকারি, দুই এক টান টানিয়া বলিলেন, হুঁকাটা পিসে পিসে বল্‌ছে—খুড়া খুড়া বল্‌ছেন না কেন? বুদ্ধিমান লোকের নিকট চাকর থাকিলে সেও বুদ্ধিমান্ হয়। রাম অমনি হুঁকায় ছিট্‌কা দিয়া—জল ফিরাইয়া—মিটেকড়া তামাক সেজে—বড় দেখে নল করে হুঁকা আনিয়া দিল। বাবুরাম বাবু হুঁকা সম্মুখে পাইয়া একেবারে যেন ইজারা করিয়া লইলেন—ভড়র ভড়র টান্‌ছেন—ধুঁয়া বৃষ্টি করছেন—ও বিজর বিজর বক্‌ছেন।"

(আলালের ঘরের দুলাল।)

এইরূপ ভাষা সামান্য বিষয়ের বর্ণনার বিশেষ উপযোগী। এ অংশে বাঙ্গালা গদ্য আলালের ঘরের দুলালকারের রচনায় উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু গভীর বিষয়ের বর্ণনায় এইরূপ ভাষা দ্বারা কোন উপকার লাভ হয় না, যেখানে বর্ণনায় বৈচিত্র্য রক্ষা করিতে হয়, উদ্দীপন বা ওজোগুণের পরিচয় দিতে হয়, সেখানে আলালের ঘরের দুলালের ভাষার আশ্রয় লইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। ঈদৃশ স্থলে সংস্কৃতানুযায়িনী রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু সবিশেষ কৌশলের সহিত সংস্কৃত শব্দের বিন্যাস না করিলে রচনা প্রায়ই প্রসাদগুণ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। সীতার বনবাস, শকুন্তলা বা চারুপাঠের রচনায় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের উপকার হইয়াছে। কিন্তু কাদম্বরীর অনুবাদে বাঙ্গালা গদ্য তাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। আলালী ভাষাতেও গদ্যরচনার সমুদয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, যেহেতু ঐ রচনা ভাষার গাম্ভীর্য্য রক্ষার অনুকূল হইয়া উঠে নাই। পরবর্ত্তী সময়ে আলালী ভাষার উন্নতি সাধন হয়। একজন প্রতিভাশালী সুলেখক সংস্কৃতের আশ্রয়ে এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার বঙ্গদর্শনে তদীয় অসামান্য প্রতিভা পরিস্ফুট হয়। বঙ্গদর্শনের

সময় হইতে এই প্রতিভায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালী ভাষার মিশ্রণে একটি প্রাঞ্জল ও মনোমত ভাষা উৎপন্ন হইয়া, সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির সহায় হইয়া উঠে। এই কার্য্য সম্পাদনে আর এক জন ক্ষমতাশালী লেখক বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহোদয়ের প্রধান সহায় হয়েন। বঙ্গদর্শনের আশ্রয়ে ইঁহার লিপি-ক্ষমতার বিকাশ হয়, বঙ্গদর্শনসম্পাদকের প্রতিভায় ইঁহার প্রতিভা দীপ্তিশালিনী হয়, বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের রচনার সহিত ইঁহার রচনাও একশ্রেণীতে নিবেশিত হয়। এইরূপ রচনানৈপুণ্য দেখাইয়া, ইনি অভিনবপথে ভাষার পরিচালনা বিষয়ে বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়েন। ইঁহার মহীয়সী সাধনায় বঙ্গদর্শনসম্পাদকের উদ্দেশ্য সফল হয়। বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতির ইতিহাসে ইঁহার নামও বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের নামের সহিত গ্রথিত থাকিবে। ইঁহার মহৎ কার্য্য বঙ্গদর্শনের সহিতই শেষ হয় নাই। শেষে ইনি নবজীবন প্রচার করিয়া, হিন্দুর পূর্ব্বতন গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যত্নশীল হয়েন।

বাঙ্গালীভাষার সম্প্রসারণ ও ক্রমোৎকর্ষ সাধনের সহিত আর একজন ক্ষমতাশালী লেখক ভাষার পরিপুষ্টি-বিধানে অগ্রসর হয়েন। ইনি সর্ব্বাংশে বেতালপঞ্চবিংশতি বা চারুপাঠের রচনারীতি অবলম্বন না করিয়া উভয় দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। সংস্কৃত শব্দাবলীর সহিত অসংস্কৃত শব্দমালার সামঞ্জস্য হওয়াতে ইঁহার রচনা প্রণালী দ্বারা ভাষার উদ্দীপনা বৃদ্ধি হয়, এবং ভাষা সংকীর্ণভাবে আবদ্ধ না হইয়া সম্প্রসারিত ক্ষেত্রের বিমুক্ত পথে অতিবেগে ধাবিত হইতে থাকে। বান্ধব-সম্পাদকের প্রতিভায় এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয়। বান্ধব উন্নতভাবের অবতারণা করিয়া সাহিত্যকে যেমন উন্নতিপথে পরিচালিত করিয়াছে, উদ্দীপনাময়ী ভাষা দ্বারাও সেইরূপ উহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা গদ্যের এইরূপে পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। লিপি-মালা প্রভৃতির ভাষা এইরূপে বিভিন্ন লেখকের প্রতিভায় সংস্কৃত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করে, উন্নত ভাষার সহিত উন্নত ভাবও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের সহায় হইয়া উঠে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বিক্টোরিয়ার অধিকারে বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতির সহিত বাঙ্গালা সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্রাদির উন্নতি হয়। সাময়িক পত্রের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অসামান্য উপকার হইয়াছে। পুরাবৃত্তে ও বিজ্ঞানে যিনি সবিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়া সহৃদয় পাঠকবর্গের বরণীয় হইয়াছেন, যাঁহার ওজস্বী রচনার পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তিনি যখন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হয়েন, তখন ঐ পত্রিকায় গম্ভীর ভাবে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা হইতে থাকে এবং উহার ভাষা বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগিনী হইয়া উঠে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পর যে সকল সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হয়, তৎসমুদয়ের মধ্যে বিবিধ বিষয়ের বর্ণনায় বিবিধার্থসংগ্রহ প্রাধান্য লাভ করে। ভাষার তাদৃশ মাধুর্য্য না থাকিলেও এবং উদ্দীপনা ও ওজস্বিতায় উহা তাদৃশ অলঙ্কৃত না হইলেও ইতিহাস, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য নানা বিষয় থাকাতে বিবিধার্থসংগ্রহ আজ পর্য্যন্ত জ্ঞান

রত্নের ভাণ্ডার বলিয়া সম্মানিত হইতেছে। ইহার পর সাময়িক পত্র ভিন্ন পথে পদার্পণ করে। এ পর্য্যন্ত সাময়িক পত্রের বিষয়গুলি প্রধানতঃ ইংরেজী হইতে সঙ্কলিত হইত। কিন্তু বঙ্গদর্শন এইরূপ সঙ্কলন কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উদ্ভাবনার পরিচয় দেয়। উহা অভিনব প্রণালীতে ভাষার সংগঠন বিষয়ে যেরূপ যত্নশীল হয়, ভাবের গভীরতা সাধনে ও বর্ণনীয় বিষয়ের নূতনত্ব রক্ষাতেও সেইরূপ তৎপর হইয়া উঠে।

যিনি বঙ্গদর্শনের প্রকাশ করেন, তিনি সাহিত্য সংসারে অসীম শক্তিমত্তা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভায় উৎকৃষ্ট উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার ক্ষমতায় বিভিন্ন অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পাঠক সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যে বঙ্গভাষা জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীর ন্যায় প্রসন্নভাবে হাস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদর্শনের আশ্রয়ে অনেক ভাবুক ব্যক্তি রচনা কৌশলে অভ্যস্ত হয়েন। তাঁহাদের মাতৃভাষার পরিচর্য্যার ফল অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হয়েন। স্বদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের রত্নরাশির সংগ্রহেও ইঁহাদের যত্ন ও অধ্যবসায় পরিস্ফুট হয়। ইঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত স্বদেশীয় জ্ঞানের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করেন, তৎসমুদয় এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। বঙ্গদর্শন হইতে এক দিকে যেমন উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও রহস্য প্রধান গ্রন্থাবলীর উদ্ভব হয়, অপরদিকে সেইরূপ সমাজ-সমালোচন ও নানা প্রবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক পুস্তক প্রচারিত হইয়া সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকে। বঙ্গদর্শন হস্তান্তরিত হইলেও উত্তর কালে উহা হইতে যে উৎকৃষ্ট সমালোচনার উৎপত্তি হয়, তদ্দারা সাহিত্য মহিমান্বিত হইয়াছে। ইউরোপে সেক্‌শীয়রের যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে; বাঙ্গালার শকুন্তলা-তত্ত্ব সর্ব্বাংশে তৎসমুদয়ের গৌরবস্পর্দ্ধী হইতে পারে।

বঙ্গদর্শনের সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের অনির্ব্বচনীয় জীবনীশক্তি লক্ষিত হয়। একদিকে বান্ধব আবির্ভূত হইয়া উদ্দীপনাময়ী ভাষায় প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে থাকে। অপরদিকে আর্য্যদর্শন, ভারতী, জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান পরিগ্রহ করিয়া নানা বিষয়ে পাঠকদিগকে আমোদিত করিতে থাকে। প্রভাতচিন্তা প্রভৃতি গৌরবান্বিত গ্রন্থ বান্ধবের চিন্তাশীলতার ফল, আর্য্যদর্শন হইতে মিল ও ম্যাটসিনির জীবনীর ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের উৎপত্তি হয়। ভারতীর দার্শনিক তত্ত্ব ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতিতে সাহিত্যের যথোচিত উপকার হয়; এবং জ্ঞানাঙ্কুরে যে উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তাহা গুণ গৌরবে সাহিত্য সমাজের চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। এখন অনেক উপন্যাসের উৎপত্তি হইতেছে, অনেক উপন্যাসকার সাহিত্যে আপনাদের ক্ষমতার নিদর্শন রাখিতে আগ্রহযুক্ত হইয়াছেন, ইঁহাদের গ্রন্থ এপর্য্যন্ত স্বর্ণলতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এক্ষণে কেবল এক ভারতী ব্যতীত আর সকলের তিরোভাব হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদর্শন

বান্ধব প্রভৃতি সাহিত্যে যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে, তাহা মন্দীভূত হইলে একবারে নিরুদ্ধ হয় নাই। ইহার স্নিগ্ধ ধারায় অদ্যাপি সহৃদয় পাঠকবর্গের তৃপ্তিলাভ হইতেছে। সাধনার অন্তর্ধান হইয়াছে বটে, কিন্তু নব্যভারত, সাহিত্য প্রভৃতি এখনও সাহিত্যের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করিতেছে।

এই স্থলে আর দুই খানি সাময়িক পত্রের উল্লেখ করা আবশ্যক। সমাজের রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই খানির আবির্ভাব হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সামাজিক রুচি যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, সাধারণ সাহিত্যে প্রধানতঃ সেই বিষয়ের প্রাধান্য থাকে। অধিকন্তু সমাজে গতি ফিরাইবার জন্যও সময়ে সময়ে উন্নত ভাবের গ্রন্থ সাহিত্যে স্থান পরিগ্রহ করে। যখন ইংলণ্ডের সমাজ ভোগাভিলাষের প্রবাহে পঙ্কিল ভাবে পূর্ণ হয়, তখন নানারূপ নিন্দনীয় নাটক ও সঙ্গীত রচিত হইতে থাকে। একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু যখন আপনাদের সমাজের এই পঙ্কিল ভাব দূর করিতে যত্নশীল হয়েন, তখন ইংরেজী সাহিত্যে মিল্টনের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের উৎপত্তি হয়। এই মহাকাব্য সামাজিক রুচির পঙ্কিলতা দূর করিয়া প্রসন্নতা বিধানে অগ্রসর হয়, সমাজ ঐ কাব্যের ভাবগাম্ভীর্য্যে মোহিত হইয়া আপনার অসারত্ব হৃদয়ঙ্গম করে। বঙ্গীয় সমাজ এক সময়ে বিষয়ান্তরে অধিকতর অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গালী একদিন উপন্যাসে তৃপ্তিলাভ করিতেছিল; পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের পরিচয়ে আমোদিত হইতেছিল, কিন্তু যে ধর্ম্মভাবের উপর আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহে মনোযোগী হয় নাই। এক খানি সংবাদপত্র এ বিষয়ে বাঙ্গালীর ঔদাস্য দূর করে। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক মহোদয় পাশ্চাত্য সমাজের সহিত স্বদেশীয় সমাজের তুলনা করিয়া যেরূপ স্পষ্টভাবে হিন্দুর মহত্বের পরিচয় দেন, তাহাতে বাঙ্গালীর চৈতন্য হয়। পুষ্পাঞ্জলির উপর পারিবারিক প্রবন্ধ ও সামাজিক প্রবন্ধ বঙ্গীয় সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করে। বঙ্গীয় সমাজ যখন পাশ্চাত্য ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া জাতীয় ভাবে হতাদর হইতেছিল, তখন পুষ্পাঞ্জলিকার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং জাতীয় সমাজকে জাতীয়ভাবে শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মভাবের আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েন। সামাজিক প্রবন্ধে তাঁহার গবেষণা, বিচারপটুতা ও যুক্তি-চাতুর্য্যের একশেষ প্রদর্শিত হয়। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও গম্ভীর ভাবময় উপদেশ বাক্যে সমাজ আত্মপ্রকৃতির স্বরূপ চিন্তায় মনোনিবেশ করে। এই সময় হইতে মিশনরীদিগের ধর্ম্মান্দোলনের আঘাতের প্রতিঘাত আরম্ভ হয়। হিন্দু ধর্ম্ম-প্রচারক বক্তারা হিন্দু সমাজে ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় মনোযোগী হয়েন, যাঁহারা এক সময়ে বঙ্গদর্শনে অসামান্য প্রতিভা দেখাইয়া ছিলেন, তাঁহারা এইরূপ ঘাতের প্রতিঘাতে স্থির থাকিতে পারেন নাই। পুষ্পাঞ্জলিকার যে পথ প্রদর্শন করেন, সেই পথের অনুসরণে তাঁহাদের বলবতী ইচ্ছা হয়। তাঁহারা পুনর্ব্বার উৎসাহের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এই সময়ে সমাজের ধর্ম্মানুশীলন-লালসার তৃপ্তিসাধন জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে "নবজীবন" ও

"প্রচারের" আবির্ভাব হয়। প্রথমে যিনি বঙ্গদর্শনের পরিচালক ছিলেন, তিনি প্রচারের প্রধান লেখক হয়েন এবং যিনি বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের প্রধান সহকারী ছিলেন, তিনি নবজীবনের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। সুতরাং "প্রচার" ও "নবজীবন" বঙ্গদর্শনে প্রতিবিম্বিত প্রতিভারই বিকাশ স্থল। প্রচার ও নবজীবনে যে প্রতিভার বিকাশ হয়, তাহা প্রধানতঃ হিন্দুকে ধর্ম্মরাজ্যের শৃঙ্খলা দেখাইতে নিয়োজিত থাকে। এখন এই উভয় সাময়িক পত্রেরই তিরোভাব হইয়াছে। কিন্তু উহা হইতে যে কয়েক খানি ধর্ম্মভাব-মূলক গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা চিরদিন বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব ঘোষণা করিবে।

দেখা গেল যে, বিক্টোরিয়ার রাজত্বে বঙ্গদর্শন প্রচারের পর বিবিধ সাময়িক পত্র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি হয়। এই সময়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইতে থাকে। নানা বিষয়ে বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত হইয়া মাতৃভাষার সেবায় মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা এই সময়ে আপনাদের বিচারপটুতা, ভাবগাম্ভীর্য্য ও রচনা ক্ষমতা দেখাইয়া সহৃদয় সমাজকে চমকিত করিয়া তুলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে হিন্দুসমাজ যেমন কর্ম্মপ্রবণ হয়, বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবে সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্যও সেইরূপ কার্য্যকারিণী শক্তিতে জীবন্ত ভাব ধারণ করে। এই সময়কে বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের প্রধান সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত।

বর্ত্তমান যুগে সাময়িক পত্রের ন্যায় সংবাদপত্রও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। সোম-প্রকাশ হইতে এই উন্নতির সূত্রপাত হয়। সোমপ্রকাশ-সম্পাদক বাঙ্গালা রচনায় সবিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার গ্রীস ও রোমের ইতিহাস ইংরেজীর অনুবাদ হইলেও উহা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী অভাব দূর হইয়াছে। বিদ্যাকল্পদ্রুমে এক সময়ে ইতিহাস প্রভৃতি প্রকাশিত হইলেও ভাষাগত লালিত্যের অভাবপ্রযুক্ত উহা পাঠক-বর্গের তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই। যাহা হউক, উপযুক্ত বিষয়ের সংগ্রহে, রচনার প্রাঞ্জল ভাবে এবং সংবাদ-পত্রোচিত উৎকৃষ্ট রীতিতে সোমপ্রকাশ পূর্ব্বতন সংবাদপত্রসমূহের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর কালে এ বিষয়ে এডুকেশন গেজেট, ঢাকাপ্রকাশ, সাধারণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এখন ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ-পত্র সুনিয়মে আপনাদের উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য সাধন করিতেছে। সংবাদপত্র সমাজের বাগ্‌যন্ত্র স্বরূপ। যেখানে প্রজা-শক্তির উপর রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল সর্ব্বাংশে নির্ভর করে, সেইখানে এই বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অধিকতর কার্য্যকারিণী হয়। এইজন্য ইংলণ্ড প্রভৃতির ন্যায় জনপদে সংবাদপত্রের শক্তি অধিক। ভারতবর্ষের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে রাজা বিদেশীয়, প্রজাশক্তি সঙ্কুচিত। রাজকীয় যাবতীয় কার্য্য সর্ব্বাংশে রাজশক্তিতে পরিচালিত, সুতরাং স্বদেশীয় সংবাদপত্র বিদেশীয় রাজার সমক্ষে সর্ব্বাংশে আপনার শক্তি প্রকাশে সমর্থ হয় না। এরূপ অবস্থাতেও বাঙ্গালা সংবাদপত্র যে, সঙ্কীর্ণতা ও নিস্তেজভাব পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অল্প গৌরবের বিষয় নহে। [illegible]

ঐ শক্তির সঞ্চার হয় এবং বিক্টোরিয়ার রাজ্যভার-গ্রহণের কয়েক বৎসর পরে উহা প্রকট হইয়া উঠে।

এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে, বিক্টোরিয়ার রাজত্বে ইংরেজীতে সুশিক্ষিত প্রতিভাশালী লেখকদিগের গুণে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা উন্নত হইয়াছে। এই সময়ে যে সকল কবি অভিনব ভাবের উচ্ছ্বাসে আপনাদের কাব্য শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত। যাহারা সাময়িক পত্রের প্রচার ও নানা গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজীতে সুপণ্ডিত। ইংরেজী শিক্ষাতে সংবাদপত্রের উন্নতি হইয়াছে এবং ইংরেজীর অনুশীলনে রহস্যপূর্ণ পত্র বা বিশেষ ভাবের গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। পঞ্চানন্দ ও কল্পতরু ইংরেজী শিক্ষিত সুলেখকের লেখনীপ্রসূত। উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম ইংরেজীতে অভিজ্ঞ লেখকেরই লিপিক্ষমতার নিদর্শন স্থল। কমলাকান্তের দপ্তর ইংরেজী পারদর্শী লেখকদিগেরই প্রতিভার বিকাশমাত্র। সেকাল একাল পাশ্চাত্য ভাবাদর্শী লেখকবর্গেরই অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। নাটক ও প্রহসন এবং ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, জীবন চরিত প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহারা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সংবাদপ্রভাকর প্রকাশের পর বাঙ্গালায় নাটকের উন্নতি লক্ষিত হয়। কুলীনকুলসর্ব্বস্বকার এ বিষয়ে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দেন। ইনি ইংরেজীতে পারদর্শী ছিলেন না। ইহার পর যাঁহারা নাটককার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তি ছিল। পদ্মাবতী বা কৃষ্ণকুমারী, নীলদর্পণ বা নবীন তপস্বিনী, রামাভিষেক বা হরিশ্চন্দ্র ইংরেজী শিক্ষিত লেখকদিগেরই ক্ষমতার সাক্ষ্য দিতেছে। ফলতঃ ইংরেজীর সহিত সংস্কৃতের সম্মিলন হওয়াতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এইরূপ উন্নতি হইয়াছে। যে বিষয়ের উপর সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, ভাবুক ব্যক্তি কল্পনাবলে সেই বিষয়ের এমন সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করেন, যেন সমাজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের একটী বিদুষী মহিলা স্বকীয় উপন্যাসে ভয়াবহ দাস-ব্যবসায়ের যে চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে ইংলণ্ডীয় সমাজ চমকিত হয়। মহারাণীর রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও অনিষ্টকর সামাজিক বিষয় বা ঘটনা বিশেষের চিত্র প্রদর্শন জন্য কল্পনা-চাতুরী প্রদর্শিত হইয়াছে। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও নীলদর্পণ এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্যে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে, এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্বর্ণলতার উদ্ভব হইয়াছে।

অনুবাদে অনেক সময়ে সাহিত্যের পরিপুষ্টি হয়। অনর্ঘরত্নের ভাণ্ডার স্বরূপ সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের পুরোভাগে রহিয়াছে। ঐ সকল রত্নের আহরণ করিলে ভাষা শ্রীসম্পন্ন হইতে পারে। যাঁহারা এই উপায়ে ভাষার শ্রীসম্পাদনে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্যম নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহাদের চেষ্টায় ভাষার একটী অভাব দূর হইয়াছে। পদ্যে ও গদ্যে যাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্য-সংসারে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। এইরূপে অনেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। অনেক ইংরেজী গ্রন্থেরও

অনুবাদের চেষ্টা হইতেছে। আধুনিক সময়ে উদ্ভাবনায় সাহিত্য উন্নত হইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ অনুবাদেও উহার উন্নতি ঘটিয়াছে।

মহারাণীর রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য কোন্ পথে কি ভাবে পরিচালিত হইয়াছে, উপস্থিত প্রবন্ধে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। যে যে বিষয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং যে সকল সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্রের প্রচার হইয়াছে, ক্রমানুসারে তৎসমুদায়ের বিবরণ সংগ্রহ করিলে আধুনিক সাহিত্যের ধারাবাহিক গতি অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে। যাহাহউক; যাঁহারা বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত ও অতিশ্রমে নিপীড়িত হইয়াও সাহিত্যের এইরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা চিরকাল সহৃদয় সমাজের বরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা পুরস্কার-লোভে এই মহাব্রতে মনোনিবেশ করেন নাই। রাজদ্বারে সম্মান লাভের আশাও তাঁহাদের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। অতীতের দিকে না ফিরিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাঁহারা মাতৃভূমির উপকারের নিমিত্ত যেরূপ সংযত চিত্তে মাতৃভাষার পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের সম্মান, তাঁহাদের প্রতিপত্তি, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনীর কখনও বিলয় হইবে না। উত্তর কালে যাঁহারা সাহিত্য-রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মপটুতা প্রদর্শন জন্য অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ হিতৈষিতাই তাঁহাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া দিবে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

ভৌগোলিক পরিভাষা।

তিন বৎসর ধরিয়া সাহিত্য পরিষদ্ যে ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন, গত শ্রাবণ মাসের পত্রিকায় তাহার একটা নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনের কার্য্য বিবরণে দেখিলাম, ভৌগোলিক পরিভাষা মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। এ সময়ে এই পরিভাষা সম্বন্ধে কোন কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে কিনা জানি না। তবে বিষয়ের গুরুত্ব ভাবিয়া দুই এক কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, ভূগোলের পরিভাষা নির্দ্ধারিত হইতেছে, ইহার বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম। তখন ভাবিয়াছিলাম, প্রস্তুত পরিভাষা সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করা হইবে। কেননা ভাষা সম্বন্ধে সাধারণের সম্মতিই পরিষদের প্রভুত্বের মূল, বুঝিয়াছিলাম। আবার ভূগোলের পরিভাষা ছিল না, এমন নহে। ভাল হউক মন্দ হউক, ভূগোলের আবশ্যক শব্দগুলি বাঙ্গালায় চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং তৎসমুদয় পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে হইলে সকলকে তদ্বিষয় জানান আবশ্যক। যাহা হউক, দেখিতেছি ইংরেজী ভূগোলে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসমূহের বাঙ্গালা প্রতিশব্দের দুইটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। একটী তালিকার নাম ভৌগোলিক পরিভাষা-সমিতির অনুমোদিত শব্দ এবং অপরটির নাম ভৌগোলিক পরিভাষা। এই দুই নামে পরিভাষা প্রকাশিত হইবার কারণ দেখিতে পাইলাম না।

কিন্তু পরিভাষা-সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণে লিখিত আছে, সমিতি প্রথমতঃ ভৌগোলিক পরিভাষা অর্থাৎ ইংরেজী ভূগোলে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসমূহের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নিরূপণে মনোনিবেশ করেন। তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত ইংরেজী শব্দসমূহের একটী মুদ্রিত তালিকা প্রস্তুত হয়, এবং উহা সমিতির সভ্য ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের নিকট প্রেরিত হয়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, পরিভাষা-সমিতিই উল্লিখিত দুইটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কেননা একটী তালিকায় শব্দ ইংরেজী এ (A) হইতে এচ্ (H) পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে, অপরটাতে আই (I) হইতে ডবলইউ (W) পর্য্যন্ত আছে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দুইটী তালিকার শব্দই সমানভাবে আলোচনা করিলাম।

কি প্রণালীতে ইংরেজী ভূগোলের পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারিলাম না। দেখিতেছি তালিকায় erosion আছে, কিন্তু denudation বা weathering

নাই; heliocentric longitude আছে, inclination of the earth's axis to the orbit নাই; sleet আছে, hail নাই; lagoon আছে, atoll বা reef নাই; aqueous meteors আছে, lightning বা thunder নাই; extinct আছে, active বা dormant নাই; hygrometer আছে, humidity নাই; lava আছে, ash নাই; isobar আছে, gradient নাই; plutonic rock আছে, intruded rocks নাই; নানাবিধ regions আছে, fauna বা flora নাই; ferruginous আছে, calcareous বা argillaceous নাই; well আছে, artesian well নাই, ইত্যাদি। অথচ এ সকল শব্দ প্রাকৃত ভূগোলে সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। সুতরাং প্রদত্ত দুইটী তালিকা অন্ততঃ প্রাকৃত ভূগোলের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

শব্দ-রচনা সম্বন্ধে দেখা যায়, কোন কোন শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা শব্দের পারিভাষিকত্ব লুপ্ত হয়। তেমনই কোন শব্দের দুই তিনটী প্রতিশব্দও শিক্ষার্থীর পক্ষে মঙ্গলকর নহে। কোন কোন ইংরেজী শব্দের অর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বিস্তৃত কিম্বা সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, বাঙ্গালা শব্দে পুরাতন অর্থ না রাখিয়া আধুনিক অর্থ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আশা করি সমিতি অন্ততঃ নিম্নলিখিত শব্দগুলি পুনর্ব্বার বিচার করিবেন। *

পরিভাষাসমিতির শব্দ।	আমার বক্তব্য।
Air বায়ু	Air = বায়ু করিলে, Windsও বায়ু হয় না। Winds = বাতাস, চলিত।
Winds বায়ু, বাতাস।	
Altitude of a hill উৎসেধ	Altitude দ্বারা perpendicular elevation এবং angle of elevation বুঝায়। প্রথম অর্থে উচ্চতা বা উচ্ছ্রায় এবং দ্বিতীয় অর্থে উন্নতাংশ রহিয়াছে। তবে আর উৎসেধ কেন?
„ of a star উন্নতাংশ	
Elevation উচ্চতা	
Height উচ্চতা, উচ্ছ্রায়।	
Average গড়	Average এবং mean শব্দদ্বয়ের ব্যবহারে পার্থক্য আছে। Average temperature এবং mean temperature দ্বারা একই ভাব আসে না। এ জন্য average = গড় এবং mean = মধ্য বা মধ্যম রাখা চলে।
Mean গড়।	
Atmosphere বায়ুমণ্ডল।	Atmosphere অর্থে সংস্কৃতে আবহ এবং ভূবায়ু শব্দের প্রয়োগ আছে। তদনুসারে meteorology = আবহবিদ্যা করিলে দোষ দেখি না। বায়ুমণ্ডল এবং নির্ব্বাত মণ্ডলের মণ্ডল শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি?
Belt of calms নির্ব্বাতমণ্ডল	
Meteorology বায়ুমণ্ডলবিদ্যা।	

* এরূপ সমালোচনায় শব্দের অনুপযোগিতা দেখাইয়া নিরস্ত থাকা অদ্ভুত বলিয়া স্থানে স্থানে নূতন শব্দ প্রস্তাব করিয়াছি। আশা করি, পরিভাষাসমিতি এই সকল শব্দের প্রতিও একটু মনোনিবেশ করিবেন।

Ammonia নিসাদল ক্ষার
Ozone অম্লজানসার ইত্যাদি।

রাসায়নিক শব্দের এরূপ অনুবাদ রামেন্দ্র বাবু অনুপযোগী বলিয়া দেখাইয়াছেন *। আমার মত পরিষৎপত্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে।

Crust of the earth ভূপঞ্জর
Geology ভূপঞ্জর-বিদ্যা।

অভিধানে দেখা যায় পঞ্জর এবং পিঞ্জর শব্দ এক। Crust of the earth দ্বারা পঞ্জর কিম্বা পিঞ্জরের কোন ভাব আসে না। পৃথিবীর মধ্যস্থল দ্রব দ্রব্যে পরিপূর্ণ ভাবিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশকে crust বলা হইয়াছিল। সেই পুরাতন অনুমান ভ্রমাত্মক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যাহা হউক, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে কিয়দ্দূর নিম্ন পর্য্যন্তকে ভূ-ত্বক্ বলিলে বিষয়টী বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। Geology শব্দের সহজ প্রতিশব্দ 'ভূ-বিদ্যা' থাকিতে crustএর প্রতিশব্দ ভূপঞ্জর যোগ করিবার প্রয়োজন দেখি না।

Colure অয়নান্তবৃত্ত, অয়নপ্রোত, বৃহৎ বৃত্ত, অয়নান্তের অহোরাত্রবৃত্ত।

Equinoctial এবং solstitial শব্দের সঙ্গে colure ব্যবহৃত হয়। কেবল colure শব্দের প্রয়োগ দেখি না। সুতরাং প্রস্তুত তিনটী প্রতিশব্দের কোন একটী দ্বারা উভয় অর্থ বুঝিতে পারে না। অয়নান্তের অহোরাত্র-বৃত্ত অর্থে diurnal circle of the solstices দ্বারা যাহা বুঝায় colure তাহা হইতে এই অর্থ একেবারে পৃথক্। সংস্কৃত জ্যোতিষে দেখা যায়, equinoctial, ecliptic শব্দের নামে মণ্ডল, বৃত্ত ইত্যাদি থাকে এবং উহাদের secondaries এর নামে সূত্র শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা, equinoctial circle = বিষুবদ্বৃত্ত (বলয়, মণ্ডল), ecliptic = ক্রান্তিবৃত্ত, অপমমণ্ডল; কিন্তু circle of declination = ক্রান্তিসূত্র বা ধ্রুবসূত্র, circle of latitude = শরসূত্র। এই প্রকারে বাঙ্গালাতেও বৃত্তসূত্র শব্দদ্বয় ব্যবহার করিলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়। এরূপ প্রয়োগে অন্ততঃ সন্দেহার্থ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এতদনুসারে equinoctial colure = ক্রান্তিপাতসূত্র ও solstitial colure = অয়নান্তসূত্র করা চলে।

Density সান্দ্রতা

পত্রিকায় এই সান্দ্রতা শব্দ লইয়া অনেক বিচার হইয়া

* রামেন্দ্র বাবু পরিভাষা-সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। তথাপি অম্লজানসারাদি আসিল কিরূপে?

Condensation ঘনীভবন।

গিয়াছে। সহজ ঘনতা, গাঢ়তা থাকিতে অপর শব্দের প্রয়োজন কি? ঘনতার আপত্তি থাকে, ঘনিমা করা যাইতে পারে।

Delta 'ব' দ্বীপ।

কেবল বাঙ্গালা 'ব' ত্রিকোণাকার। নাগরী, উড়িয়া, মরাঠী প্রভৃতি দেশের অপর কোন বর্ণমালার 'ব' ত্রিকোণ নহে। বোধ হয়, অন্ততঃ হিন্দী, উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষার পারিভাষিক শব্দ এক হইলেই সুবিধা। delta = নদীর ত্রিকোণভূমি বা ত্রিকোণমণ্ডল নামও আছে।

Degree of temperature তাপাংশ
Temperature তাপ-পরিমাণ।
Isothermal সমোষ্ণরেখা
Heat তাপ
Sensible heat অনুভূত উষ্ণতা
Latent heat গূঢ় বা প্রচ্ছন্নতাপ
Thermometer তাপমান।

Heat তাপ হইলে, temperature তাপ-পরিমাণ কিম্বা degree of temperature তাপাংশ হয় না। পুনশ্চ sensible heatএ উষ্ণতা এবং latent heatএ তাপশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উষ্ণতা এবং তাপ কি একার্থবাচক? যে প্রতিশব্দই হউক, heat এবং temperatureএ পার্থক্য রাখিতে হইবে। Heat = তাপ এবং temperature = উষ্ণতা করিয়া অপর শব্দ রচিত হইতে পারে। যথা, heat = তাপ, quantity of heat = তাপ পরিমাণ, calorimeter = তাপমান, specific heat = আপেক্ষিক তাপ, latent heat = প্রচ্ছন্ন বা লুপ্ত তাপ, sensible heat = অপ্রচ্ছন্ন বা ব্যক্ত তাপ, temperature = উষ্ণতা, thermometer = উষ্ণতামান, degree of temperature = উষ্ণতাংশ, isothermal = সমোষ্ণ রেখা।

Dew শিশির
Dewpoint পরিষেকাঙ্ক
Freezing point সংহনন-বিন্দু
Boiling point স্ফোটনাঙ্ক
Point বিন্দু
Saturation পূর্ণ সিক্ততা।

Dew point, freezing point ইত্যাদির point দ্বারা temperature বুঝি। সুতরাং কোথাও অঙ্ক কোথাও বিন্দু না করিয়া সর্ব্বত্র উষ্ণতা করিলে বালকগণকে বৃথা কষ্ট পাইতে হয় না। আবার, dew = শিশির, কিন্তু dew point = পরিষেকাঙ্ক করার প্রয়োজন কি? Dew point = saturation point = পূর্ণ সিক্ততার উষ্ণতা করিলেই বা দোষ কি? তবে, saturation শব্দটি কেবল dew হইবার পূর্ব্বাবস্থা না বুঝাইতে না লাগিয়া অন্যত্র ও লাগে। এ জন্য air saturated with aqueous vapour = পূর্ণ আর্দ্র বায়ু এবং বায়ুর saturation point = পূর্ণ আর্দ্রতার উষ্ণতা করা যাইতে পারে। Freezing

	=solidification, শেষোক্ত শব্দকে সংহনন বলিলে অর্থ সুস্পষ্ট হয় কি? কেননা solidকে কঠিন করা হইয়াছে।
Equinox বিষুব, ক্রান্তিপাত। Equinoctial points বিষুবদ্বিন্দু।	যে ক্ষণে সূর্য্য equinoctial points এ প্রবেশ করে, তাহাকেই প্রকৃত equinox বলা যায়। Equinoxএর অর্থ equinoctial point আছে বটে, কিন্তু তাহা সমর্থন করা যায় না। সুতরাং ক্রান্তিপাত করা চলে না। বিষুব শব্দেও সেই দোষ আসে, এ জন্য equinox বিষুবকাল বলা কর্ত্তব্য। Equinoctial pointsএর নাম ক্রান্তিপাত চিরপ্রসিদ্ধ আছে।
Equator, celestial বিষুবদ্বৃত্ত Equinoctial circle নাড়ীবলয়।	উভয় শব্দের একই অর্থ। তবে পৃথক্ নাম দিবার উদ্দেশ্য কি? আর নাড়ী, ঘটী ইত্যাদি দ্বারা আজ কাল কাল-পরিমাণ করা হয় না। সুতরাং তাহাদিগকে বৃথা না আনিয়া কেবল বিষুবদ্বৃত্ত বলাই ভাল।
Epoch যুগ, কল্প।	Geological epoch অর্থে যুগ করা যাইতে পারে। কিন্তু কল্প কেন? যাহা হউক, এই সঙ্গে geology র period শব্দের বাঙ্গালা দেওয়া আবশ্যক।
Fossil শিলাভূতাবয়ব * Fossilised rock শিলাভূত জীবজ প্রস্তর।	শিলীভূত বা petrified না হইলেও fossil হইতে পারে। জীবাবশেষ শব্দ কেমন বোধ হয়?
Ferruginous আয়সকণীয় Siliceous বালুকা সম্বন্ধীয়।	মৃত্তিকা সম্বন্ধে এই দুইটী শব্দ প্রায় প্রযুক্ত হয়। কিন্তু বালুকা সম্বন্ধীয় মৃত্তিকা ভাল শুনায় কি? চলিত লোহ শব্দের একটা কষ্টকর নাম রাখিবার আবশ্যকতা দেখি না। Ferruginous=লৌহময় বা লৌহযুক্ত, siliceous=বালুকাময় বা বালুকাযুক্ত অথবা সাধারণতঃ "বেলে" করিলে বুঝিবার অসুবিধা হয় না।
Fluid তরল দ্রব্য, দ্রব দ্রব্য Liquid তরল Solution দ্রব দ্রব্য।	Fluid এবং liquidএর মধ্যে যখন প্রভেদ রাখিতে হইবে, তখন fluidকে তরল এবং liquidকে দ্রব করা উচিত। তরল বলিলে 'ঢলঢলে' ভাব আসে। solution=দ্রব দ্রব্য বলিলে liquid ভ্রম হয়। এ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

* শিলাভূত শব্দ হয় কি?

Geyser উষ্ণ প্রস্রবণ
Hotspring উষ্ণ প্রস্রবণ।

Hotspring মাত্রই geyser নহে। আমাদের দেশে geyser নাই, সুতরাং একটা খাঁটি বাঙ্গালা নাম না রাখিলেও চলে। এইরূপ prairie = প্রান্তর বিশেষ, pampas = প্রান্তর বিশেষ, lallo বলিয়া কোন ভুল নাই। দেখুন, ghats কে mountains, dunes কে hills ইংরেজীতে করা হয় নাই।

Horizon চক্রবাল, দিগ্বলয়, ক্ষিতিজ, কুজ।
Horizontal কুজীয়।
Horizontal plane ক্ষিতিজ ক্ষেত্র।

একটি বিষয়ের জন্য একটি নাম থাকিলে শিক্ষার্থীর বুঝিবার সুবিধা হয়। মনে করুন, চারি খানি ভূগোলে horizon বুঝাইতে কেহ চক্র, কেহ দিগ্বলয়, কেহ ক্ষিতিজ, কেহ কুজ লিখিলেন। আবার horizontal বলিবার সময় কুজীয়, কিন্তু horizontal plane বলিতে হইলে অমনই ক্ষিতিজ আবশ্যক। এরূপ প্রতিশব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী হইতে পারি না। কলেজের বালকদিগকে point of maximum density of water কত, জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত ঠিক করিয়া থাকিবে, কিন্তু temperature of maximum density of water বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে একটা না একটা উত্তর পাওয়া যায়। সেইরূপ কুজ ব্যবহার করিয়া বালকগণকে কু ক্ষিতি ভাবিয়া লইতে বলায় কোন ফল নাই। যাহা হউক, rational ও sensible ভেদে horizon দ্বিবিধ কল্পনা করা যায়। এ জন্য দুইটি নাম আবশ্যক। চক্রবাল শব্দ জ্যোতিষে horizon অর্থে প্রায় ব্যবহার হইতে দেখি নাই *। এ জন্য sensible horizon জন্য চক্রবাল কিম্বা পৃষ্ঠক্ষিতিজ এবং rational horizon জন্য ক্ষিতিজ কিম্বা গর্ভক্ষিতিজ রাখা যাইতে পারে। Horizontal অর্থে জ্যোতিষে জলসম শব্দাদির ব্যবহার দেখা যায়। জলসম বলিলে কথাটি সহজেই বোধগম্য হয়।

* ভাস্করের বীজগণিতে চক্রবাল সংজ্ঞা আছে। তদ্‌যথা। পূর্ব্বপদক্ষেপাচ্চক্রবালমিদং স্মৃতং। কিন্তু ইহা দ্বারা একপ্রকার solution of indeterminate equations of the second degree বুঝায়। অন্যত্র জ্যোতিষে চক্রবাল শব্দ সমূহার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, ক্ষেত্রচক্রবালং। কিন্তু এ সকল অর্থ এখানে লক্ষ্য নহে।

Hygrometer সিক্ততামান Moist আর্দ্র Moisture আর্দ্রতা Saturation পূর্ণসিক্ততা।	যদি humidity অর্থে moisture করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে hygrometer = আর্দ্রতামান করা কর্ত্তব্য। Saturationএর অর্থ অনেক স্থলে "পরিপূর্ণ" শব্দ ব্যবহার করিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায়। যথা, Saturated with vapour = বাষ্প পরিপূর্ণ, saturated solution of salt = লবণ পরিপূর্ণ জল (বা দ্রাব)। এ জন্য জল বা জলীয় বাষ্প দ্বারা saturated বুঝাইবার স্থলে পূর্ণ আর্দ্র ব্যবহার করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ সিক্ততার বড় একটা প্রয়োজন মনে হইতেছে না।
Gas বাষ্প। Vapour বাষ্প	যত দিন ইংরাজিতে gas ও vapour এর প্রভেদ থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালা প্রতিশব্দেও প্রভেদ রাখা আবশ্যক হইবে। প্রয়োগ ব্যতীত, gas এবং vapour এর মধ্যে একটু প্রকৃতিগত প্রভেদও আছে। এ জন্য gasকে গ্যাস বলাই ভাল। নিতান্ত আবশ্যক হইলে gas বায়ু করা যাইতে পারে। কিন্তু তখন airকে ভূবায়ু করা আবশ্যক হইবে।
Ground swell সামুদ্রবিবর্ত	Swell কি বিবর্ত?
Halo কুণ্ডল	পরিবেষ শব্দ অধিক প্রসিদ্ধ।
Ice বরফ Iceberg হিমশিলা Glacier হিমসংহতি, হিমানী Snow হিম, তুষার Snow-flake হিমখণ্ড Snow-line চিরতুষাররেখা।	snow হিম হইলে iceberg হিমশিলা হয় না। আবার করকা অর্থে সচরাচর শিলা বা হিমশিলা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃতে হিম শব্দ ice এবং snow উভয়ই বুঝায়। আবার বাঙ্গালা হিম বলিলে শিশির বুঝায়। হিমসংহতি বলিলে mass of ice বা snow বুঝায়। সুতরাং glacierএর ভাব আসে না। হিমানী দ্বারা তাহাই বুঝায়। অধিকন্তু snow-driftও বুঝাইতে পারে। এ জন্য ice এবং snow শব্দের জন্য দুইটি প্রতিশব্দ স্থির করিয়া তাহাদের সাহায্যে অন্যান্য কয়টি শব্দ সঙ্কলন করিলে ভাল হয়। বোধ হয়, iceberg = বরফ গিরি, glacier = বরফ নদী, snow = তুষার রাখিলে সব দিক্ রক্ষা পায়।
Isobar সমভার রেখা Pressure চাপ।	Pressure চাপ চলিত হইয়াছে। সুতরাং isobar সমচাপ রেখা করা কর্ত্তব্য।

Leap-year প্লবক বৎসর — এরূপ অনুবাদে অর্থ স্পষ্ট হয় না। দীর্ঘ বৎসর করিলে কেমন হয়?

Latitude অক্ষাংশ, পলাংশ — অক্ষাংশ শব্দের প্রকৃত অর্থ degree of latitude,

" parallel of—স্পষ্ট ভূপরিধি, সুতরাং latitude অক্ষ করিলেই চলে। স্পষ্ট ভূপরিধি অথবা অক্ষাংশীয় সমান্তরালবৃত্ত দ্বারা reduced circumference of the earth বুঝায়,

" celestial শর — অর্থাৎ উহা দ্বারা circumference × cos. lat. বুঝায়। জ্যোতিষের অক্ষরেখা = অক্ষবৃত্ত = parallel of latitude যেমন নিরক্ষবৃত্ত আছে, তেমনই অক্ষবৃত্ত আছে। celestial latitude অর্থে ঠিক শর নহে। শর, বাণ, বিক্ষেপ ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্ট বা apparent latitude বুঝায়। এ জন্য celestial latitude অর্থে ভাস্কর অস্পষ্ট শর বলিয়াছেন। জ্যোতিষের শব্দ যখন সংস্কৃত হইতে লইতে হইবে, তখন সংস্কৃত জ্যোতিষের পরিভাষার সহিত বাঙ্গালা পরিভাষার ঐক্য রাখা কর্ত্তব্য। অস্পষ্ট শর কথাটা লম্বা হয় বটে, কিন্তু উপায় কি? *

Longitude দেশান্তর

" celestial for planets

of stars ধ্রুব, ধ্রুবক। — ভোগ বা ভুক্তি শব্দ দ্বারা কোন জ্যোতিষ্কের longitude ভোগ from the initial point বুঝাইতে দেখি নাই। তদ্দ্বারা ক্রান্তিবৃত্তের অল্প বা অধিক অংশ মাত্র বুঝায়। † তারাগণের ধ্রুব বা ধ্রুবক দ্বারা longitudes of the R. A's of the stars বুঝায়। পূর্ব্বে আমি ক্রান্তিবৃত্তাংশ বা অপবৃত্তাংশ শব্দ ‡ প্রস্তাব করিয়াছিলাম। দেখিতেছি, পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী ভুজাংশ করিয়াছেন। ভুজাংশ মন্দ বোধ হইল না।

Melting দ্রবণ, বিলয়ন

Solution দ্রব পদার্থ — Melting বা fusing এবং dissolving এই দুইটী শব্দেরই প্রতিশব্দ আবশ্যক। দ্রবণ ও বিলয়ন ব্যতীত গলন শব্দও আছে। সোণা গলান কথা সবিশেষ চলিত।

---

* সংস্কৃত জ্যোতিষের কোন কোন শব্দ একটু আধটু পরিবর্ত্তিত অর্থে ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলাম, (সা- পঃ ১৩০২ শ্রাবণ) কিন্তু দেখিতেছি, সংস্কৃত জ্যোতিষজ্ঞ ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা করিতে গেলে এরূপ পরিবর্ত্তনে গোলযোগে পড়িতে হয়।

† সূর্য্যসিদ্ধান্তের "ইষ্টনাড়ী হতা ভুক্তিঃ [illegible]" ইত্যাদি দেখুন।

‡ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০২ মাঘ।

	এজন্ত বোধ হয় melting by heat অর্থে গলন রাখা যাইতে পারে এবং dissolving in a solvent অর্থে দ্রবণ বা দ্রাবণ করা যাইতে পারে। এইরূপে solvent = দ্রাবক, soluble = দ্রবণশীল, solubilty = দ্রবণশীলতা, solution = দ্রাব ইত্যাদি চলিতে পারে। সামান্ত কথায় 'জল' শব্দ দ্বারা solution বুঝান হইয়া থাকে। যথা চুনজল, সোণার জলে গহনা ডুবান ইত্যাদি। আমার বোধ হয় এইরূপে solution অর্থে 'জল' ব্যবহার করিলে অর্থ সুস্পষ্টও হইতে পারে। কিন্তু solvent দ্রাবক, সুতরাং acidকেও দ্রাবক বলা অযুক্ত। acidকে অম্ল বলিলে দোষ কি?
Meridian „ terrestrial যাম্যোত্তর বৃত্ত „ celestial ধ্রুবপ্রোতবৃত্ত „ prime মধ্যরেখা।	ধ্রুবপ্রোত বৃত্তও অনেক আছে। জ্যোতিষে দেখা যায়, রেখা শব্দ যোগে অনেক স্থলে পৃথিবী সম্বন্ধীয় বৃত্ত বুঝায়। এইরূপে মধ্যরেখা, যাম্যোত্তর রেখা, অক্ষরেখা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। রেখা শব্দ দ্বারা ভূগোলেরও বৃত্ত বুঝায় বটে, কিন্তু রেখা শব্দটা কেবল ভূগোলের জন্ত রাখিলে বিশেষ দোষ হইবে না। meridian শব্দ ভূগোলের ও খগোলের জন্ত পৃথক রাখিবার প্রয়োজন তত নাই। কোন স্থলে পৃথক করিতে হইলে পৃথিবীর যাম্যোত্তরবৃত্ত বলিতে অসুবিধা হইবে না। এইরূপে যাম্যোত্তরবৃত্ত এই একটি শব্দ দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। Prime meridian কে ভূমধ্যরেখা করিলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়। কেননা কেবল মধ্যরেখা দ্বারা meridian মাত্র বুঝায়।
Moraine উপত্যকা Valley উপত্যকা	Moraine উপত্যকা হইল কিরূপে? Moraine অর্থে a heap of blocks and fragments of stones বুঝি। এই অর্থেই lateral moraine, medial moraine, and ground moraine বলা হইয়া থাকে।
Observatory বেধালয়	চলিত মানমন্দির শব্দটী ত্যাগ করিবার কারণ কি?
Organism জীবাবয়ব	Organism = জীবের অবয়ব না একেবারে জীব? অবিকল অনুবাদ করিলে দেহী বলা সুবিধা।

Plateau মালভূমি Table-land মালভূমি।	অধিত্যকা শব্দটাও আছে। বোধ হয় উচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগের সমস্থলীকে অধিত্যকা বলিলে ভাল হয়।
Pole. পৃষ্ঠকেন্দ্র, মেরু।	কেন্দ্র অনেক আছে, আবার পৃষ্ঠদেশে কেন্দ্র আনিবার প্রয়োজন কি? Pole এর সামান্য নাম মেরু করিলেই গোল চুকিয়া যায়। এইরূপে বলা যায়, বিষুবন্মণ্ডলের মেরুর নাম ধ্রুব, মঙ্গলের মেরুদেশ ইত্যাদি।
Pot hole মণ্ডলাকার গর্ত্ত	বোধহয় দেশে 'দহ' শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
Plain সমতল ভূমি, সমক্ষেত্র, সমতল ক্ষেত্র।	এই সকল প্রতিশব্দ অপেক্ষা সংস্কৃত সমস্থলী ভাল বোধ হয়।
Protoplasm জীব-বীজ।	Protoplasm = জীবের বীজ? seat of life ধরিয়া protoplasm অর্থে জীবনাধার করিতে বাধ্য হইয়াছি।
Race (tidal) স্রব সংঘর্ষ	Race শব্দের এই অর্থ ব্যতীত উহার অপর এক অর্থ প্রাকৃত ভূগোলে আবশ্যক হয় *। যাহা হউক, race শব্দটা তত আবশ্যক হয় না।
Revolution প্রদক্ষিণীকরণ।	এই অর্থে পরিভ্রমণ শব্দটা চলিত হইয়াছে।
Rock প্রস্তর Igneous আগ্নেয় Plutonic বারুণ	Igneous rock = আগ্নেয় প্রস্তর করিলে volcanic rock এর বাঙ্গালা কি হইবে? বারুণ প্রস্তর বলিলে aqueous or marine rock বুঝাইবার আশঙ্কা থাকে।
Metamorphic পারিণামিক	পারিণামিক শব্দ অপেক্ষা রূপান্তরিত বা বিকৃত শব্দ সহজ বোধ্য। Igneous অর্থে অগ্নিজ বা তাপজ এবং aqueous অর্থে জলজ করিলে দোষ কি?
Sun-dial সূর্য্য ঘড়ি।	দুই একটা ব্যতীত সমুদয় প্রতিশব্দ সংস্কৃতমূলক হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আর সূর্য্য ঘড়ি কেন? বাপুদেব শাস্ত্রীর ছায়াযন্ত্র চালাইলে মন্দ হয় কি?
Tides জোয়ার ভাটা „ flood বেলোর্দ্ধ সীমা।	Flood-tide এ সীমার ভাব আসে কিরূপে?
Tornado বাতাবর্ত্ত Cyclone বাতাবর্ত্ত	উভয় ইংরেজী শব্দের অর্থ এক কি? ঢাকায় যে tornado হইয়াছিল তাহাকে ঘূর্ণি-ঝড় বলা হইয়াছিল।
Trade-wind বাণিজ্য বায়ু।	বাণিজ্যের সহায় বলিয়া trade-winds নাম হয় নাই। ঘটনাক্রমে ঐ বাতাসে বাণিজ্যের সাহায্য হয়। একজন্য অর্থ ধরিয়া 'নিয়ত বাতাস' বলাই ভাল।

* এই অর্থে মাঝিরা 'টানা' বলিয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গে 'রেখ' শব্দও আছে। 'রেখার' ব্যুৎপত্তি জানি না।

Tropics ক্রান্তি, অয়নান্তবৃত্ত Tropic of cancer কর্কটক্রান্তি উত্তর পরমাপক্রজ্যাবৃত্ত, „ of capricorn মকরক্রান্তি, দক্ষিণ পরমাপক্রজ্যাবৃত্ত।	কর্কটক্রান্তির অনুবাদ declination of cancer হয়। অবশ্য সূর্য্যের ক্রান্তি কর্কটে হইলে, অয়ন দক্ষিণ হয়। এই অর্থে কর্কটক্রান্তিবৃত্ত দ্বারা tropic of cancer বুঝাইতে পারে। সেইরূপ tropic of capricorn মকরক্রান্তিবৃত্ত হইতে পারে। সংস্কৃত জ্যোতিষে tropic এর মত কোন বৃত্ত কল্পিত হয় না। অবশ্য স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ইংরেজী দক্ষিণায়ণ বা উত্তরায়ণ আমাদের দক্ষিণায়ণ বা উত্তরায়ণের ঠিক সমান নহে। যাহা হউক, পরমাপক্রজ্যাবৃত্ত বুঝিলাম না।
Valley of a mountain উপত্যকা „ of a river অনুনদী-নিম্নভূমি	Valley র উৎপত্তি বিচার করিয়া কি এই দুই প্রতিশব্দ রচিত হইয়াছে? উভয়ই উপত্যকা বলিয়া বুঝি। আবার অনুনদী ব্যতীত কি অপর নদীর Valley নাই?
Water, hard কঠিন জল „ soft কোমল জল	অর্থ দেখিয়া অনুবাদ করা কর্ত্তব্য। ইংরেজীতে যাহাই হউক, বাঙ্গালার কঠিন জল বলিলে কেমন কেমন শুনায়। আবার, বরফের সঙ্গেও ভ্রম হইতে পারে। বৈদ্যক শাস্ত্রের গুরু ও লঘু জল বলিলে কি বুঝায়?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

নরোত্তম ঠাকুর * ।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নাম না জানেন, এমন বৈষ্ণব নাই। রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ দূরে গড়ের হাট পরগণায় খেতরী গ্রাম অবস্থিত। সার্দ্ধ ত্রিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই খেতরী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেই সময়েই ঠাকুর নরোত্তমের প্রাদুর্ভাব। ঠাকুর নরোত্তমের জন্মের তারিখ নির্দ্দিষ্ট নাই, তবে যখন তাঁহার জন্ম হয়, তখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধরাধামে প্রকট আছেন, সুতরাং তাহা ১৪৫৩।৫৪ শকাব্দ হইবে।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় জমীদার রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের নারায়ণী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে নরোত্তম জন্ম গ্রহণ করেন। যে নরোত্তমের আবির্ভাবে পূর্ব্ব বঙ্গ ধন্য হইয়া গিয়াছে, মাঘ মাসের পূর্ণিমার স্নিগ্ধ হাস্য-তরঙ্গের সহিত গোধূলি সময়ে তিনি ভূমিষ্ঠ হন।

বাল্যকালেই নরোত্তমের অসাধারণ গুণ ও অদ্ভুত প্রতিভা সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। "নরু"র মধুর ব্যবহারে আপামর সকলেই বাধ্য। একদিন গল্পপ্রসঙ্গে নরোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা ও তাঁহার বিষয়ে নানা কথা শুনিতে পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শুনিয়া বালক এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে তিনি বক্তা ব্রাহ্মণটীকে পুনঃ পুনঃ ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ও প্রতিদিন তাঁহার কাছে গৌরচরিত্র শ্রবণ করিতে যাইতেন। যেদিন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কথা তিনি শুনিলেন, সে দিন এত অধীর হইলেন যে, কৃষ্ণদাস নামক সেই বক্তা ব্রাহ্মণ ভয় পাইলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে সম্প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইয়াছেন, তখন রাজকুমারের মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। পরে শুনিলেন যে প্রভুর অন্তর্দ্ধানে বহুতর ভক্ত ও প্রধান প্রধান পার্ষদগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া বাস করিতেছেন, তখন তাঁহার বৃন্দাবনের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ জন্মিল।

এইরূপে নরোত্তম গৌরপ্রেমে মজিলেন। সর্ব্বদা গৌরকথা-প্রসঙ্গে বালক ক্রমে খেলা ধূলা ছাড়িলেন, লেখা পড়ায় পর্য্যন্ত অমনোযোগ ঘটিল। ইহাতে পিতা মাতা চিন্তিত হইলেন। কিন্তু বালক গৌরকথা শুনিতে না পাইলে যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িত, ইহাই যেন তাঁহার আত্মার আহার।

একদিন প্রাতে নরোত্তম পদ্মানদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জ্ঞানের কোন চিহ্ন ছিল না।

---

* [illegible] গ্রন্থকারের পরিচয় দিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত করা গেল। [illegible] প্রবন্ধে মুদ্রিত হইল। [illegible]

এদিকে বহুক্ষণ যাবৎ পুত্রকে বাড়ী না দেখিয়া অনুসন্ধানে লোক চারিদিকে ছুটিল। এমন কি স্বয়ং রাণী নারায়ণী অস্থির হইয়া পদ্মাবতীর তীরপানে ছুটিলেন। নরোত্তম পদ্মাপারেই ছিলেন, লোকজন আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল। মাতা পুত্রকে কোলে লইয়া শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থে এই বিবরণের একটী পূর্ব্ব কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীমহাপ্রভু একদা রামকেলি গ্রামে আগমন করেন। পদ্মার অপরপারে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি কৃষ্ণাবেশে "নরোত্তম! নরোত্তম!" বলিয়া ডাকিয়া ছিলেন, তাহাতেই নরোত্তমের জন্ম। প্রভু নরোত্তমের জন্য প্রেমধন পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত রাখেন। নরোত্তম যে দিন পদ্মাবতীতে স্নান করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রি একটী স্বপ্ন দর্শন করেন, তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দ যেন তাঁহাকে বলেন, "নরোত্তম! কল্য প্রত্যূষে তুমি পদ্মাতে স্নান করিতে যাইও, তথায় গৌরাঙ্গের গচ্ছিত প্রেম প্রাপ্ত হইবে।" নরোত্তম স্বপ্নাদেশ বিশ্বাস করিয়া স্নান করিতে যান, তার পরে যাহা ঘটে, বলা গিয়াছে।

নরোত্তমের সেই হইতে নূতন ভাব হইল, কখন হাসেন, কখন কান্দেন, কিছুই স্থির নাই। পুত্র উন্মাদ হইয়াছে, এরূপ কখন কখন পিতা মাতার মনে হইতে লাগিল। কখন কখন নরোত্তম বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। ইহাতে মা বাপের প্রাণ শুকাইয়া গেল।

এই সময়ে বাদসাহ নরোত্তমের গুণ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। কাজেই কৃষ্ণানন্দ নিষেধ করিতে পারিলেন না। নরোত্তমের মনের সাধ পূরিল, মনে মনে পিতা মাতার চরণে চির বিদায় লইলেন। কিছুদূর রাজপথে চলিয়াই নরোত্তম গতি ফিরাইলেন, বৃন্দাবনের পথে চলিলেন। এ সংবাদ যখন খেতরীতে আসিল, তখন দুঃখের আর সীমা রহিল না। নরোত্তম কি প্রকারে চলিলেন—

"আহারের চেষ্টা নাহি সকল দিবসে।
ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে॥
পথের চলনে পায় হইল ব্রণ।
বৃক্ষতলে পড়ি রহে হয়ে অচেতন॥" (প্রেমবিলাস।)

নরোত্তমের বয়স তখন আন্দাজ ১৬ বর্ষের অধিক নহে। রাজার পুত্র, কোন দিন হাটেন নাই, কাজেই ধীরে ধীরে যাইতেছেন।

পুত্রের পলায়নের সংবাদ শ্রবণে কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য চারিদিকে লোক নিযুক্ত করেন। এই লোকের একদল, তাঁহাকে যাইয়া ধরিল, কিন্তু আনিতে পারিল না, সেই ১৬ বর্ষের বালকের ধর্ম্মভাবের নিকট পরাস্ত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল।

এইরূপে বহুকষ্টে নরোত্তম বৃন্দাবনে যথাসময়ে পৌঁছিলেন। তখন রূপ সনাতন নাই, শ্রীজীব আছেন। তাঁহার নিকট গিয়া অপরূপ বালকটী ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িয়া গেলেন।

ক্রমে পরিচয় হইল, দুই তিন দিন পরে রাজকুমার সাধুদর্শনে বহির্গত হইলেন। একে একে সেই দেবনিষ্ঠ ভক্তগণকে দেখিয়া নরোত্তম বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি লোকনাথ গোস্বামীকে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই নরোত্তমের মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, মনে মনে তিনি তাঁহার চরণে চিরতরে আত্মসমর্পন করিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্কল্প যে তিনি শিষ্য করিবেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ে শত শত শেল আঘাত করিল। যদি কোন যুবতী, কোন যুবাকে আত্মসমর্পন করিয়া জানিতে পারে যে, যুবক বিবাহ করিবে না, তখন সে যেমন কাতর হয় ও পরে সতীত্বরক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, নরোত্তমও তখন তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেন। তিনি গোপনে লোকনাথ গোস্বামীর সেবা আরম্ভ করিলেন। নরোত্তমের হৃদয় কিরূপ দৈন্য ভারাক্রান্ত ছিল, তাহার সেবার কথা ভাবিলেই তাহা বোধ হয়। প্রেমবিলাসে নরোত্তমের এই গোপনীয় সেবার কথা এইরূপে লিখিত আছে,—

"আর এক সাধন যেই করে নরোত্তম।
রাত্রিশেষে সেই সেবা করিল নিয়ম॥
যেই স্থানে গোসাঞি যায়েন বহির্দ্দেশ।
সেই স্থানে যাই করে সংস্কার বিশেষ॥"

এ স্থানীয় কার্য্য ব্যতীত নরোত্তম আর একটি কার্য্য করিতে লাগিলেন। যথা অনুরাগবল্লী গ্রন্থে—"মৃত্তিকা শৌচের তরে সুন্দর মাটি আনে।

ছড়া ঝাটা জল আনে বিবিধ বিধানে॥" (অনুরাগবল্লী)

লোকনাথ ব্যাকুল হইলেন। কে এমন করে? উদ্দেশ্য কি? যা হোক, একদিন তিনি রাত্রি থাকিতেই বহির্দ্দেশে গেলেন ও নরোত্তমের কাণ্ড দেখিলেন।

নরোত্তমকে তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, নরোত্তম পূর্ব্বাপর সকল কথা অকপটে তাঁহার কাছে কহিলেন। শুনিয়া গোস্বামী বলিলেন—

"যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন ভজন।
তোমার অন্তরে সেই বুঝিল কারণ॥
প্রয়োজন আছে কিবা শুরু করিবারে?" (প্রেমবিলাস।)

আরও এক বৎসর গেল, আরও এক বৎসর কাল নরোত্তম গুরুর সেবা করিলেন। এক বৎসর পরে লোকনাথ নরোত্তমকে আশা দিলেন। নরোত্তমের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল। শ্রাবণের পূর্ণিমাতে নরোত্তম দীক্ষিত হইলেন।

নরোত্তম শ্রীজীবের নিকট সমস্ত গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অদ্ভুত প্রতিভায়, অল্প কালেই তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিয়া এই সময়েই "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি দান করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর মহাশয় আর দুইজন ক্ষমতাশালী সঙ্গী লাভ করেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, অপর জন শ্যামানন্দ। এই তিন জনেই অদ্ভুত ক্ষমতাশালী অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

এই তিনজন দ্বারা বঙ্গদেশে ভক্তি গ্রন্থ প্রচার করিতে শ্রীজীব ইচ্ছা করিলেন এবং ভক্তিগ্রন্থ পূর্ণ একটি সিন্দুক, দশজন পদাতিক সঙ্গে দিয়া, ইঁহাদের সহিত পাঠাইলেন। ১৫০৩ শকে তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিলেন।

গোপালপুর নামক স্থান পর্য্যন্ত তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে আসিলেন। গোপালপুরে দস্যুগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থগুলি চুরি যায়। তাহাতে সকলেই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন। গ্রন্থের অনুসন্ধানার্থ শ্রীনিবাস সেখানেই থাকিলেন। নরোত্তম শ্যামানন্দকে লইয়া খেতরী আগমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের আগমনে খেতরী যেন জীবিত হইল, পিতামাতার দেহে যথার্থই প্রাণ আসিল।

নরোত্তম বাড়ীতে কিছুদিন থাকার পর নবদ্বীপধাম দর্শন করিতে গমন করেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (চৈতন্যদেবের স্ত্রী) আছেন। মহাপ্রভুর পাদুকা, শয্যা, জলপাত্র, উত্তরীয় প্রভৃতি যেমন ছিল, তেমনই তখন আছে। তিনি কোথায় কোনস্থানে বসিতেন, কোথায় কি করিতেন, সকল চিহ্ন বিদ্যমান। নরোত্তম এ সকল দর্শনে কিরূপ ভাবে বিভাবিত হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য। নরোত্তম নবদ্বীপ হইতে অদ্বৈতের স্থান শান্তিপুরে চলিলেন, তথা হইতে উদ্ধারণ দত্তের স্থান ত্রিবেণী ও তথা হইতে খড়দহ গমন করিলেন। তথা হইতে অভিরাম গোস্বামীর স্থান খানাকুল হইয়া নীলাচলে ধাবিত হইলেন। নীলাচলে প্রভুর লীলার চিহ্নগুলি আরও সজীব ও নূতন রহিয়াছে। এখানে প্রভুর অনেক পার্ষদকেই নরোত্তম পাইলেন। নরোত্তমকে পাইয়া তাঁহারাও—যদিও বিয়োগযন্ত্রণায় নিপীড়িত, তথাপি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ইহার পরে তিনি নীলাচল হইতে শ্রীখণ্ডে আগমন করেন ও নরহরি সরকার ঠাকুরের সহিত সম্মিলিত হন।

নরহরি তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপা করেন। শ্রীখণ্ড হইতে তিনি কাটোয়ায়—যে স্থানে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, যে স্থানে প্রভুর শেষ চিহ্ন কেশের সমাধি আছে, সেই স্থানে গমন করেন। কাটোয়ায় পদকর্ত্তা যদুনন্দনদাসের সহিত তাহার মিলন হয়। কাটোয়া হইতে নরোত্তম একচক্রা গ্রাম দর্শনে গমন করেন। এইরূপে যেখানে যেখানে প্রভুর লীলা কি কোন ভক্ত বিদ্যমান ছিলেন, সেই প্রত্যেক স্থানেই ঠাকুর মহাশয় গমন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর মহাশয় পুনর্ব্বার খেতরী আগমন করিলেন। খেতরীতে হরিসঙ্কীর্ত্তনের স্রোত বহিল। ঠাকুর মহাশয় নূতন সুরে ভক্তি-উদ্দীপক নূতন নূতন গীত রচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে "গরাণহাটী" কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। গড়ের হাট পরগণায় উৎপত্তি বলিয়া নূতন সুরের নাম "গরাণহাটী" হইল।

এখন ঠাকুর মহাশয় একটি অভিনব ইচ্ছা করিলেন। খেতরীতে বিগ্রহ স্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উদ্যোগের মহা আয়োজন হইতে লাগিল। মহাপ্রভুর ভক্ত যে যথায় আছেন, নিমন্ত্রিত হইলেন ও খেতরী আসিতে লাগিলেন। খেতরীধাম নূতন আকার ধারণ করিল, নূতন সাজে সজ্জিত হইল।

"স্থানে স্থানে কদলী বৃক্ষের নাহি লেখা।
নারিকেল কদলী বেষ্টিত আম্রশাখা॥" (নরোত্তমবিলাস।)

এ সবার উদ্যোগকর্ত্তা স্বয়ং রাজা কৃষ্ণানন্দ। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে বিগ্রহ স্থাপিত হইবেন। পূর্ব্বদিন হইতে নহবত বাদ্য আরম্ভ হইল, পূর্ব্ব দিনেই প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপাদি খাটান হইল। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"কি অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ অঙ্গন আবৃত।
কত শত কদলী বৃক্ষাদি সুশোভিত॥
কেহ কেহ পুষ্পমালা প্রস্তুত কারণে।
কেহ বহুলোক যুক্ত চন্দন ঘর্ষণে।
কেহ করে নানা বাদ্য বাদক নর্ত্তক।
বহুদেশ হইতে আইল অনেক গায়ক॥"

অপূর্ব্ব গরাণহাটী কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, ভক্তগণ এই নবীন কীর্ত্তন শ্রবণে একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে কীর্ত্তন সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল—

"কেহ কহে মহাপ্রভু স্বরূপের স্থানে।
শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে॥
গীতপ্রথা রক্ষাক্ষোভ-নিবৃত্তি নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক্ বিচার কৈল চিতে॥
সে সময়ে তাহা প্রেম-সম্পুটে রাখিল।
নরোত্তম দ্বারে প্রভু এবে উঘাড়িল॥" (ভক্তিরত্নাকর।)

এ কীর্ত্তনে কথিত আছে, স্বগণ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর রাজা কৃষ্ণানন্দ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া প্রাসাদের সমস্ত ধন বিতরণ করিয়াছিলেন।

এই উৎসবে যে ছয় বিগ্রহ সংস্থাপিত হন তাঁহাদের নাম নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের স্বকৃত একটী শ্লোকে লিখিত আছে। ঐ শ্লোকটি সেই উৎসব সময়েই তৎকর্ত্তৃক রচিত হয়। শ্লোকটি এই—

"গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥"

এ উৎসবকালীন, ঠাকুর মহাশয়ের রূপ ধ্যানা করিয়া তদীয় ভক্তগণ তাঁহার একটি প্রণাম রচনা করেন, তাহা এই—

"সংকীর্ত্তনানন্দজমন্দহাস্য-দন্তচ্যুতিদ্যোতিদিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারাস্নাপিতায় তস্মৈ নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায়॥"

শ্রীনিবাস এই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত রামচন্দ্র কবিরাজ আইসেন। রামচন্দ্রের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের এরূপ বন্ধুত্ব জন্মিল, যে একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র কাজেই খেতরী রহিয়া গেলেন। নরোত্তমের প্রভাবে এই সময়ে বহুলোক আকৃষ্ট হয়। অনেক ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ, কাজেই ইহাতে সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু যুক্তি তর্কে কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিল না। এইরূপে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া শেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় হইয়া সকলে রাজা নরসিংহের কাছে গেলেন ও তাঁহার শরণ লইলেন। রাজা মহা আড়ম্বরে ব্রাহ্মণগণ সঙ্গে খেতরীর সন্নিকটে এক গ্রামে শিবির সংস্থাপন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় এবং তাঁহার পরিকরগণ এই সংবাদ শুনিলেন। ঠাকুর মহাশয় স্বভাবতঃ তর্ক করিতে অনিচ্ছুক, এই সংবাদে তিনি কাতর হইলেন। তখন রামচন্দ্র ও ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী কুমরপুর গিয়া পণ্ডিতব্যূহকে পরাস্ত করিয়া আসিলেন। রাজা নরসিংহ রাণী রূপমালার সহিত ঠাকুর মহাশয়ের শরণ লইলেন, সেই পরাজিত পণ্ডিতগণও ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইলেন। এই ঘটনায় ঠাকুর মহাশয়ের নাম দেশ বিদেশে আরও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইহার পরে যে চাঁদ রায়ের প্রতাপে গৌড়ের বাদশা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, যিনি পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও বহু পদাতি সৈন্যসহ প্রতিনিয়ত যুদ্ধে নিরত থাকিতেন, সেই চাঁদরায় সপরিবারে ঠাকুর মহাশয়ের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় চাঁদরায়ের হিংস্র স্বভাব দূরীভূত হইয়াছিল।

ইহার কিছু দিন পরে আন্দাজ ১৫০৯ শকের পরভাগে রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গমন করেন। রামচন্দ্র আর ফিরিয়া আসেন নাই। প্রিয় সঙ্গীর বিরহে ঠাকুর মহাশয় ক্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন কি, সমস্ত দিবারাত্রি "প্রেমতলি" নামক ভজন স্থানে একাকী পড়িয়া থাকিতেন, কাহারও সঙ্গে আলাপ মাত্রও করিতেন না। এইখানে বসিয়া ঠাকুর মহাশয় যে সকল প্রার্থনা গীত গাহিতেন, তাহাই তাঁহার বিরচিত প্রসিদ্ধ "প্রার্থনা গ্রন্থ।" "লক্ষ গ্রন্থের সার", "অদ্ভুত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" গ্রন্থও ঐ সময়েই বিরচিত হয়। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার শেষে তিনি খেদ করিয়া বলিয়াছেন,—

রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তার সঙ্গ হয় যেন,
নরোত্তম তবে হয় ধন্য॥"

এই সময় তাঁহার হৃদয় বিরহে জর্জ্জরীভূত। নিম্নের পদ দুটীই তাহার পরিচয়,—

"বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হিয়া মাঝে দারুণ দুঃখ দিয়া।" ইত্যাদি।

"গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীনিবাস গদাধর
নর হরি মুকুন্দ মুরারী।
শ্রীস্বরূপ দামোদর, হরিদাস বক্রেশ্বর,
এ সব প্রেমের অধিকারী॥
করিলা যে সব লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুই না পাই দেখিতে।"

* * * * * *

"যে মোর মরম ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।"

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঠাকুর মহাশয় একাকী ছিলেন না; তাঁহার পরাণবধু শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত কথা কহিতেন। তৎকৃত একটি পদের কিয়দংশ এই—

"নব ঘন শ্যাম ও পরাণ বন্ধুয়া,
আমি তোমার পাশরিতে নারি।
তোমার সে মুখশশী, অমিয় মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি।" ইত্যাদি।

ঠাকুর মহাশয় বুঝিলেন, বিরহব্যথায় দেহ আর ধরিতে পারিতেছি না। তাড়া তাড়ি তিনি তখন শিষ্যগণকে ডাকিয়া এক এক জনকে এক এক বিগ্রহ দান করিলেন। সমুদয় বন্দোবস্ত হইল। তখন একবার প্রিয় রামচন্দ্রের আলয়ে (বুধুরীতে) গমন করিলেন। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস (রামচন্দ্রের অনুজ) তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। ঠাকুর মহাশয় আদর করিয়া গোবিন্দের পদাবলী শুনিলেন। পর দিন বুধুরী হইতে যাত্রা করিয়া গাম্ভিলা গ্রামে আপন প্রিয় শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী উপস্থিত হন। কএকদিন এখানে মহা মহোৎসব হয়, যথা সময়ে এই খানেই ঠাকুর মহাশয় অত্যাশ্চর্য্য রূপে দেহত্যাগ করেন। সে এইরূপ——

একদিন—তখন ঠাকুর মহাশয় পীড়িত, গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি তাঁহাকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া গিয়াছেন, আস্তে আস্তে তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের দেহমার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু মার্জ্জন করিবেন কি। নরোত্তমবিলাসে লিখিত আছে,—

"দেহে কিবা মার্জ্জন করিবে পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিলাইলা গঙ্গার জলেতে॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইলা অন্তর্দ্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা কে বুঝিবে আন॥
অকস্মাৎ গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল॥"

তখন কার্ত্তিক মাস এবং কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি। ঐ তিথিতে ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎসব হইয়া থাকে।

চমৎকারচন্দ্রিকা, রসসার প্রভৃতি গ্রন্থের শেষে ও ভণিতায় নরোত্তমদাসের নাম দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত নহে; ঠাকুর মহাশয়ের বহুপরবর্ত্তী কোন নরোত্তমদাসের রচিত। "প্রার্থনা" এবং "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" ব্যতীত "হাটপত্তন" "চৌতিশা পদাবলী" প্রভৃতি কএক খানি ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত। তদ্ব্যতীত যে যে গ্রন্থের শেষে নরোত্তম নাম আছে, সে নরোত্তম ভিন্ন ব্যক্তি, ঠাকুর মহাশয় নহেন।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

দেহ-কড়চ।

(৺ নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত)

ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে অসংখ্য বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থ রচিত হইলেও, বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ তেমন অধিক রচিত হয় নাই। পদ্য রচনায় যেরূপ আগ্রহ ছিল, গদ্য রচনায় সেরূপ উৎসাহ বা সেরূপ যত্ন পরিলক্ষিত হয় না। অনেকের বিশ্বাস, ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় গদ্য সাহিত্যের প্রকাশ হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই গদ্য সাহিত্যের বিকাশ। বাঙ্গালা ভাষার প্রথমাবস্থায় পদ্যের ন্যায় গদ্যের তেমন সমধিক আলোচনা না থাকিলেও প্রাচীনা বঙ্গভাষা গদ্যসাহিত্যবর্জ্জিতা নহেন, তাহার আমরা অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। সেই গদ্যসাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনাত্মক একটি বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে মহাত্মার জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে আমাদের আলোচ্য 'দেহকড়চ' নামক গ্রন্থখানি তাঁহার রচিত। ইহা বঙ্গভাষার এক খানি প্রাচীন গদ্য গ্রন্থ। প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের কিরূপ অবস্থা ছিল, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে তাহার কতক কতক নিদর্শন পাওয়া যায়।

দেহ-কড়চের দুই খানি পুথি * আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক খানি নরোত্তম ঠাকুরের জন্মস্থান খেতরী গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক বাবাজীর কুটীর হইতে এবং অপর খানি মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী এক মোহান্তের মঠ হইতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পুথিখানি অতি জীর্ণ শীর্ণ, দেখিলেই দুই শতাধিক বর্ষের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। পুথির শেষে ১৬০৩ শক লেখা আছে। ঐ শকে গ্রন্থখানি নকল হয়। এই পুথি খানিকেই আমরা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিলাম।

কাঁটোয়ার পুথিখানি বড় পুরাতন বলিয়া বোধ হইল না। গ্রন্থ-সমাপ্তির পর লেখকের নাম বা সন তারিখ দেওয়া নাই। তবে এই পুথির কাগজ ও লেখা দেখিয়া কম বেশ ৭০।৮০ বর্ষের প্রাচীন বলিয়া ধরা যায়।

দুই খানি পুথিই বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। এমন পংক্তি নাই, যাহাতে ৫।৭ টী বানান ভুল না আছে। তাই বলিয়া আমরা মূলে ঐ সকল বর্ণাশুদ্ধির সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব না। আদর্শ পুথিতে যেমন আছে, ঠিক তাহাই দেখাইব, টীকাতে সংশোধন, পাঠান্তর ও প্রয়োজন হইলে অর্থাদি লিখিয়া দিব।

---

* দেহকড়চের পুথি দুইখানি পরিষদের কার্যালয়ে রক্ষিত আছে। আজ প্রায় দুই বর্ষ অতীত হইল, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার ঐ পুথি-তালিকা বঙ্গবাসীতে ইহার উল্লেখ করেন, তৎপরে পরিষৎ পত্রিকাতেও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী মধ্যে এবং অবশেষে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থে [illegible] এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের সামান্য পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

দেহ-কড়চ।

———(++:০:++)———

১ শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্ত[2] জিব[3] ॥ থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কীরূপে[4] হইল। তত্ত[5] বস্তু হৈতে। তত্ত[5] বস্তু কি ২। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র[6]। ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল য়েক[7] যোগে[8] ভাণ্ড হৈল ॥ পঞ্চাত্মাকে ২॥ প্রিথিবী[9] আপ[10] তেজঃ বাউ[11] আকাশ ॥ একাদশীন্দ্র[12] কে ২। কর্ম্ম-ইন্দ্র[13] পাঁচ ॥ জ্ঞানীন্দ্র[14] পাঁচ ॥ আবরন[15] এক। কর্ম্ম-ইন্দ্রের[16] নাম কি ২ ॥ হস্ত পদ লীঙ্গ[17] গুহ্য সির[18] ॥ জ্ঞানীন্দ্রের[19] নাম কি ২ ॥ চক্ষুকর্ণ ঘ্রাণ রশনা[20] বাক্। এই শকল[21] ইন্দ্রের[22] রাজা মণ[23] ॥ পঞ্চ আত্মা বশ কার ॥ ইন্দ্রের[24] ॥ ইন্দ্র[25] বশ কার ॥ রীপুর[26] ॥ রিপুর নাম কি ২। কাম ক্রোধ, লোভ মোহ মদ মাশ্চর্য্য[27] দম্প শহঃ[28] ॥ রিপুগণ করেন কি ॥ ইন্দ্রগণকে[29] চেতন দেন ॥ ইন্দ্রগণ[29] করেন কি ॥ জিবের চেতন্ন[30] করে। জিবাত্মা[31] থাকেন কোথা ॥ শীরে[32] ॥ কিরূপে ॥ শনীত[33] আশ্রয়ে ॥ করেন কি পিতা মাতাকে ভাবেন ॥ পরমাত্মা থাকেন কোথা ॥ শোক্রে[34] ॥ কিরূপে ॥ স্থক্রীছলে[35] ॥ করেন কি ॥ জিবাত্মাকে হরেন ॥ হরিলে হয় কি ॥ তাহার পরমান্দ[36] হয় ॥ পরমান্দ[36] হৈলে হয় কি ॥ স্বরূপ হয় ॥ স্বরূপ হৈলে হয় কি ॥ রূপের সহীত[37] ভেদ হয় ॥ অভেদ বলি

---

১ এইখান হইতে খেতরীর পুথি আরম্ভ। ২ "তটস্থ" কাটোয়ার পুথির বিশুদ্ধ পাঠ। ৩ জীব। ৪ কিরূপে। ৫ তত্ত্ব। ৬ একাদশেন্দ্রিয়। ৭ 'এক' কা. পু.। ৮ যোগে। ৯ পৃথিবী। ১০ আপ্যা ১১ 'বায়ু'—কা. পু.। ১২ একাদশেন্দ্রিয়। ১৩ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ১৪ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ১৫ 'আর মন। ১৬ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের। ১৭ লিঙ্গ। ১৮ 'হস্তপাদলিঙ্গগুহ্যশির'—কা. পু.। ১৯ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের। ২০ রসনা। ২১ 'সকল'-কা. পু.। ২২ ইন্দ্রিয়ের। ২৩ মন। ২৪ ইন্দ্রিয়ের। ২৫ ইন্দ্রিয়। ২৬ সহকার রিপুর। ২৭ মাৎসর্য্য। ২৮ দম্ভ সহ। ২৯ইন্দ্রিয়গণ। ৩০ জীবের চৈতন্য। ৩১ জীবাত্মা। ৩২ শিরে। ৩৩ শোণিত। ৩৪ শুক্রে। ৩৫ শুক্রচ্ছলে অর্থাৎ বীর্য্যরূপে। ৩৬ 'রূপ রমান্ত'—কা. পু পাঠ।—পরমানন্দ। ৩৭ 'সহিত'—কা. পু.।

কারে ॥ একাত্মাকে। পরমিষ্ঠী[৩৮] আত্মা থাকেন কোথা। শন্যেতে[৩৯] ॥ কিরূপে থাকেন ॥ সহশ্রদল[৪০] পদ্মে থাকেন ॥ তাহার রূপ কি ॥ শ্বরূপ প্রীকির্ত্তিতে জোড়িত[৪১] ॥ কিরূপে থাকেন ॥ শদা[৪২] আনন্দময় ॥ বাহ্যজ্ঞান-রহীত[৪৩] ॥ তেঁহ[৪৪] নিত্য চৈতন্য ॥ নিত্য চৈতন্য কাথে[৪৫] বলি ॥ শদা[৪২] চেতন ॥ তেঁহো[৪৬] কে ॥ শ্রীগুরু সকলের পর[৪৭] ॥ তাথে[৫৪] জানিব কেমনে ॥ তেঁহো আপনাকে আপনি জানান ॥ জে[৪৮] জন চেতন সেই চৈতন্য ॥ অতএব শ্বরূপ[৪৯] রূপ এক বস্তু হয় ॥ বর্ত্তমান অনুমাণ[৫০] হয় দুই রূপ ॥ বর্ত্তমানের অনুমাণ[৫০] ॥ অনুমানের বর্ত্তমান ॥ কি শ্বরূপ[৪৯] ॥ ইহার ভাব কি ॥ বর্ত্তমাণ[৫১] ॥ অষ্ট ভাবণা[৫২] ॥ জাথে[৫৩] দেখি নাঞি তাথে[৫৪] কীরূপে[৪] ভাবিব। জাহাকে[৫৩] দেখিতে পাই তাহাকে ভাবি জেরূপ[৫৫] নেত্রে দেখি ॥ সেইরূপ হ্রিদয়ে[৫৬] থাকে ॥ বর্ত্তমান জানিব কিশে[৫৮] ॥ জাহাতে[৫৩] শ্রবণ দর্শণ[৫৯] ॥ শে লোভ কাথে[৬০] ॥ জে মণে হরে[৬১] ॥ মনে হরে কে ॥ শ্রীগুরু ॥ শিক্ষাগুরু কে ॥ শহজ[৬৩] যানায়[৬২] জে ॥ প্রাপ্তি কি। সহজ বস্তু। শহজ[৬৩] বস্তু বর্ত্তে কিশে[৫৮] ॥ সহজ মানস ছিষ্টি[৬৪] জাতে ॥ শহজ[৬৩] মানশ[৬৫] বর্ত্তমাণ[৫১] ॥ গুরুরূপ বর্ত্তমান ॥ গুরুর স্থিতি কোথা ॥ বর্ত্তমানে ॥ বর্ত্তমাণ[৫১] কি ॥ সহজ মানশ[৬৫] ॥ মানশ[৬৫] কয় ॥ তিন ॥ কি ২ ॥ অজনিসম্ভবা[৬৬]। জনিশম্ভা[৬৭] ॥ সতসিদ্ধি[৬৮] ॥ এহি তিন ॥ জনিসম্ভবা[৬৭] বর্ত্তমাণ[৫১] ॥ অজনিসম্ভবা[৬৬] গোকুল[৬৭] বৃন্দাবন[৫১] ॥ সতসিদ্ধি[৬৮] গোলোক বৃন্দাবন ॥ জনিশম্ভার[৬৭] উৎপতি[৬৯] কোথা ॥ ছিষ্টিকর্ত্তা[৭০] হৈতে ॥ সে কে ॥

---

৩৮ 'পরমেষ্ঠী',—কী. পু.। ৩৯ শূন্যেতে। ৪০ সহস্র। ৪১ স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িত। ৪২ সদা। ৪৩ 'রহিত'—কী. পু.। ৪৪ 'তিহ'—কী. পু.। ৪৫ কাহাকে। ৪৬ তাহা কি বা তিনি কে? ৪৭ পর অর্থাৎ প্রধান বা শ্রেষ্ঠ। ৪৮ যে। ৪৯ স্বরূপ। ৫০ অনুমান। ৫১ বর্ত্তমান। ৫২ ভাবনা। ৫৩ যাহা। ৫৪ তাহাকে। ৫৫ যেরূপ। ৫৬ হৃদয়ে। ৫৭ 'বর্ত্তমান কাল' কী. পু.। ৫৮ কিসে। ৫৯ 'দর্শন' কী. পু.। ৬০ অর্থাৎ সে কাহাকে লোভ করে। ৬১ 'জে মন হরে'—কী. পু.। ৬২ সহজ জানায় যে। ৬৩ 'সহজ'—কী. পু.। ৬৪ 'সহজ মানস্য সৃষ্টি জাতে'—কী. পু.। ৬৫ মানস। ৬৬ অযোনিসম্ভবা। ৬৭ যোনিসম্ভবা। ৬৮ স্বতঃসিদ্ধ। ৬৯ উৎপত্তি। ৭০ সৃষ্টি।

ব্রহ্মা। স্থিতি কোথা॥ খিরদশাই[৭১]॥ সংসারের কর্ত্তা কে॥ মহেশ্বর॥ তার স্থিতি কোথা। কৈলাস॥ এই তিন লোকে গুণাবতার। খিরদশাই[৭১] কোন্ পুরুষ॥ তৃতিয়[৭২] পুরুষ[৭৩]॥ তার স্বরূপ কি॥ শহস্র[৪০] মস্তক॥ শহস্র[৪০] পদ॥ ইত্যাদি॥ স্থিতি কোথা॥ চৌদ্যভুবনের অধ[৭৪]॥ তাহার নাম[৭৫] কি॥ শপ্ত[৭৬] শর্গ[৭৭] সপ্ত পাতাল॥ কি২॥ ভূলোক ভবলোক স্বরলোক মহোলোক[৭৮] জনলোক তপলোক শান্তলোক। এহি সপ্ত শর্গ[৭৭]। সপ্ত পাতাল কি২॥ অতল বিতল স্বতল তল তলাতল মহাতল রশাতল[৮০]॥ ইহার উধ[৮১] বৈকুণ্ঠ॥ আদিস্থান। তাথে গর্ভ দশা ইব স্থিতি॥ তার অধ পচীশ[৮২] ক্রোশ জোজন[৮৩]॥ একুমে পঞ্চাশ ক্রোশ জোজন[৮৩] ব্রহ্মাণ্ড॥ ব্রহ্মাণ্ড থাকেন কোথা॥ বিরজাতে॥ তেহোঁ কে॥ তেহঁ প্রথম পুরুষ॥ তার নাসাগ্রে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বিনাশ॥ তার প্রমাণ কি॥

[৮৪] 'জস্যে সেকোনিশ্বাসেত কাল মথাবলম্বনং।
জিবতি লোম বিলো জাহ্নগদণ্ডণাথা।
য়িষ্ণু মহান্মহই মধ মধ কলা বিশেষ।
গোবিন্দ মাদি পুরুশং স্বম হংভজামি' ॥[৮৪]

তার উৎপত্তি কোথা॥ চতর্ব্বহ[৮৫] শঙ্কর্শন[৮৬] হৈতে॥ চতুর্ব্বহ[৮৫] ঐ।১। বাসুদেব শঙ্কর্শন[৮৬] পদ্মমন[৮৭] অনিরূদ্ধ[৮৮]। এই চারিজন। স্থিতি কোথা॥

গোলোকনাথ হৈতে॥ গোলোকনাথ কে॥ তেহোঁ কোন নাএক[৮৯]॥ তেহোঁ অশর্য্য[৯০] নাএক[৮৯]॥ তার গুণ কি॥ তার তিনগুণ॥ তার অংশ

---

৭১ ক্ষীরোদশায়ী। ৭২ তৃতীয়। ৭৩ পুরুষ। ৭৪ চৌদ্দভুবনের অধঃ। ৭৫ নাম। ৭৬ সপ্ত। ৭৭ স্বর্গ। ৭৮ মহর্লোক। ৮০ রসাতল। ৮১ ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ। ৮২ পঁচিশ। ৮৩ যোজন।

৮৪ "যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রহ্মসংহিতা ৫ অঃ)

৮৫ চতুর্ব্যূহ। ৮৬ সঙ্কর্ষণ। ৮৭ প্রদ্যুম্ন। ৮৮ অনিরুদ্ধ। ৮৯ নায়ক। ৯০ ঐশ্বর্য্য।

চন্তর্ব্বহ[৮৫]। তার প্রকাশ গোলোক ॥ প্রকাশে বস্তু ভেদ নাঞি। তার প্রমাণ কি।

'বাস্থদেব প্রধানশ্চতম্মন শ্রীদিধামত ॥

গোলকে মাথুরে জস্থদ্বারকাদৌ প্রবর্ত্ততে' ॥ [৯১]

'গোলোকে উক্ত জৎ কিঞ্চিৎ গোকুলে তৎ প্রতিষ্ঠিতঃ।

প্রকাশ স্বরূপোয়ং দ্বিতিয় দেহরূপকং' ॥ [৯২]

জগন্নাথ নতু মাধুর্য্য নায়েক[৮৯] গোকুলনাথের প্রকাশ মথুরা ॥ বৈভব দ্বারকা বিলাশ ॥ ভোমি বৃন্দাবনং ভোমি[৯৩] ॥ ০ ॥ গোকুলনাথের প্রকাশ[৯৪] বৈকুণ্ঠাদি বিলাশ[৯৫]। নিত্যবৃন্দাবন। নিত্যবৃন্দাবননাথকে ভাবেন। ইহো অজনিসম্ভবা[৯৬]। নিত্যবৃন্দাবননাথ কে। সতসিদ্ধি[৯৬] ॥ নিত্য বৃন্দাবননাথ থাকেন কোথা ॥ সর্ব্বপরি[৯৭] ॥ প্রমাণ কি ॥ 'নিত্য দ্বারপরি বৈকুণ্ঠক্ত পরিস্থিতি' ॥ শেখানে[৯৮] হয় কি[৯৯] ॥ নিত্যরাষ[১০০] হয় ॥ নিত্য মহোৎসব হয় ॥ প্রমাণ কি ॥ তথাহি ॥

'সত্যস্থান মঙ্গলনস্থা বিষ্ণবে কান্তবল্লবং।

নিত্য বৃন্দাবনং নাম নিত্য রাশ মহোৎসবঃ ॥' [১০১]

শেখানে[৯৯] চন্দ্র সুর্য্যের[১০২] গতি নাহি ॥ রত্নমন্দিরের ছটায় দিপ্তমান[১০৩]। প্রমাণ কি। আদিবরাহতন্ত্রে 'জোতির্ম্ময়ী জত্র তত্র বৃন্দারন্য মহৎ পদং ॥

বৃন্দাবনে শদ্য বাশং নিত্য সিদ্ধি শদ্য গতিঃ ॥' [১০৪]

---

৯১ "বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নাস্তোঽনিরুদ্ধকঃ। গোলোকে মথুরা যত্র দ্বারকাদ্যৌ চ বর্ত্ততে ॥"
৯২ "গোলোকোক্তঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ গোকুলে তৎপ্রতিষ্ঠিতম্। স্বপ্রকাশস্বরূপোঽয়ং দ্বিতীয়ো দেহরূপকঃ ॥"
৯৩ 'মোদি বৃন্দাবনং'—কা. পু.। এই পংক্তির পাঠ সমীচীন নহে। ৯৪ প্রকাশ। ৯৫ বিলাস। ৯৬ স্বতঃসিদ্ধ।
৯৭ সর্ব্বোপরি। ৯৮ উক্ত পুথির পাঠই বোঝা গেল না। ৯৯ সেখানে। ১০০ রাস।
১০১ "সত্যস্থং মঙ্গলাক্তস্ত বিষ্ণোঃ কান্তাতিবল্লভং। নিত্যবৃন্দাবনং নাম নিত্যরাসমহোৎসবঃ ॥"
১০২ সূর্য্যের। ১০৩ দীপ্তমান।
১০৪ "জ্যোতির্ম্ময়ী যত্র পুরী বৃন্দারণ্যং মহৎপদং। বৃন্দাবনে সদাভাসো নাস্তি চন্দ্ররবেগতিঃ ॥"

শেখানে[৯৯] বাঞ[১০৫] স্থির নিত্য সুখ ॥ শোক বিচ্ছেদ নাঞী। জরা মিত্তু[১০৬] নাহি ॥ ক্রোধ অহঙ্কার নাহি ॥ প্রমাণ কি ॥

'অদুঃখং সোক বিচ্ছেদ জরামিত্তুনাং বর্জিতং।
অক্রোধ মাশ্চর্য্য নাস্তি অভীর্থন বহঙ্করং ॥'[১০৭]

করেন কি। 'ছিষ্টির রশ আশ্বাদন। শিখি পিঙ্করিভূষণং।'[১০৮] 'অঙ্গি এত নেরাকার মাত্র যে ভুসনাশ্রয়ং।'[১০৯] তার স্থিতি কোথা। চারি বেদের পরি ॥ রত্ন সিংকাসনে ॥ কিশোরি[১১০] বিরাজমাণ[১১১]। শে[১১২] নাইকার[১১৩] কাঁচ রুপি। নায়েকের[১১৪] প্রেম রতি ॥ তেঁহো সত সিদ্ধি[১১৫]। তখন নিগুণ প্রীকিত্তি[১১৬] পুরুশে[১১৭] জড়িত ॥ তাথে পাব কিশে[৫৮] ॥ তাহার স্বরূপ হৈলে[৪১] ॥ স্বরূপ[৪২] হৈব কিশে[৫৮] ॥ গুরু উপদেশে। গুরু উপদেশ কি। কামগায়ত্রী কামবিজ[১১৮] ॥ কামগায়ত্রী[১২০] কে ॥ নায়েক[৮৯] ॥ কামবিজ[১১৮] কে ॥ নাইকা[১১৯] ॥ কামগায়িত্রি[১২০] সাড়ে চব্বিশ অক্ষর। সাড়ে চব্বিশ ছন্দ ॥ কামবিজ[১১৮] তেমতি। এই সকল ছন্দ অঙ্গে ধারণ করিবেন ॥ তাহাতে শদা দিপ্তমাণ[১০৩] গুরুনায়েক[৮৯] শিষ্য নাইকা[১১৯]। নাইকার[১১৩] শ্বরূপ[৪১] হয় কিশে[৫৮] ॥ নাইকার[১১৩] গুণ অঙ্গে ধারণ করিবেক। গুণ কি ২। নেত্রে শ্রী গুণমুঞ্জরি[১২১] ॥ জিহ্বাতে রসমুঞ্জরি[১২১] ॥ নাশাযে[১২২] কস্তুরি-মুঞ্জরি[১২১] ॥ কর্ণেগুণমুঞ্জরি[১২১] ॥ বাক্যে মধুমুঞ্জরি[১২১] ॥ কণ্ঠে ভৃঙ্গমুঞ্জরি[১২১] ॥ বক্ষস্থলে প্রেমমঞ্জুরি[১২১] ॥ হস্তে বিণমুঞ্জরি[১২৩] ॥ অন্তরে কামমঞ্জরি[১২১] ॥ মোনে[১২৪] রতিমুঞ্জরি[১২১] ॥ চিত্তে প্রীতিমুঞ্জরি[১২১] ॥ চরণে পদ্মমুঞ্জরি[১২১] গুণ এই সকল গুণ অঙ্গে ধারণ করিবেন ॥ ০ ॥ ০ ॥ তবে শ্বরূপ[৪২] হইবেন ॥

---

১০৫ অস্পষ্ট। ক্রাঁটোয়ার পুথিতে 'রত্তি' পাঠ আছে। ১০৬ মৃত্যু।
১০৭ "অদুঃখং শোকবিচ্ছেদজরামৃত্যুবিবর্জিতম্। অক্রোধো নাস্তি মাৎসর্য্যং নাভ্যর্থনমহঙ্কৃতিঃ ॥"
১০৮ "সৃষ্টিরস আস্বাদনঃ শিখিপুচ্ছ বিভূষণঃ"—সব বোঝা গেল না।
১০৯ অস্পষ্ট। সব বোঝা গেল না। ১১০ কিশোরী। ১১১ বিরাজমান। ১১২ সে। ১১৩ নায়িকার।
১১৪ নায়কের। ১১৫ স্বতঃসিদ্ধ। ১১৬ প্রকৃতি। ১১৭ পুরুষে। ১১৮ বীজ। ১১৯ নায়িকা।
১২০ 'গায়ত্রী'—বাং পু। ১২১ মঞ্জরী। ১২২ নাসিকায়। ১২৩ বীণামঞ্জরী। ১২৪ মনে।

শ্বরূপ[৪৯] পাইবেন ॥ স্বরূপের ধংশ[১২৫] নাহি ॥ ধংশ[১২৫] নাই কার ॥ নিত্যের বর্ণগুণ জে[৪৮] ধারণ করিবেন ॥ শে[১২১] শরূপ[৪৯] হইবেক ॥ শ্বরূপ[৪৯] হৈলে শ্বরূপ[৪৯] সহিত ভেদ হয় ॥

পয়ার ॥ শে[১১২] প্রকৃতির[১১৬] দরশনে আনন্দিত মন ॥
মন হরিণ এগ্রাসে[১২৬] করিল গমন ॥
ধনুরূপ হৈয়া থাকে নাহি জানে আন ॥
শেহিরূপ[১২৭] নিবরধি করয়ে ধেয়ান।
শেহিরূপ[১২৭] আসি তার হ্রিদয়ে[৫৬] প্রসিল[১২৮] ॥
হ্রিদয়ের[৫৬] মেদ্ধে[১২৯] শেই[১২৬] প্রকৃতি[১১৬] হইল ॥
প্রকৃতি[১১৬] হইয়া করে প্রকৃতির শঙ্গ[১৩১] ॥
প্রকৃতির[১৩০] শঙ্গে[১৩১] তার উপজয়ে রঙ্গ ॥
রশের[১৩২] তরঙ্গে পড়ি নাহি জানে আন।
রশেতে মগণ (সদা) রশ[১৩৩] করে পান।
রস পান করিবে জে শেই সে পাইবে।
রশের মরম জানি প্রভুরে[১৩৪] ভুঞ্জাবে ॥
প্রভুর সুখে শুখি[১৩৫] হইয়া শেবে[১৩৬] জেই জন।
অবশ্য পাইবে সেই নিত্য বৃন্দাবন ॥
গোকুল গোলোক এক নিত্য বস্তু স্থান।
নিত্য পরিবার গোলোক স্বয়ং প্রধান ॥
মাধুর্য্য নিত্য প্রকট। অতয়েব[১৩৭] মাধুর্য্য প্রধান প্রকট ॥ রূপে নিত্য

---

১২৫ ধ্বংস। ১২৬ আশায়। ১২৭ সেহি=সেই। ১২৮ পশিল=প্রবেশ করিল। ১২৯ 'মধ্যে'—বাঁ. পু.। ১৩০ 'প্রকৃতি'—বাঁ. পু.। ১৩১ সঙ্গী। ১৩২ রসের। ১৩৩ রস। ১৩৪ প্রভুকে। ১৩৫ সুখী। ১৩৬ সেবে। ১৩৭ অতএব।

ও বিহার। অতয়েব[১৩৭] মাধুর্য্য[৮৯] নাএক শিক্ষাগুরু[১৩৮] ॥ নরত্তম দাষে[১৩৯] কহে ভাবি সেই গুরু ॥ * ॥ * ॥ * ॥ ইতি শ্রীমন নরোত্তম ঠাকুর মহাষয় বিরচীত দেহকড়চ শুভমস্ত[১৪০] ॥ শকাব্দা ১৬০৩ ॥

---

১৩৮ গুরু। ১৩৯ নরোত্তম দাসে। ১৪০ ইতি শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বিরচিত দেহকড়চ। শুভমস্তু।

বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব।

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে, রামায়ণ ও মনুসংহিতা অপেক্ষা প্রাচীন আর কোন গ্রন্থে উহার উল্লেখ পাওয়া যায় না *। মনুসংহিতায় কেবল পুণ্ড্র † নাম এবং রামায়ণে বঙ্গ ও পুণ্ড্র উভয় নামই দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ-পাঠে বোধ হয়, বঙ্গ ও পুণ্ড্রদেশ, উভয়ই অনার্য্যনিবাস ও বনভূমি-সমাচ্ছন্ন। তথায় পুণ্ড্র সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্রগণ, পিতার অসন্তোষ উৎপাদন করায়, পিতৃশাপে অনার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্ড্রভূমিতে যাইয়া বাস করে।[১] এদিকে ত এই; ওদিকে কিন্তু আবার ঐ রামায়ণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অমূর্ত্তরজা নামে এক জন চন্দ্রবংশীয় রাজা, পুণ্ড্রদেশ অতিক্রম করিয়া কামরূপ অঞ্চলে ধর্ম্মারণ্য নামক স্থানের সমীপে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে এক আর্য্যরাজ্য স্থাপন করেন।[২] এ বড় আশ্চর্য্য কথা; আর্য্যস্রোত ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ, একের পর আর, এইরূপ ভাবেই অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে, তাহার বিপরীত, মধ্যে প্রবল একটা পুণ্ড্রদেশ অতিক্রম করিয়া ও তাহার এদিক্ ওদিক্ না তাকাইয়া, একেবারেই কামরূপে গিয়া আর্য্যরাজ্য স্থাপিত হইল, ইহা কখনই হইতে পারে না; অবশ্যই ক্রমে ক্রমে ভূভাগ আবিষ্কৃত হইতে হইতে কামরূপমুখে আর্য্যস্রোত অগ্রসর হইয়া থাকিবে। সুতরাং ওদিকে মগধ, আর এদিকে কামরূপ, উভয় আর্য্যরাজ্যের মধ্যে এই দূর ব্যবধান স্থানে, কিছু না কিছু আর্য্য-নিবাস ছিল, ইহা না হইয়াই পারে না। তবে এই হইতে পারে যে, দেশের সাধারণ অধিবাসী যাহারা, তাহারা সকলেই অনার্য্য এবং আর্য্যনিবাস যাহা কিছু ছিল, তাহা তাহাদের তুলনায় মুষ্টিমেয়। অতএব ইহাই আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে বঙ্গ নামধেয় যে ভূমি, অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থ অধুনাতন বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ, তখন অসভ্যনিবাস হইলেও, প্রকৃত পুণ্ড্রভূমি যাহা, অর্থাৎ অধুনাতন উত্তরবঙ্গ আর্য্যনিবাস শূন্য ছিল না।

---

* [অথর্ব্ববেদে অঙ্গের উল্লেখ আছে—"গন্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।" অথর্ব্বসংহিতা ৫।২২।১৪। অথর্ব্বপরিশিষ্টে 'বঙ্গ' নাম পাওয়া যায়। এখনকার বাঙ্গালার অন্তর্গত ভাগলপুর অঞ্চলই পূর্ব্বকালে 'অঙ্গ' নামে খ্যাত ছিল। ঐতরেয় আরণ্যকেও (২।১।১) 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' প্রভৃতি স্থলে পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী—'বঙ্গাঃ বঙ্গদেশীয়াঃ বগধাঃ মগধাঃ' এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (ত্রয়ীটীকা ১৬৩পৃঃ)]—পত্রিকা সম্পাদক।

† [ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রদিগের বর্ণনা আছে।—'অন্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেঽন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি। বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।" ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৭।১৮।]—পঃ সম্পাদক।

১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

২। "তথামূর্ত্তরজা বীরশ্চক্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরং। ধর্ম্মারণ্যসমীপস্থং।" রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

বর্ত্তমান যে গ্রন্থ মনুসংহিতা নামে প্রচলিত, তাহা প্রকৃত পক্ষে মনুর মত সংগ্রহ মাত্র এবং রামায়ণ হইতে উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক *। এই সংগ্রহদৃষ্টে অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে অতি প্রাচীন মনুকৃত কোন স্মৃতি ছিল এবং তাহারই অবলম্বনে বর্ত্তমান সংহিতার উদয় হইয়াছে। অতি প্রাচীন মনুস্মৃতিতে কি ছিল তাহা জানি না, সুতরাং যাহা আছে, তাহা লইয়াই বিচার। বর্ত্তমান সংহিতার প্রমাণেও জানা যায় যে, পুণ্ড্রভূমি খাঁটি অনার্য্যনিবাস নহে; তথায় শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়গণও বসতি করিত।[১] এই শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়ের মধ্যে, মনু পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন ও কিরাতদিগকেই ধরিয়াছেন।

রামায়ণ ও মনুসংহিতার পর, মহাভারতেও কেবল পুণ্ড্রভূমি ও বঙ্গের নাম নহে, অধিকন্তু তাম্রলিপ্তের নামও দেখিতে পাওয়া যায়।[২] এখানে ইহা বলাই বাহুল্য যে, রামায়ণ, মনুসংহিতা এবং মহাভারতে, ক্রমান্বয়ে যে পৌণ্ড্রভূমি, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্তের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা বঙ্গ ও পৌণ্ড্র মাত্র, তদতিরিক্ত অন্ত কোন স্থান নহে। সভাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে, ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, ভীম বঙ্গভূমিতে আসিয়া বাসুদেব নামা নৃপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তখন যে বঙ্গভূমিতে আর্য্যগণ আসিয়া বাস করিয়াছিল এবং আর্য্যজাতীয় রাজা যে উহার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তাহা রাজার এই বাসুদেব নামেই পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। কেবল বঙ্গ বলিয়া কেন, তৎকালে বঙ্গের দক্ষিণস্থিত উৎকল সহ কলিঙ্গ রাজ্য পর্য্যন্ত, আর্য্যগণের দ্বারা কেবল অধিবেশিত নহে, প্রত্যুত পুণ্যভূমির মধ্যেও পরিগণিত হইয়াছিল।[৩] বঙ্গের মধ্যেও তখন

* [প্রচলিত ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা রামায়ণ অপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না, বরং নানা কারণে মনুসংহিতার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়। এখন যে মনুসংহিতা প্রচলিত আছে, তাহারই কএকটি শ্লোক রামায়ণে অবিকল উদ্ধৃত দেখি। যথা।

'শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।
গৃহীতৌ ধর্ম্মকুশলৈস্তথা তচ্চরিতং ময়া॥ ৩০
রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥ ৩১ } — মনু ৮।৩১৮।
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৩২ } — মনু ৮।৩১৬।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৮ অধ্যায়।]—পঃ সম্পাদক।

১। "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাদরদাঃ খশাঃ॥"
(মনু ১০ অধ্যায়।)

২। "অঙ্গাঃ বঙ্গাঃ কলিঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাঃ শুহ্মাশ্চ" ইত্যাদি। মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১০৪। ভীষ্মপর্ব্ব ৯।৫৬ এবং "অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।" ইত্যাদি। হরিবংশ ২২৮ অঃ।

৩। "এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রা যজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ।
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।

সাগরসঙ্গম মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে [১]; সুতরাং বঙ্গ তখন কেবল আর্য্যনিবাস নহে; বহু দূর দূরান্তরবাসী আর্য্যগণ পর্য্যন্ত, পুণ্যতীর্থ সাগরসঙ্গমে স্নান হেতু যাওয়া আসা করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও যে ভ্রাতৃগণসহ এই পুণ্যতীর্থে আসিয়া স্নান করিয়াছিলেন, মহাভারত বনপর্ব্বে ১১৩ অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাভারতের পর, পুরাণাদিতে পৌণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত এবং এমন কি সমতট প্রদেশের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে পৌণ্ড্রদেশের বিবর কথনে, পৌণ্ড্র-খণ্ড নামে একটি পৃথক্ খণ্ডই বিভাগ করা হইয়াছে এবং সেই পৌণ্ড্রখণ্ড মধ্যে, এমন কি গৌড় নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণ সকলের প্রাচীনত্বে * অনেকেরই সন্দেহ আছে এবং আমারও সে সন্দেহ নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না; সুতরাং পুরাণোক্ত কোন স্থল এখানে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিলাম না। তবে হরিবংশ যদিও মহাভারত অপেক্ষা বহুযাংশে আধুনিক; তথাপি উহাকে আর আর সমস্ত পুরাণ অপেক্ষা বহু প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যদিও এই হরিবংশের মধ্যে পৌণ্ড্র, বঙ্গ, ও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সমতট, কর্ণসুবর্ণ ইত্যাদি নামধেয় প্রাচীন বাঙ্গালার অপরাপর প্রদেশগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনির্ণীত-কাল পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া, প্রমাণিত কাল যে সকল গ্রন্থ তাহা সন্ধান করিলে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ শক নরপতির ষষ্ঠ শতাব্দীর কিঞ্চিৎন মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতায় যুগপৎ এই নামগুলির উল্লেখ দেখা যায়,—গৌড়, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, বর্দ্ধমান, বঙ্গ, উপবঙ্গ, সমতট। [২] তদ্ভিন্ন, ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পরে প্রাদুর্ভূত উত্তরভারতের সম্রাট্ ও কান্যকুব্জেশ্বর শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক কবি বাণভট্টের হর্ষচরিতে ও চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাণভট্টের লিখন অনুসারে জানা যায় যে কর্ণসুবর্ণ † এবং গৌড় একই রাজ্য ছিল।

উভয়ং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতং ॥
সুযানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেয়ুষঃ ॥
অত্র বৈ ঋষয়োহন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে ॥" ইত্যাদি। মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৪ অঃ।

১। "স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদী শতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্ ॥"
এই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ভ্রাতৃগণ সহ যুধিষ্ঠির স্নান করিয়াছিলেন।
মহাভারত—বনপর্ব্ব ১১৪ এবং ৮৫ অধ্যায়।

* [পুরাণে দুই একটি প্রক্ষিপ্ত বচন থাকিলেও মূল পুরাণগুলি নিতান্ত আধুনিক নয়। এমন কি আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে কতিপয় পুরাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।]—পঃ সম্পাদক।

২। বৃহৎসংহিতা ১৪।৬—৮।

† [বাণভট্টের গ্রন্থে গৌড় নাম আছে, কিন্তু কর্ণসুবর্ণ পাইলাম না।]—পঃ সঃ।

যাহা হউক, বরাহমিহিরের লিখনানুসারে দেখা যায় যে, গৌড় হইতে পৌণ্ড্র, পৃথক্ ও বঙ্গ হইতে বৰ্দ্ধমান পৃথক্ এবং বরাহমিহির উপবঙ্গ নামে আরও যে একটি স্বতন্ত্র স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই উপবঙ্গ, বোধ হয়, তদানীন্তন গাঙ্গেয় বদ্বীপ হইতে পারে। যাহা হউক, গৌড় ও পৌণ্ড্র, বঙ্গ ও বৰ্দ্ধমান, ইত্যাদির পৃথক্ উল্লেখের কারণ বিচার করার পূর্ব্বে, একবার দেখা উচিত যে, বিদেশীয়দিগের গ্রন্থ হইতে বঙ্গভূমির প্রাচীন সংবাদ কতদূর সংগৃহীত হইতে পারে।

গ্রীকভূবেত্তা থলেমির প্রণীত ভূবৃত্তান্ত-পুস্তকের ম্যাক্রিণ্ডেল কৃত ইংরেজী অনুবাদ পাঠে জানা যায় যে,[১] ইউরোপ আদি পাশ্চাত্যভূমে, পূর্ব্বভারতের মধ্যে তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ বর্ত্তমান তমলুকনগর, খৃষ্টের ৬০০ বর্ষেরও পূর্ব্ব হইতে গণনীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যবন্দর বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল। তবেই দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্ট জন্মিবার ৬০০ বৎসরেরও অনেক কাল পূর্ব্ব হইতে তাম্রলিপ্তি প্রদেশ ছিল; তথায় যে অব্যবহিত প্রদেশ হইতে আর্য্যস্রোত আসিয়াছিল, সেই বঙ্গভূমিও বিশেষ সভ্যতা এবং সম্পদের আকর না হইলে তাম্রলিপ্তির সামুদ্রিক বাণিজ্য-বন্দরের তাদৃশ খ্যাতি হইতে পারিত না। যে কালে লোকচলাচলের নিতান্ত বিরলতা এবং দেশ দেশান্তরে গমনাগমনের দারুণ দুর্গমতা হেতু যে কোন খ্যাতি-বিস্তার বহুকাল সাপেক্ষ ছিল,—সেই পূর্ব্বতন কালেই সুদূর ইউরোপ ভূমিতে তাম্রলিপ্তের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। অতএব উক্ত বিশিষ্ট প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বঙ্গভূমিকে অনেকে যেরূপ অপেক্ষা-কৃত আধুনিক দেশ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহা নহে। তাম্রলিপ্তির প্রোক্ত খ্যাতি বিস্তার হওয়া যে কালসাপেক্ষ, তাহার একটা পরিমাণ কল্পনা করিলে অবশ্যই বলিতে হয় যে, খৃষ্টের সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও তাম্রলিপ্তপ্রমুখ সেই প্রাচীন বঙ্গে সুখ, সৌভাগ্য ও সভ্যতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এই বঙ্গভূমের লোক অধ্যবসায়শালী হইয়া দেশ দেশান্তরে সমুদ্রযানে বাণিজ্যাদি করিয়া ফিরিত। এ বিষয়ের আরও বিশেষ প্রমাণ অন্যত্র হইতেও পাওয়া যাইতেছে।

সিংহলদ্বীপের মহাবংশ নামক গ্রন্থে[২] লিখিত আছে যে বৎসর বুদ্ধদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়েন, সেই বৎসর বঙ্গীয় রাজকুমার বিজয় সিংহল জয় করেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু অনুসন্ধানের দ্বারা খৃষ্টীয় শকের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে নিরূপণ করিয়া থাকেন।[৩] সুতরাং এখানেও প্রমাণ স্থলে যে সময়ের ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে,

---

১। " * * is proved historically by the mention of Tamralipta, 600 of years before our era, as one of the most frequented ports of Eastern India"——Mc Crindels Ptolemy, 73.

২। Mahavanso, chaps 6, 7, 8, 53.

৩। একমাত্র মক্ষমূলর বুদ্ধনির্ব্বাণের কাল খৃঃ পূঃ ৪৭৭ বৎসর নিরূপণ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে যখন আমাদের বিচার করিবার সময় ও স্থান ইহা নহে, তখন অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদের যে মত, তাহাই মূলে গ্রহণ করিলাম।

তাহাও প্রায় খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬০০ বৎসরের কথা। মহাবংশে লিখিত আছে, যে বঙ্গভূমের মধ্যে লাল [১] নামক প্রদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। সিংহবাহুর বিজয় নামে এক পুত্র ছিল। বিজয় স্বীয় কর্ম্মদোষে পিতার বিরাগভাজন হওয়ায়, পিতৃ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। নির্ব্বাসিত হওয়ায় স্বদেশ হইতে সঙ্গীগণসহ সেই রাজপুত্র বিজয় সমুদ্রযানে (সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্তি হইতে) যাত্রা করিয়া সিংহলে উপস্থিত হইয়া, সেই রাজ্য জয়পূর্ব্বক তথাকার সিংহাসন অধিকার করেন। কিছুকাল রাজত্বের পর তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে, মন্ত্রিগণ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসুদেবকে বঙ্গ হইতে আনাইয়া সিংহলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই হইতে এই বংশ সিংহলদ্বীপে বহিশ শত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিল। বিজয় সিংহবাহুর পুত্র হেতু এই বংশীয় রাজাদিগকে সিংহবংশীয় বলিত এবং ইহাদেরই নামে এই দ্বীপের নাম সিংহল * হইয়াছিল। এতদ্দ্বারাও আমরা বাঙ্গালার তাৎকালিক সভ্যতা, যুদ্ধকুশলতা এবং সমুদ্রযানাদি পরিচালনের কৌশলাদি বিশিষ্ট রূপে অবগত হইতে পারি। সে কতই পুরাতন কালের কথা! আমরা একজন সিংহলীয় ইতিহাসবিদের প্রসাদে এই সকল কথা এখন অবগত হইতে পারিতেছি; নতুবা এই মহৎ সংবাদ সম্বন্ধে হয়ত আমাদিগকে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ থাকিতে হইত। অতএব উক্ত ইতিহাসবিদ্‌কে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়।

মহাভারতের সময়েও বঙ্গভূমি বাসুদেব নামা রাজার অধীনে একটী প্রতাপান্বিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল † এবং তখন হইতেই যে বঙ্গের সভ্যতা ও সম্পদের সূত্রপাত, তাহা উপরোক্ত প্রমাণ দুইটির দ্বারাও অংশতঃ সমর্থিত হইতেছে। কারণ, উক্ত প্রমাণ দুইটিতে খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসরেরও পূর্ব্ব হইতে বঙ্গের সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছে।

খৃঃ পূঃ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত মগধেশ্বর মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভাস্থিত গ্রীকরাজ সিলুকুস্ নিকাতোরের রাজদূত মিগাস্থিনিস্ এবং তাহার পরবর্ত্তী গ্রীকভূবেত্তা প্লুলেমি, সমুদ্র সহ গঙ্গাসঙ্গমের নিকটবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগকে, "গঙ্গারিদে" [২] অর্থাৎ গঙ্গারাঢ় নামে

১। এই "লাল" শব্দ পালীভাষায় রাঢ় শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া জানা যায়।

* [মহাবংশের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত ও সভাপর্ব্বে সিংহলদেশের উল্লেখ আছে।
"সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মণিমুক্তাস্তথৈব চ। শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্" ॥ সভাপর্ব্ব।
সুতরাং বিজয়সিংহ হইতে সিংহল নাম হওয়া সম্ভাবিত নহে।]—পঃ সঃ।

† মহাভারত। সভাপর্ব্ব। রাজসূয়কালে ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, বঙ্গের রাজা বাসুদেবকে পরাজয় করেন।

২। গঙ্গারিদে (Gangaride) শব্দে কেহ "গঙ্গার্দ্ধ," কেহবা গঙ্গারিদয়, কেহবা কিছুই বিবেচনা করেন না। বস্তুতঃ উহা যে "গঙ্গারাঢ়" শব্দ তাহাতে সন্দেহ অতি অল্পই। রাঢ় শব্দ এরূপে নিষ্পন্ন, রাধ + ক্ত = রাঢ়, ইহার অর্থ নিষ্পন্ন হওয়া, এতৎ যোগে গাঙ্গরাঢ় বা গঙ্গারাঢ় শব্দ হইতে পারে, [illegible] অর্থাৎ [illegible] হইয়াছে; [illegible] গঙ্গাজলের দ্বারা যে দেশ পালিত হয়।

উল্লেখ করিয়াছেন [১]। এই স্থানের বিবরণ উক্ত দুইজন গ্রীক কর্ত্তৃক যেরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তদানীন্তন বঙ্গই সূচিত হয় এবং তমলুক বা তাম্রলিপ্তিকেও তাহার অন্তর্গত বলিয়া বুঝায়। বোধ হয়, তৎকালে সেই সমস্ত ভূভাগই, প্রদেশ নির্ব্বিশেষে, গাঙ্গরাঢ় নামে অভিহিত হইত; পরবর্ত্তীকালে তৎসমস্ত ভূভাগ আবার স্থান বিশেষে রাঢ় শব্দে কথিত হইয়াছিল। ইহাও নিঃসন্দেহে অনুমিত হইতেছে যে, পরবর্ত্তীকালে এই 'রাঢ়' শব্দই অপভ্রংশে রাঢ় * শব্দে পরিগণিত হইয়াছে। গঙ্গারিদের বিষয় বলিতে গিয়া মিগাস্থিনিস্ প্রথমেই বলিতেছেন যে, গঙ্গারিদের মধ্যে গঙ্গার ন্যূনকল্প প্রশস্ততা ৪ ক্রোশ এবং উর্দ্ধকল্প ১০ ক্রোশ। তখনকার কালের ভাগীরথী যাহা দিয়া গঙ্গার মূল-স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহার তদ্রূপ প্রশস্ততাই সম্ভব এবং নদী যতই সাগরমুখে গিয়া থাকে, ততই তাহার প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ৪ ক্রোশ হইতে ১০ ক্রোশ প্রশস্ততা কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহারা ১২।১৪ ক্রোশ পরিসর পদ্মা বা মেঘনার মূর্ত্তি দেখিয়াছেন; অথবা যাঁহারা বর্ত্তমান ভাগীরথীরই ডায়মণ্ডহারবার আদির নিকট প্রশস্ততা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার যথার্থতা অবগত হইতে পারিবেন।

তাহার পর মিগাস্থিনিস্ গঙ্গারিদেকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—প্রথম গঙ্গারিদে থান, ইহাই নিঃসন্দেহ তদানীন্তন বঙ্গ; দ্বিতীয় বিভাগ গঙ্গার দ্বীপ, ইহা তদানীন্তন তাম্রলিপ্তি এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে গাঙ্গেয় বদ্বীপের যে কিছু ভূভাগ তখন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে, বোধ হয়, এই শেষোক্ত ভূমির দ্বীপত্ব হেতু সমস্ত প্রদেশটাই তৎকালে গ্রীক ভৌগোলিকদের নিকট দ্বীপ শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকিবে। মিগাস্থিনিস্ বলিতেছেন যে, এই দ্বীপাখ্যাত গঙ্গারিদে অতিশয় প্রতাপশালী রাজ্য এবং ইহার অধিবাসীর সংখ্যা অতিশয় বিপুল; বসবাস সর্ব্বত্রই অতিশয় ঘন সন্নিবিষ্ট। তৃতীয় বিভাগ গঙ্গারিদে কলিঙ্গ; বলা বাহুল্য যে এই কলিঙ্গই মহাভারতে পুণ্যস্থলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক মহাভারতের নির্ণয় যে ঠিক, তাহা এই গঙ্গারিদে কলিঙ্গের অবস্থান দ্বারা জানা যায়। মিগাস্থিনিস, পুলেমি ও প্লীণি ইহারা সকলেই এই কলিঙ্গের অবস্থান গঙ্গার দক্ষিণেই সমুদ্রতীরে নির্ণয় করিয়াছেন। [২]

এক্ষণে এই প্রদেশে কিরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ্য ছিল, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত মিগাস্থিনিস প্রত্যেকের সৈন্য সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। গঙ্গারিদে থান বা বঙ্গের সৈন্য সংখ্যা,—এক হাজার অশ্ব, সপ্তশত হস্তী ও ষাইট হাজার পদাতি। গাঙ্গেয় দ্বীপাখ্যাত গঙ্গারিদে বা তাম্রলিপ্তি রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা,—চারি সহস্র অশ্ব ও পঞ্চাশ হাজার পদাতি। গঙ্গারিদে কলিঙ্গের সৈন্য সংখ্যা—এক হাজার অশ্ব সপ্তশত হস্তী ও

১। Mc Crindel's Ptolemy, pp. 172.

* [রাঢ় শব্দ সংস্কৃত রাঢ়ি শব্দের অপভ্রংশ।]—পঃ, সং।

২। Pliny, Book VI, Chap LXV and Mc Crindel's Ptolemy, pp. 231.

ষাইট হাজার পদাতি। তৎকালে মিগাস্থিনিস যত রাজ্যের বিবরণ দিয়াছেন, দেখা যায় যে, সে সমস্ত রাজ্য অপেক্ষা একমাত্র পাটলিপুত্রাধিপ মগধেশ্বরের সৈন্য সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মগধের সৈন্য সংখ্যা—ত্রিশ হাজার অশ্ব, নয় হাজার হস্তী এবং ছয় লক্ষ পদাতি। ইহাও এ স্থানে বক্তব্য যে চন্দ্রগুপ্তের এই সৈন্য, তিনিই তৎকালে ভারত-সম্রাট্ নামে বিখ্যাত ছিলেন।[১]

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত, কিন্তু অপরিজ্ঞাতনাম, একজন গ্রীকবণিক, "পেরিপ্লুস্ অব দি ইরিথ্রিয়ান" অর্থাৎ আরব্য সমুদ্রবাহী বাণিজ্য-বিবরণ নামে একখানি বাণিজ্য বিবরণের পুস্তক লিখিয়াছিলেন; ঐ পুস্তকে সেই কালে আরব্য সমুদ্র দিয়া ও মিসর এবং ইউরোপ ভূমির মধ্যে পরস্পরে কি প্রকারে ও কোন্ কোন্ দ্রব্যের বাণিজ্য চলিত, তাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ পেরিপ্লুস্ গ্রন্থ এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত গ্রীকভূবেত্তা প্তলেমির ভূবৃত্তান্ত পুস্তকে, অধুনাতন বঙ্গভূমির মধ্যে কিরাদিয়া নামক প্রদেশ এবং গঙ্গিনামক সামুদ্রিক বাণিজ্যবন্দরের উল্লেখ দেখা যায়।

কিরাদিয়া।—এই প্রদেশ ম্যাক্রিণ্ডেল প্রভৃতি[২] অনেকেই রঙ্গপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাহা খুব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে কিরাদিয়া নাম, করতোয়ারই গ্রীকরূপান্তর মাত্র। করতোয়ানদীপ্রবাহিত দেশ বলিয়া, এই ভূভাগকে সম্ভবতঃ করতোয়া প্রদেশ বলিত এবং সেই করতোয়াই গ্রীকের হাতে কিরাদিয়া * নাম ধারণ করিয়াছে। স্কন্দপুরাণের পৌণ্ড্রখণ্ডে করতোয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, করতোয়া নদীর জলে পৌণ্ড্রক্ষেত্র প্লাবিত হইত। ফলতঃ মালদহের উত্তর ভাগ হইতে ব্রহ্মপুত্রনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এই ভূভাগই সে কালের পৌণ্ড্ররাজ্য। দ্বিতীয়তঃ পেরিপ্লুসে এইস্থান যে তেজপত্রের ব্যবসায় জন্য বিখ্যাত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সেই তেজপত্র এখন এখানে অতি সুলভ, বন জঙ্গলে পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তেজপত্রের ব্যবসায়, একদিকে গঙ্গা বাহিয়া, তাম্রলিপ্তি হইয়া, সমুদ্রযানে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলস্থিত নীলকুণ্ডা বন্দরে গিয়া, তথা হইতে সমুদ্র পথে সুয়েজ দিয়া ইউরোপ ভূমে নীত হইত।[৩] অন্যদিকে এই প্রদেশের সীমান্তভাগে, প্রতিবৎসরে একটা করিয়া মেলা হইত এবং সেই মেলায় চীনদেশীয় লোক আসিয়া স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে তেজপত্র লইয়া যাইত। চীনদিগের সহ ব্যবসায় সম্বন্ধে পেরিপ্লুসে এরূপ বিবরণ দেওয়া আছে—[৪] "ইহারা

১। উপরে মিগাস্থিনিসের নাম যাহা কিছু প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইল, তৎসম্বন্ধে Megasthenes Frag. LVI & LVI B দ্রষ্টব্য।

২। Mc Crindel's Ptolemy, pp. 219 & Periplus pp. 145.

* [কিরাদিয়া সম্ভবতঃ কিরাতদেশ শব্দেরই অপভ্রংশ। সকল পুরাণেই ভারতের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী 'কিরাত' জনপদ ও সেই জনপদবাসী 'কিরাত' যাতির উল্লেখ আছে।]— পঃ সম্পাদক।

৩। Mc Crindel's Periplus, pp. 142—47.

৪। Mc Crindel's Periplus, pp. 148—49.

দেখিতে খর্ব্ব বর্ত্তুলাকার, মুখ চ্যাপটা এবং আকার প্রকারে বন জন্তু সদৃশ; কিন্তু তাহা হইলেও, স্বভাবতঃ ইহারা শান্ত প্রকৃতি। ইহারা সস্ত্রীক ও সপুত্রক এই মেলা স্থানে আসিত এবং ব্যবসায়ার্থে পাটিতে জড়াইয়া দ্রব্যের বোঝা সবল সঙ্গে করিয়া আনিত। পাটিগুলি দেখিতে নবীন দ্রাক্ষালতার পত্রের ন্যায়। যেখানে তাহাদের দেশের সীমায় করতোয়া প্রদেশ সংমিলিত হইয়াছে, তথায় মেলাস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখানে তাহারা পাটি বিছাইয়া তাহারই উপর দ্রব্যাদি সাজাইয়া বসিত এবং মেলার কয়েকদিন উৎসবের সহিত কাটাইয়া, মেলা অন্তে তাহাদের সুদূর গৃহে প্রস্থান করিত।" চীনবাসীরা তেজপত্রের পরিবর্ত্তে রেশমী কাপড় ও রেশম বিক্রয় করিয়া যাইত। এই চীনবাসীর মধ্যে সম্ভবতঃ ভুটিয়া, আসামী, চীন প্রভৃতি নানা জাতিই থাকিত; যদিও পেরিপ্লুসে তাহারা এক সাধারণ চীন নামে বর্ণিত হইয়াছে বটে।

গাঙ্গি।—এই গাঙ্গি কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের গবেষণায়, নানা স্থলই নির্ণীত হইয়া থাকে।[১] কিন্তু এটা কাহারও বিবেচনায় আইসে না যে, তৎকালে বাঙ্গালা দেশে একমাত্র সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্দর তাম্রলিপ্তি ভিন্ন দ্বিতীয় ছিল না; অথচ গাঙ্গির নাম ও বর্ণনা দৃষ্টে স্পষ্টতঃই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা গঙ্গার সহ সম্বন্ধবিশিষ্ট একটী সামুদ্রিক বন্দর। এই গাঙ্গি ফলতঃ অন্য কিছুই নহে, উহা "গাঙ্গেয়" বন্দর শব্দের গ্রীকরূপান্তর মাত্র এবং এই গাঙ্গেয় বন্দর গঙ্গার সর্ব্বদক্ষিণস্থিত ও গঙ্গা মুখে প্রবেশের পথে অবস্থিত বলিয়া, নিঃসন্দেহ তাম্রলিপ্তিই তদ্রূপ নামেও কথিত হইত। অথবা প্রদেশের নাম তাম্রলিপ্তি এবং নগরের নাম "গাঙ্গেয়" বা "গাঙ্গী" এইরূপ যাহা হয় একটা ছিল। ফলতঃ এই গাঙ্গী যে তাম্রলিপ্তি বন্দর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গঙ্গা দিয়া ও এই গাঙ্গি নামক বন্দর হইয়া তৎকালে সমুদ্রপথে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইত, তৎসম্বন্ধে পেরিপ্লুস হইতে এইরূপ তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১। চীনাংশুক।—বাকট্রিয়া হইয়া বরোচ বন্দরে আসিয়া, তথা হইতে সমুদ্রপথে নীত হইয়া গঙ্গা দিয়া বঙ্গভূমে প্রবেশ করিত।

২। মুক্তা।—তাম্রপর্ণী অর্থাৎ সিংহল হইতে গাঙ্গি বন্দরে আসিত।

৩। শঙ্খ।—উত্তর বঙ্গ হইতে আসিয়া গাঙ্গি দিয়া ও জাহাজ যোগে অন্যান্য দেশে নীত হইত।

১। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের গাঙ্গি সম্বন্ধে গবেষণার দৌড়টা একবার দেখিবার বিষয় বটে। হিরীনের মতে গাঙ্গি কলিকাতার ২০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত ধুলিয়াপুর। উইলফোর্ডের মতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে হস্তিমলগ্রাম, যথায় হাতি ধরা হইয়া থাকে। মরের মতে চট্টগ্রাম। টেলরের মতে ঢাকা জেলায় সুবর্ণগ্রামের নিকট। কনিংহামের মতে যশোহর। সেণ্টমার্টিনের মতে বর্দ্ধমান নর্দ্দমান। অন্য এক জন ভৌগলিক লাসার মতে কলিকাতা এবং স্বয়ং টলেমির অনুবাদক মাক্রিণ্ডেলের মতে দক্ষিণ বেহারের অন্তর্গত গঞ্জী নামক বেদিয়া জাতির গঞ্জীব নামক গ্রাম।

৪। তেজপত্র।—উত্তর বঙ্গ হইতে গঙ্গা বাহিয়া গাঙ্গি বন্দরে আসিয়া, তথা হইতে জাহাজে ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ মুসিরি ও নীলকুণ্ডার যাইয়া, সেখান হইতে ইউরোপ ভূমে নীত হইত। অন্তদিকে স্থলপথে চীনদেশে যাইত।

৫। থস্থস্।—উহাও গঙ্গা বাহিয়া গাঙ্গি নগরে গিয়া সমুদ্রযোগে বিদেশে নীত হইত।

৬। অত্যুৎকৃষ্ট মস্‌লিন কাপড়।—ইহা বাঙ্গালার অভ্যন্তর হইতে গঙ্গা বাহিয়া, পরে জাহাজ যোগে আরব দেশে যাইত এবং তথা হইতে অন্যান্য দেশে নীত হইত।

৭। কলিত।—কলিত নামক স্বর্ণমুদ্রা,[১] যাহা তৎকালে বঙ্গভূমে চলিতছিল, তাহাও গাঙ্গি দিয়া সমুদ্রযোগে বিদেশে নীত হইত।

পেরিপ্লুসে ভারতীয় বাণিজ্যের আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ক আরও বহুতর দ্রব্যের তালিকা দেওয়া আছে। কিন্তু যে যে দ্রব্য স্পষ্টতঃ বঙ্গভূমি ও গাঙ্গিবন্দরের সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই মাত্র এখানে গ্রহণ করিলাম। ইহা ভিন্ন পেরিপ্লুসে উক্ত অপরাপর দ্রব্যও যে বঙ্গভূমের সঙ্গে আমদানী রপ্তানী না ছিল, এমন নহে। কিন্তু যখন তাহার মধ্যে কোনটারই নাম বঙ্গভূমির সংস্রবে উল্লিখিত হয় নাই, তখন আমিও তাহার কোনটার নাম এখানে গ্রহণ করা যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিলাম না। সে সমস্ত দ্রব্যের উল্লেখও এত অধিক যে, এখানে তাহাদের তালিকা দেওয়ার স্থানও সঙ্কুলান হইয়া উঠে না। যাহার কৌতূহল হইবে, তিনি তাহা পেরিপ্লুসে স্বয়ং দেখিয়া লইবেন।[২] গঙ্গা হইতে সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোত সম্বন্ধে পেরিপ্লুসে নানারূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এক প্রকার এই, এক এক কাঠের অতি বৃহৎ নৌকা, এরূপ দুই বৃহৎ নৌকা পাশাপাশি ভাবে যুড়িয়া বাঁধা হইত; যাহাকে চলিত কথায় নৌকার সাংড়া কহে, পেরিপ্লুসেও এই যোড়া-নৌকার নাম সাঙ্গারা (Sangara.) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার অতি বৃহৎ জলযান, বর্ত্তমান জাহাজের ন্যায়। তদ্ভিন্ন পেরিপ্লুসের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ভারতের পূর্ব্ব উপকূল হইতে পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানেই, দেশীয় জাহাজ সকল উপকূল ভাগে বাণিজ্য করিয়া ফিরিত।[৩]

ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে ইহার অতিরিক্ত আর কোন সংবাদ প্রাচীন বঙ্গ সম্বন্ধে পাওয়া যায় না। ইহার পরে ফাহিয়ান্ ও হিউএন্ সিয়াং নামক দুইজন চীন-

---

১। "কলিতকলধৌতলিপেরিব প্রতিজয়লেখম্।"—গীতগোবিন্দ। বোধ হয় এই কলিতও, পেরিপ্লুসোক্ত সেই কলিত নামক স্বর্ণমুদ্রা।

২। Mc crindel's Periplus of the Erecthrean, II. 39. তাহা ছাড়া পুস্তকের মধ্যে আরও নানা স্থানে দ্রব্যাদির তালিকা দেওয়া আছে।

৩। "In these marts are found those native vessels for coasting voyages which trade as for as Limurike, and another kind called Sangara, made by fastening together large vessels formed each of a single timber, and also others called Kolandiophonta, which are of great bulk and employed for voyages to Khruse and the Ganges." Mc. Crindel's Periplus, pp 142.

পরিব্রাজকের নিকট হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। ফাহিয়ান্ খৃষ্টীয় ৩৯৯ শকে চীনদেশ হইতে ভারতভ্রমণে বহির্গত হইয়া, ভ্রমণ-সমাধানান্তে ৪১৪ খৃঃ অব্দে চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু তিনি বাঙ্গালা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। তিনি ভাগলপুরের অন্তর্গত চম্পানগর হইতে বরাবর গঙ্গা বাহিয়া তাম্রলিপ্ত নগরে আইসেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাম্রলিপ্ত সমুদ্রতটে, তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম অপ্রচলিত ছিল না এবং তথায় তিনি বৌদ্ধদিগের ২৪টি সঙ্ঘারাম দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়া, সিংহল যাত্রা করেন। চৌদ্দ দিনের দিন সিংহলে উপস্থিত হন। তিনি সিংহলে দুই বৎসর থাকিয়া যবদ্বীপে গমন করেন এবং যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ধর্ম্মেরই প্রাবল্য দেখিতে পান। বৌদ্ধধর্ম্ম তথায় একরূপ অপরিজ্ঞাতই ছিল বলিতে হইবে। তাহার পর, যবদ্বীপ বা যাবা হইতে জাহাজে উঠিয়া চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে সকল জাহাজ তৎকালে চলাচল করিত, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না, যেহেতু ফাহিয়ান্ যে জাহাজে গিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটায় দুইশতাধিক লোক থাকিত এবং যে ব্রাহ্মণের এখন সমুদ্রগমনে জাতি যায়, সেই ব্রাহ্মণ আরোহীও তাহাতে অনেক ছিল।

হিউএনৃসিয়াং চীনরাজ্যে হোনান্ প্রদেশে চিনলিউ সহরে খৃষ্টীয় ৬০৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে বৌদ্ধযতি সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়া, বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে ভিক্ষু পদবীতে উন্নীত হয়েন। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল তত্ত্ব চীনরাজ্যে অমীমাংসিত বা সন্দেহ সংযুক্ত ছিল, তাহারই মীমাংসা ও সন্দেহ নিরাকরণার্থে এবং বহুতর বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ ও বৌদ্ধতীর্থ সকল দর্শনের নিমিত্তও বটে, হিউএনৃসিয়াং খৃষ্টীয় ৬২৯ অব্দে চীন হইতে যাত্রা করিয়া, ভারত ভ্রমণান্তর খৃষ্টীয় ৬৪৫ অব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

হিউএনৃসিয়াং বাঙ্গালাদেশে আসিয়া তথায় এই কয়টি রাজ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন,— পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ। কিন্তু কোন রাজ্যের রাজধানীর নাম উল্লেখ করেন নাই।

হিউএনৃসিয়াং কর্ত্তৃক উক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও প্রাচীন পুণ্ড্রভূমি একই দেশ। অনেকে অনুমান করেন যে মালদহের তিন ক্রোশ ও প্রাচীন গৌড়নগরের নয় ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বস্থিত প্রাচীন পাণ্ডুয়ানামক স্থানে পৌণ্ড্রের রাজধানী ছিল। আমারও তাহাই বোধ হয়। এখানে প্রাচীনভগ্নাবশেষ এখন পর্য্যন্ত অনেক আছে। কিন্তু প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী ইংরেজ কনিংহামের নির্ণয়ে, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত করতোয়াতটে মহাস্থানগড় নামক স্থানে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান ছিল। চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অতি ঘন বসতিযুক্ত দেশ। ইহার রাজধানীর চতুঃসীমা প্রায় ২॥০ ক্রোশ হইবে এবং এখানে পুষ্করিণী, রাজকীয় অট্টালিকা ও পুষ্পবাটিকা সকল পর পর পর্য্যায়ক্রমে শ্রেণিবদ্ধরূপে শোভা পাইত। হিউএনৃসিয়াং এখানে কাঁঠাল দেখিয়া ও খাইয়া বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন এবং অতি আহ্লাদের সহিত কাঁঠালের বর্ণনাও লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ এই প্রদেশে বাঙ্গালার অন্তান্ত

বিভাগ অপেক্ষা, কাঁঠাল এখনও অত্যধিক বা অপরিমিত জন্মিয়া থাকে। এক এক গাছে এত কাঁঠালের ফল আমি কোন স্থানে দেখি নাই। হিউএন্‌সিয়াং এখানে ২০টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে তিন সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়াছিলেন, কিন্তু দেবমন্দির ও হিন্দুর সংখ্যাই অনেক এবং নগ্ন নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীর দলও কম ছিল না। তিনি লোকপ্রকৃতি বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, অধিবাসীরা বিদ্যানুরাগী।[১]

সমতট।—ইহার অবস্থান ও আয়তন পরে বলা হইয়াছে।[২] ইহার তাৎকালিক রাজধানী কোথায় ছিল বলা যায় না, তবে হিউএন্‌সিয়াং এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, এ রাজধানীও চতুঃসীমায় ২॥০ ক্রোশ আয়তন হইবে। তিনি এখানে ৩০টি সঙ্ঘারামে দুই সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দুর সংখ্যাই অনেক ও তাহার মধ্যে নগ্ন নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীর দল অতিশয় বেশী। এখানকার লোক সকলও বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য বিশেষ যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়া থাকে।

তাম্রলিপ্তি।—ভূমধ্যে যে সমুদ্রবাহু প্রবেশ করিয়া আছে, অর্থাৎ তদনীন্তন গাঙ্গেয় বদ্বীপের অভ্যন্তরস্থিত যে সমুদ্রশাখা, তাহারই উপকূলভাগ হইতে তাম্রলিপ্তি রাজ্যের অবস্থিতি। এখানকার অধিবাসীরা সাহসী, কষ্টসহ এবং ধনসম্পদ্‌সম্পন্ন। নগরে মণিমুক্তা ও অত্যাশ্চর্য্য বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইত। হিউএন্‌সিয়াং এখানে ১০টি সঙ্ঘারামে এক সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত এবং হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীও বহু-সংখ্যক দেখিতে পাইয়াছিলেন।

কর্ণসুবর্ণ।—ইহারও রাজধানীর চতুঃসীমা প্রায় ২॥০ ক্রোশ হইবে। এই প্রদেশে অতিশয় ঘন বসতি। ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। লোক সকল অতিশয় বিদ্যানুরাগী এবং বিদ্যা উপার্জ্জনে অতিশয় যত্ন করিয়া থাকে। তাহারা অতি সৎ ও মধুর প্রকৃতি। হিউএন্‌সিয়াং এখানেও দশটি সঙ্ঘারামে দুই সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। রাজধানীর অল্প দূরে আরও তিনটি বৃহৎ ও সুনির্ম্মিত সঙ্ঘারাম ছিল, তথায় প্রধান প্রধান বিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ বাস করিত।

কর্ণসুবর্ণের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নামক পুর কোথায় ছিল, তৎ সম্বন্ধে হিউএন্‌সিয়াংএর ইংরেজী অনুবাদক বীল নির্দ্দেশ করেন যে উহা ভাগলপুরের নিকটস্থিত কর্ণগড় নামক স্থান। বলা বাহুল্য যে এ নির্ণয় কোন মতেই প্রামাণিক ও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কর্ণসুবর্ণ প্রদেশ ভাগীরথীর পশ্চিম তটস্থিত বঙ্গেরই যে অংশ বিশেষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রীক ভূবেত্তা প্তলেমি লিখিয়াছেন যে, গঙ্গারাঢ় প্রদেশে গঙ্গার উপরে কর্ত্তাসিনা (Kartasina) নামে নগর। প্তলেমির ইংরেজী অনুবাদক মাক্রিণ্ডেল[৩] লিখিতেছেন

১। Beal's Buddhist's Records of the Western World, Vol I, Fo kwo ki.

২। অধুনাতন পূর্ব্ববঙ্গের দক্ষিণাংশে, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি জেলা। "পরে বলা হইয়াছে", অর্থাৎ অন্য আর একটি প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

৩। Mc Crindel's Ptolemy, pp. 172

যে, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের নিকট করসোণাগড় নামক স্থানই এই স্থলেমির কার্ত্তাদিনা। আমিও এই করসোণাগড়কেই কর্ণসুবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম, যদি করসোণাগড় কোথায় তাহা জানিতে পারিতাম। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলা, ভ্রমণকালেও করসোণাগড়ের কথা কোথাও শুনি নাই, অথবা মুর্শিদাবাদ জেলার পোষ্ট আফিসের ভিলেজ ডিরেক্টরীতেও করসোণাগড়ের নাম কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।[১] তবে ঐ জেলার রাঙ্গামাটী নামক স্থানের নিকটে অনেক প্রস্তরময় বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায় এবং হিউএনসিয়াং কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর অনতিদূরস্থিত যে তিনটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের সুনির্ম্মিত ও বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ করেন, সম্ভবতঃ এ গুলি তাহারই ভগ্নাবশেষ হইলেও হইতে পারে। ফলতঃ রাজধানী যেখানেই হউক, কর্ণসুবর্ণ প্রদেশ ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থিত উত্তরদিকস্থ ভূভাগ। ইহা সম্ভবতঃ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল এবং সেই জন্যই বাণভট্ট কর্ণসুবর্ণ ও গৌড়কে একদিকে যেমন এক বলিয়াছেন, অন্যদিকে হিউএনসিয়াং তেমনি গৌড়রাজ্যের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। তাহা হইলে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান উপরে যেরূপ নির্ণয় করিলাম, তাহাই যে সম্পূর্ণ ঠিক, তাহা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে। পুণ্ড্রভূমির রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা মালদহের নিকট প্রাচীন পাণ্ডুয়া। সুতরাং পুণ্ড্ররাজ্য ও কর্ণসুবর্ণ সংলগ্ন থাকায়, সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণরাজ স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত রাখিবার জন্যই সীমান্তভাগে গৌড় নামে নগর স্থাপন করেন এবং এই নগরই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইতে থাকায়, তৎকালেই কর্ণসুবর্ণ কখনও কখনও গৌড় নামেও আখ্যাত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

আবার বাণভট্টের কিছু পূর্ব্বেই প্রাদুর্ভূত বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় দেখা যায় যে, তিনি পৌণ্ড্র, গৌড়, বঙ্গ ও বর্দ্ধমান এ সকলের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ পৌণ্ড্র হইতে যে গৌড় পৃথক্, তাহা উপরে যথেষ্ট পরিমাণেই প্রদর্শন করা গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গ যে সেইরূপ গৌড় ও বর্দ্ধমানাদির অতিরিক্ত একটা পৃথক্ রাজ্য ছিল, তাহা বোধ হয় না। বরং ইহাই বোধ হয় যে বঙ্গ, গৌড় ও বর্দ্ধমান, এ উভয়ের সমষ্টিবোধক সাধারণ নাম ছিল। কারণ গৌড় ও বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া তৎকালে বঙ্গ বলিতে যে সংকীর্ণ ভূভাগ বুঝাইত, সেই বঙ্গের যে কখনও পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল, তাহা কোন প্রমাণে কোথাও জানিতে পারা যায় না।* তবে বর্দ্ধমান ও গৌড় সম্ভবতঃ তখন দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়া থাকিবে। কর্ণসুবর্ণ নামে গৌড় যে তখন পৃথক্ রাজ্য ছিল, তাহা নিশ্চয়। এখন কথা হইতেছে যে বর্দ্ধমানও তদ্রূপ পৃথক্ রাজ্য ছিল কিনা। সম্ভবতঃ ছিল, কারণ

১। ঘটকগ্রন্থে দেখা যায় যে, বারেন্দ্র কায়স্থদের মধ্যে "দে" কায়স্থেরা কাণসোণা গ্রামে বাস করেন। কাণসোণা দে কায়স্থদের এক সমাজ। এই কাণসোণা কোথায়, তাহাও পোষ্টাফিসের Village Directory তে খুঁজিয়া পাইলাম না। বোধ হয় ইহার অবস্থান নিরূপিত হইলে কর্ণসুবর্ণ নামক প্রাচীন নগরের অবস্থান সম্বন্ধে কতকটা কিনারা হইতে পারিত। কাণসোণা যেন কর্ণসুবর্ণেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

তিরুমলয় গিরি হইতে আবিষ্কৃত খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তখন বাঙ্গালায় উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় নামে দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল এবং তখন উত্তররাঢ়ের রাজা ছিলেন মহীপাল ও দক্ষিণরাঢ়ের রাজা ছিলেন রণশূর।[১] বলা বাহুল্য যে কর্ণসুবর্ণ ও গৌড়ই তৎকালের উত্তররাঢ় ও বর্দ্ধমানাদি দক্ষিণরাঢ়। উক্ত শিলালিপিতে বাঙ্গালার মধ্যে পুণ্ড্রভুক্তি ও বঙ্গালদেশ নামে আরও দুইটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। পুণ্ড্রভুক্তি প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং যে "বঙ্গাল" রাজ্যের নাম উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন বঙ্গ নহে, উহা প্রাচীন সমতট বা এক্ষণে যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বা বাঙ্গাল দেশ বলা যায়।

যাহা হউক, গৌড়নগর ও গৌড়রাজ্যের নাম, আমরা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ওদিকে আর কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাই না।[২] উহার প্রাচীনতম উল্লেখ যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে বাণভট্ট ও বরাহমিহির সর্ব্বপ্রাচীন। গ্রীকভূবেত্তা প্তলেমির সময় এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিলে, তৎকর্ত্তৃক উল্লিখিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। হইতে পারে এই নগর অনেক পূর্ব্ব হইতেই সংস্থাপিত, কিন্তু বাণভট্ট ও বরাহমিহিরের কিছু পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই গৌড় এ পর্য্যন্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পৃথক্ রাজা ও পৃথক্‌রাজ্যের রাজধানীরূপে গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যকালে, মহারাজ আদিশূরকে সিংহাসনে আরূঢ় দেখিতে পাওয়া যায়। আদিশূরের সময় লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক আছে, কিন্তু সে বিচারের স্থান এখানে নহে, প্রবন্ধান্তরে তাহা বিবেচ্য। এখানে যাহা আমার বিশ্বাস, তদনুরূপ "বেদবাণাঙ্গশাকে" অর্থাৎ ৭৩২ খৃঃ অব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ-আনয়নের কাল ধরিয়া, আদিশূরের সময়কে মোটামুটি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্য বলিয়া ধরিলাম। যাহা হউক, এই আদিশূরের সময়েই দেখা যায় যে, গৌড় অতিশয় প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে, এবং পূর্ব্বতন কর্ণসুবর্ণ, বর্দ্ধমান, সমতট, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আদি সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক রাজ্যে পরিণত হইয়া, সমস্ত রাজ্য বাঙ্গালা বা গৌড়রাজ্য আখ্যায় আখ্যায়িত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলতঃ সমস্ত বাঙ্গালায় একছত্র নৃপবর্গের মধ্যে মহারাজ আদিশূরকেই আদি ও প্রথম বলিতে হয় এবং তাঁহা হইতেই গৌড়ের সমৃদ্ধি ও সমস্ত বাঙ্গালার গৌড়রাজ্য নাম হয়। মহারাজ আদিশূরের পরেও বাঙ্গালা দেশকে অনেক সময় অনেক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও, সমস্ত বাঙ্গালার যে গৌড় আখ্যা, আদিশূরের

১। বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ টিপ্পনীতে। ৬০৯ পৃঃ।

২। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় নোটে লিখিত আছে যে, খৃষ্ট জন্মের [illegible] বৎসর পূর্ব্বে গোজলগৌড় নামক রাজাকর্ত্তৃক গৌড়নগর স্থাপিত হয়। কথাটা শুনিতে অতি কর্ণসুখকর, তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু স্বদেশের প্রাচীনত্বে কাহার না আনন্দ উপস্থিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কথাটা অপ্রামাণিক। ইতিহাসে বহুতর গৌড়নামক স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা, প্রাচীন অযোধ্যার নিকটস্থ গৌড়, কৌশাম্বীর নিকটস্থ গৌড়, বেরার রাজ্যের নিকটস্থ গৌড় ইত্যাদি। কিন্তু এ সকলের মধ্যে বাঙ্গালার গৌড়ই ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করে, এবং গৌড় ও গৌড়রাজ্য বলিলে, সাধারণতঃ বাঙ্গালারই রাজধানী ও বাঙ্গালারাজ্য বুঝাইয়া থাকে।

সময় হইয়াছিল, তাহা তাহার পর হইতে যতদিন পর্য্যন্ত গৌড় নগরের অস্তিত্ব ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আর কখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল।

বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি ধর্ম্মঠাকুরের পুঁথি আছে। ময়ূরভট্ট ধর্ম্মায়ণের আদি কবি। তিনিও আবার হাকন্দপুরাণ অনুসারে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ময়ূরভট্টের পর খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গলের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। খেলারামের পর রূপরাম ও ঘনরাম। ইহারা ভিন্ন রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ধর্ম্মমঙ্গলের পুস্তক লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতেও আবার বৈষ্ণব গ্রন্থ ও রামায়ণ মহাভারতাদির জন্য বঙ্গীয় পাঠককুলের যত আগ্রহ ধর্ম্মঠাকুরের পুঁথির জন্য তত নহে; কারণ বঙ্গবাসীর ধর্ম্মমঙ্গল প্রচার করিবার পূর্ব্বে শিক্ষিত সমাজে ধর্ম্মঠাকুরের নামও জানা ছিল না। এই আট দশ বৎসরের মধ্যেই পাঁচ ছয় খানি ধর্ম্মায়ণ পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এরূপ অনুসন্ধান চলিতে থাকিলে আরও অনেক পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এক এক খানি ধর্ম্মঠাকুরের পুঁথি অতিশয় বিস্তারিত। উহার গান বার দিনে শেষ হয়। ধর্ম্মঠাকুরের গান গাহিয়া আজিও অনেকে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে এবং ধর্ম্মঠাকুরের গান শুনিয়া নিম্ন শ্রেণীর বহু লক্ষ লোক কৃতার্থ হইতেছে। অনেক কবি এই গান লিখিবার জন্য মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়াছেন। মাণিকগাঙ্গুলি বাঙ্গাল-মেলের লোক, বাঙ্গাল-মেল রাঢ়ীশ্রেণীর ছত্রিশ মেলের একটি, সুতরাং তিনি সুব্রাহ্মণ, ঘনরামের মত চণ্ডালের ব্রাহ্মণ নহেন। মাণিকের বাড়ী বেলডিহা, রাঢ়ে। তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে তুঙ্গাড়ী যাইতেছেন, পথে ব্রাহ্মণবেশে ধর্ম্মঠাকুর দেখা দিলেন। ধর্ম্মঠাকুর দেখিলেন এমন সুব্রাহ্মণকে দিয়া যদি গান লিখাইয়া লইতে পারি, তা'হ'লে ভদ্রলোক মহলেও আমার একটু পসার হয়। তিনি নাছোড়বন্দা হইয়া মাণিককে ধরিলেন;—

"নিজ বীজ মন্ত্র লিখিয়া দিলেন নকল। ইহা দেখি কবিতা রচিবে অবিকল॥
গাজেন হবেন তোর চতুর্থ সোদর। জগত ভরিয়া যশ হবেক বিস্তর॥"

শুনিয়া মাণিকতো অবাক্! ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ছেলে, একজন গান রচিলে, আর একজন গাহিবে? কি সর্ব্বনাশ!!! তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার মনের ভাব তাঁহার নিজের কথাতেই ব্যক্ত করিব;—

"এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ। জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবে দেশে দেশে। স্বপক্ষের সন্তোষ বিপক্ষ পাছে হাসে॥"

ধর্ম্মঠাকুর তবু ছাড়িলেন না, লোভ দেখাইয়া আত্মীয়তা করিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন;—

"জগত ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি। তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন। ময়ূরভট্টের কথা মন দিয়া শুন॥
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তাকে বিষ্ণুভক্তি দিয়া। অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া॥"

মাণিকচন্দ্র এ টোপটি ছাড়িতে পারিলেন না। স্বীকার পাইলেন। জানা গেল, ধর্ম্মঠাকুরের গান লিখিয়া ময়ূরভট্টতো বৈকুণ্ঠে আছেনই; মাণিকচন্দ্রও তথায় যাইবেন; হয়তো রামচন্দ্র কবিও যাইবেন, ঘনরাম খেলারাম রূপরামের তো কথাই নাই।

এ ধর্ম্মঠাকুরটি কে? দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার উপাধি রায়। বোড়াল হইতে যিনি আমরক্তের ঔষধ দেন তাঁহার নাম কুদি রায়, মেমারির পশ্চিমে যিনি পিত্তদোষের ঔষধ দেন তাঁহার নাম অচল রায়, মাণিক গাঙ্গুলি মহাশয়ের যিনি মুরুব্বি হইয়াছিলেন তাঁহার নাম বাঁকুড়া রায়। রায়শব্দটি সংস্কৃত রাজশব্দ ভাঙ্গা। ধর্ম্মঠাকুর অনেক জায়গায় রাজ উপাধিতে বিশোভিত। ঘেঁটুগাছিতে তিনি ধর্ম্মরাজ, নদীয়ার নিকট জামালপুরে তিনি বুড়ো রাজ। সময়ে সময়ে তিনি সিংহও হইয়া থাকেন। মাণিকের পুঁথি হইতে স্থানভেদে তাঁহার নামভেদ দেখাইতেছি—

"প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাৎপর। স্থানে স্থানে মূর্ত্তিভেদ মহিমা বিস্তর॥
বেলডিহার বাঁকুড়ারায়ে বন্দি একমনে। অসংখ্য প্রণতি শীতলসিংহের চরণে॥
ক্ষুদ্রের ফতেসিং বৈতলের বাঁকুড়ারায়। শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়॥
পাণ্ডুগ্রামের বুড়াধর্ম্মে বন্দিয়া সাদরে। শ্যামবাজারের দলুরায়ে দিয়ে জয় জয় কারে॥
দেপুরে জগৎরায়ে যোড় করি কর। গোপালপুরের কাঁকড়াবিছায় বন্দি তার পর॥
সিয়াসের কালাচাঁদে ঝিঁদাসের বাঁকুড়ারায়। বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায়॥
গাপুরের স্বরূপনারায়ণ স্বর্ণসিংহাসনে। বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপনারায়ণে॥
পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া তাঁহায়। বড়ুজা গ্রামের বন্দিব মোহনরায়॥
গুড়ুড়া গ্রামের বন্দি শীতলনারায়ণে। জালগুড়ডিহার খুদিরায়ে বন্দি সাবধানে॥
আকুটিকুন্নার মাতার ধর্ম্মের করিয়া স্তবন। বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিয়া চরণ॥
জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিল্যা সহিত। জাজপুরে দেহারে বন্দি দার্ঢ্য করি চিত॥"

এত গেল দক্ষিণরাঢ়ের। উত্তররাঢ়েও এইরূপ গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মঠাকুর আছেন।

তাঁহার নামভেদও অসংখ্য। নিজ কলিকাতায় কিছু কম দশ বারটী ধর্ম্মঠাকুর আছেন, তন্মধ্যে যাঁহার নামে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, তাঁহার জাঁক কিছু বেশী। বলরামদের ষ্ট্রীটে একটি সরু গলি মধ্যে খাসা মন্দির আছে, মন্দিরের মাথায় একটী খোদিত লিপিও আছে, মন্দিরটি একজন কায়স্থের দেওয়া।

ধর্ম্মঠাকুরকে কোন কোন স্থলে বিষ্ণুরূপে পূজা করে, তুলসী দেয়, বলিদান করে না। কোথাও শিবরূপে পূজা করে, বিল্বপত্র দেয়। কোথাও বা ছাগবলি, মেষবলিও দেয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মুরগী শূকর বলিই হয়। ধর্ম্মঠাকুরের পুরোহিত—কোথাও কৈবর্ত্ত, কোথাও দুলে, কোথাও বাগ্দী, কোথাও আগুরি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ডোম বা পোদ। শেষোক্ত দুই জাতি এখনও ব্রাহ্মণ লয় নাই, এখনও তাহারা আপনাদের জাতীয় পণ্ডিত দিয়া সব কাজ করায়। ধর্ম্মঠাকুর ইহাদের নিজস্ব দেবতা।

এই ধর্ম্মঠাকুর কে? যে কোন ধর্ম্মায়ণ পাঠ কর, দেখিবে, তিনি ইচ্ছায় সৃষ্টি করিতেছেন! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁহার সৃষ্টির অংশ মাত্র। কোন পুস্তকে তাঁহার নাম আদ্য, কোন পুস্তকে তাঁহার নাম অনাদ্য। ঘনরামের পুস্তকে দেখিতে পাই, তাঁহার বার্ম্মতি গাওয়া হইতেছে। কেহ কেহ বার্ম্মতি ভাঙ্গিয়া বারমতি করিয়াছেন। অর্থ করিয়াছেন, বার দিনে গান হয় বলিয়া উহার নাম বার্ম্মতি। কিন্তু বাস্তবিক কথাটি বার্ম্মতি, ঘনরাম দুই এক জায়গায় ব্রহ্মতি পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন।

"এতক্ষণে ধর্ম্মের বার্ম্মতি হইল সার।" ইহার অর্থ যদি এরূপ করা যায় তাহা হইলে সঙ্গত হয়, এতক্ষণে ধর্ম্মকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা সফল হইল অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মায়ণ লিখিয়া কবি প্রমাণ করিলেন যে ধর্ম্মঠাকুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের উপর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মস্বরূপ। ধর্ম্মঠাকুরের পুঁথি পড়িতে গেলেই একজন লোকের নাম সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম রমাই পণ্ডিত। ঘনরামের মতে ইনি জাতিতে বাইতি; ময়নাগড়ের কিছু দূরে ইনি ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিতেন। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী ইহারই আশ্রমে শালে ভর দিয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মপূজার আদি গুরু। ইহার লিখিত কোন গ্রন্থাদি পাইতে পারিলে ধর্ম্মতত্ত্ব ভালরূপে বুঝা যাইতে পারিবে, এই আশয়ে ময়নাগড়ে সোসাইটীর ভ্রমণকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণী অতি হৃদয়গ্রাহী বলিয়া পরিশিষ্টরূপে এই প্রবন্ধে সংযোজিত করিলাম।

ময়নাগড়ে রমাই পণ্ডিতের কোন পুস্তক পাইলাম না; কিন্তু যাহা পাইলাম তাহাতে আশা ও আগ্রহ আরও বৃদ্ধি হইল। জানিতে পারিলাম, যে রমাই পণ্ডিতের পদ্ধতি লইয়া অনেক স্থলে ধর্ম্মের পূজা হয়। পদ্ধতি ময়নাগড়ে পাওয়া গেল না, কিন্তু কয়েকটি বাঙ্গালা মন্ত্র পাওয়া গেল। সে গুলির ভাষা অনেক স্থলে অতি প্রাচীন, অনেক স্থলে বোধ হয় যেন পরবর্ত্তী লোকে কিছু কিছু বদলাইয়াছে, দুই এক স্থলে অর্থবোধই হইল না। কাব্যতীর্থ মহাশয় যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি লিখিয়া আনিয়াছেন আমরাও তেমনি উদ্ধৃত করিলাম।

ধ্যানের মন্ত্র ।

"বর্ণ যুগপতি সর্ব্ব গুণধাম । শুন শুন সর্ব্বজন যুগের বিধান ॥
সে দিনেতে ভৃঙ্গীভার আছিল মণ্ডলে । অন্ত বাসুকী নাগের জন্ম সেই কালে ॥
যোড় করিয়া নাগে জিজ্ঞাসে বারতা । এক মুণ্ডে ছিল তার সহস্রেক মাথা ॥
নির্ম্মাইলেন প্রেম হংসের বাতাসে । আসন করিয়া প্রভু মনের হরিষে ॥
জলেতে ডুবিল হংস আহার কারণে । কিছু না পাইয়া উঠে প্রভু সন্নিধানে ॥
　　গরল মুখের বিন্দু থাকে মস্তকের দেশে ।
নাগের নিশ্বাস কৈল ভাটায় জোয়ার । রাত্রদিন সৃজিলেন জনার দয়িতার ॥
তাহার উপরে রুধির প্রকাশ । দ্বিজ মুরতি কৈল আড়ম্ব কৈলাস ॥
যোগেতে মঙ্গল সৃজিলেন ভঙ্গীভার । অনন্ত কোটীদিগের কে করে বিচার ॥
কে করিতে পারে প্রভু আদ্যের জেয়ান । ঘটে আসি পূজা লও স্বরূপনারাণ ॥
হীন নর জন্ম মোর জাতির নাহি স্থিতি । লহ লহ জল পুষ্প যুগের যুগপতি ॥
গাছের বাকল নহি পত্রে নহি ছায়া । আগে আগে নিরঞ্জন নির্ম্মাইলেন কায়া ॥
তাঁহার ভকতে প্রভু করিলেন তার । বিষ্ণুর কারণে ভ্রমেন নৈরাকার ॥
আগেতে ছিলেন প্রভু ললিত অবতার । তিনরূপ হইলেন ভ্রমিলেন সংসার ॥
তবেতো ভ্রমণ কৈল পশ্চিম মুরতি । দক্ষিণে ভ্রমণ কৈল পূর্ব্বে আইলেন স্থিতি ॥
অঙ্গে হাত বুলাইতে সৃজিলেন পার্ব্বতী । দেখিতে সুন্দররূপ মনোহর জ্যোতি ॥
টলিল ধর্ম্মের বিন্দু দেবী নিল করে । ধর্ম্ম সমরিয়া মাতা পূরিল উদরে ॥
তিল প্রমাণ হৈয়া গড়িল বসুমতী । দিনে দিনে পার্ব্বতীর বাড়িল উদর ॥
চলিতে শকতি নাহি যুড়ে দুই কর । কে জন্মিল বলিয়া বলেন যজ্ঞেশ্বর ॥
ব্রহ্মতালু দিয়া হৈল ব্রহ্মের জনম । ব্রহ্মজালে বিষ্ণুর দহিছে তখন ॥
ক্ষীণকটি কুপিল কুমণ্ডল লৈয়া । হাতে বিষ্ণুর জন্ম হৈল কর্ণমূল দিয়া ॥
মনেতে বিচারি ত্রিদশেশ্বর । জীবত্রি শীতল কৈল ভূমিষ্ঠ মহেশ্বর ॥
তিনবার জনমিল এইতো উদরে । অপার মহিমা লীলা কে বুঝিতে পারে ॥
ধর্ম্মের মঙ্গল গীত পণ্ডিত রমাই গান । একমন রমাই দ্বিজ শয়ে লব ধান ॥"

ইহার দুই এক জায়গায় হেঁয়ালির মত বোধ হয় । প্রাচীন ভাষা অতি দুর্ব্বোধ, এই নিমিত্তই বোধ হয় ঐরূপ ।

ঠাকুরের স্নানের মন্ত্রটী এই——

স্নানের মন্ত্র—

"ওঁ আরতি ভারতি গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী । সরয়ূঃ গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা কৌশিকী ॥
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা । সদা স্বয় মনোস্পৃষ্য ভৃঙ্গারে ॥

জল লইয়া স্নান করেন ধর্ম্ম আগম জলে। অখণ্ড তুলসীপত্র দিয়া পদতলে॥
অভিগন্ধা চূড়ামণি করেন ভকতি। তুরিতে যে স্নান দেন গোসাঞি যুবতী॥
ঢোঙ্গে সমুদ্র এল গোসাঞি ক্ষীরনদী। গঙ্গা যমুনা এল বদর বদরী॥
শোভাধাত্রীগণ এল হোয়ে এক স্থানে। স্নান করেন প্রভু ভগবানে॥
স্নান আচলিত গীত পণ্ডিত রামএ গান। একল রামএ দ্বিজ শয়ে লব ধান॥"

রমাই'র কটি লেখা কিছু পাওয়া গেল—সুতরাং রমাই'র একখানি ধর্ম্মপূজার যে পদ্ধতি আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। রমাই'র পুস্তক অন্বেষণ করিবার জন্ত সোসাইটীর অন্ততম ভ্রমণকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থকে ঘাটাল অঞ্চলে পাঠাইলাম। তিনি যে সকল তত্ত্ব আনিলেন, তাহারও মধ্যে মধ্যে রমাই পণ্ডিতের নাম পাওয়া গেল, তিনিও মুখে মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন—

"ওঁ ষোল সহস্র গতি লয়ে শ্রীরমাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজা করিবারে যান। সেই পথ দিয়া ঋষি মুনি মার্কণ্ড যান ধূপে ধূনায় ধর্ম্মঘর দেখিবারে পান॥ কহেন মার্কণ্ড মুনি, শুন হে কপিল মুনি, কিসের শুনি জয় জয় কাথ। বলে মিথ্যাই আলম চাদা, মিথ্যাই বাজনা বাজে মিথ্যাই ধর্ম্ম উজন। ধর্ম্মরাজ বক্ত নিন্দা করে মুনি মার্কণ্ড যান জয় বলি বোধ হল ঋষি মুনির গায়। অষ্টকূট চেলি শূল ব্যাধি মুনি মার্কণ্ড স্থান। আদ্যের ধবল দিল মুনির মুখেতে জাঁতিয়ে রমাই পণ্ডিত বলে মধুর পুষ্করিণী দিবে পৃষ্ঠের জাঙ্গাল। মধু মাংসে এ ঘর করিবে একাকার॥ গতি ভক্তের উচ্ছিষ্ট মুনি কুড়ায়ে খাবে। তবে তো মার্কণ্ড মুনি অমর পদ পাবে॥

ঘাটাল হইতেও সংবাদ আসিল, রমাই পণ্ডিতই ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি করিয়াছেন। সে অঞ্চলের ধর্ম্মপূজার ধ্যানের মন্ত্র এই ;—

"স্বর্গ মর্ত্য না ছিল না ছিল যে পাতাল। উৎপত্তি না ছিল যম কাল॥ দেবা দেবী গুরু শিষ্য কেহ না ছিল। নীল অনিল ধর্ম্ম জন্ম যে লভিল॥ ধর্ম্মকে বাপে না দিলেন জন্ম। মায়ে না দিলেন উদরে ঠাঁই। শূন্তভরে জন্মিলেন অনাদ্য গোসাঞি॥ নিরঞ্জন নৈরাকার বুঝিতে না পারি। আপনি করিলেন প্রভু আপনার কায়া। হস্তপদ স্কন্ধ চক্ষু নিরঞ্জনের হইল। নয়ন মিলাইয়া তিনি দৃষ্টি মিলাইল॥ দেখিলেন নবখণ্ড ব্রহ্মা অগ্নিময়। তস্মাৎ দেব নিরঞ্জনায় নম॥"

ইহা পদ্য না গদ্য? ছেলা বেলা ঠানদিদির মুখে এইরূপ না পদ্য না গদ্য না মিল না অমিল ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনিতাম, একি সেই জাতীয় রচনা?

পরিশেষে কুলাল গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের যত্নে ও পরিশ্রমে রমাই পণ্ডিত কৃত পদ্ধতির একখানি পুঁথি পাইয়াছি, অশিক্ষিত ডোম বা পোদ পণ্ডিতের নিকট হইতে নকল করিবার জন্ত ও পুস্তক লইতে অনেক সাধ্য সাধনা ও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। অন্তান্ত ধর্ম্মায়ণ পুস্তকে যেমন নানা দেবদেবীর বন্দনা আছে, রমাই'র পুস্তকে তাহার কিছুই নাই, তাহাতে বন্দনাই নাই। অন্ত ধর্ম্মায়ণ পুঁথি গুলি হয় ব্রাহ্মণের

লেখা, না হয় ইদানীন্তন লোকের লেখা, সুতরাং তাহাতে ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেবতাও আছেন, কিন্তু রমাই পণ্ডিত খাঁটি ধর্ম্মপণ্ডিত ধর্ম্ম ছাড়া, তিনি আর কিছু জানেন না, তাই তাঁহার ধর্ম্মায়ণে অন্য দেব দেবীর বন্দনা নাই। তাঁহার পদ্ধতির এক অংশ পুরাণের ন্যায় সৃষ্টির ব্যাপারে পূর্ণ, তাহার আরম্ভ এই—

"শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নম।
শূন্যপুরাণ লিখ্যতে—

নাই রেক নাই রূপ নাই ছিল বর্ণ চিহ্ন। রবি শশী নাই ছিল নাই রাত্রি দিন॥
নাই ছিল জল স্থল নাই ছিল আকাশ। মেরু মন্দার না ছিল না কৈলাস॥
দেবতা দেহারা নাই পূজিবার দেহ। মহাশূন্য মধ্যে প্রভুর আর আছে কেহ॥
ঋষি যে তপস্বী নাই নাহিক ব্রাহ্মণ। পর্ব্বত পাহাড় নাই নাহিক স্থাবর জঙ্গম॥
পুণ্য স্থল নাই ছিল নাই গঙ্গা জল। সাগর সঙ্গম নাই দেবতা সকল॥
নাই সৃষ্টি ছিল আর নাই সুর নর। ব্রহ্মা বিষ্ণু না ছিল না ছিল আধার॥
বার ব্রত না ছিল ঋষি যে তপসী। তীর্থস্থল নাহি ছিল গয়া বারাণসী॥
প্রয়াগ মাধব নাই কি করি বিচার। স্বর্গ মর্ত্ত্য নাই ছিল সব ধুন্ধুকার॥
দশদিক্‌পাল নাই মেঘ তারাগণ। আয়ু মৃত্যু নাই ছিল যমের তাড়ন॥
চারি বেদ নাই ছিল শাস্ত্রের বিচার। গুপ্ত বেদ করিলেন প্রভু করতার॥
শ্রীধর্ম্মচরণারবিন্দ করিয়া প্রণতি। শ্রীযুত রমাই কয় শুনরে ভারতী॥"

তবেই তো দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মঠাকুর যজ্ঞ নিন্দা করেন। এই কথা বলিয়াছিল বলিয়া মার্কণ্ডেয় মুনির কুষ্ঠ হইল। ধর্ম্মঠাকুরের নাম আদ্য, তিনি শূন্য হইতে সৃষ্টি করেন। শূন্য হইতে সৃষ্টি তো আর কোন ঠাকুর করেন নাই। শূন্যও তো হিন্দুদিগের মত নয়। মনু বলিয়াছেন ;—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।"

"নাসীৎ" এমন কথা তো বলেন নাই। তবে এই ঘোর শূন্যবাদী যজ্ঞনিন্দাকারী 'কলিত অবতার' কে? ইঁহার (ভক্ত) ভক্তগণ সবইতো অনাচরণীয় জাতি। হিন্দুরা—ব্রাহ্মণেরা যাহাদের জল খান, এমন জাতি নিতান্ত গরজে—মানেতে না পড়িলে ধর্ম্মঠাকুরের কাছে যান না। ধর্ম্মায়ণের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মঠাকুরের ভকতে হিন্দুদিগের যথেষ্ট দ্বেষও করে, হিন্দু নাম ধরিয়া গালি দেয়। বোধ হয়, অনেক স্থলে ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে ইহারাই ডাকিয়া আনিয়াছিল। রমাই পণ্ডিতের পুঁথিতে শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা নামে একটি অধ্যায় আছে সেটি ছোট সকল স্থলে অর্থবোধ হয় না, কিন্তু যাহা হয়, তাহাতেই ভকতগণের হিন্দুদ্বেষ ও যবনমৈত্রী প্রকাশ পায়। সে অধ্যায়টি কোন রূপ সংশোধন না করিয়া অবিকল উঠাইয়া দিলাম।

শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা।

"জাজপুর পুর বাদি, সোলশ্বর ঘর বেদি, বেদি লয় কর্ণয় সুন।
দক্ষিণা মাগিতে যায়, যার ঘরে নাঞি পায়, সাঁপ দিয়া পড়ায় ভুবন॥
মালদহে নাগে কর লিনয় কর্ণযুন॥

দক্ষিণা মাগিতে যায়, যার ঘরে নাঞি পায়, সাঁপ দিয়া পড়ায় ভুবন।
মালদহে নাগে কর, না চিনে আপন পর, জালের নাঞিক দিশপাস।
বোলিষ্ঠ হইল বড়, দশ বিশ হয়্যা জোড়, সধর্ম্মিরে করএ বিনাশ॥
বেদে করে উচ্চারণ, বেরয়ায় অগ্নি ঘনে ঘন, দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম, সভে বলে রাখ ধর্ম্ম, তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ॥
এইরূপে দ্বিজগণ, করে সিষ্টি সংহারণ, এ বড় হৈইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম, মনেতে পাইয়া মর্ম্ম, মায়াতে হইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হৈল্যা যবনরূপি, মাথায়েতে কাল টুপি, হাতে শোভে ত্রিকুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদায় বলিয়া এক নাম।
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল্যা ভেস্ত অবতার, মুখেতে বলেন দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ, সবে হয়্যা একমন, আনন্দেতে পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল্য মহাম্মদ, বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর, আদম্ফ হৈল্যা শূলপাণি।
গণেশ হইয়া গাজি, কার্ত্তিক হৈইল্য কাজি, ফকির হইলা যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হৈইল্যা শেক, পুরন্দর হইল মৌলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে, সবে মেলি বাজায় বাজনা॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবি, তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি, পদ্মাবতি হল্য বিবিনুর।
যতেক দেবতাগণ, হয়্যা সবে এক মন, প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে, পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায়, রামাঞি পণ্ডিত গায়, ই বড় বিষম গণ্ডগোল॥"

ধর্ম্মরাজ যবন হইয়া আইলেন ব্রাহ্মণের উপদ্রব নিবারণের জন্য। এ সকল কথার অর্থ কি? এই যে জাজপুরের নাম হইতেছে, এ কোন জাজপুর? উড়িষ্যার রাজধানী জাজপুর নহে, কারণ উড়িষ্যায় ধর্ম্মঠাকুরের বড় একটা প্রাদুর্ভাব নাই। ইহা মাণিকগাঙ্গুলির জাজপুর, এখানে ধর্ম্মের নাম দেহার, ইহা বঙ্গে,—রাঢ়ে। জাজপুর অঞ্চলে যখন মুসলমান আসে, তখন ধর্ম্মঠাকুরের ভকতেরা তাহাদের সঙ্গে মিশেন ও মিশিয়া ব্রাহ্মণদের জব্দ করেন!

ধর্ম্মঠাকুরের সিংহলে বড় সম্মান ছিল, এ কথা আমরা রমাই পণ্ডিতের পুস্তকে দেখিতে পাই। যথা—

"আদ্য ভূপতি নিমাব দেহারা ধর্ম্ম যথা আদি স্থান। নবখণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী।
শ্রীধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান॥"

ধর্ম্মঠাকুরের ধ্যান অনেক জায়গায় সংস্কৃতে পাইয়াছি, তাহার মধ্যে একটি এই—

"ওঁ যস্যান্তং নাদি মধ্যং ন চ করপদং ভয়ং নাস্তি কায়া নির্নাদং।
নাকারং নাধিরূপং সকলদলগতং ন চ ভয়মরণং
যস্ত যোগিনং সংকল্পহীনং স্বর্ণমূর্ত্তিনিরঞ্জনায় নমঃ॥"

এ মন্ত্রটি আমরা ঘাঁটালের নিকট বীরসিংহা গ্রামের ধর্ম্মঠাকুরের জনৈক পণ্ডিতের নিকট পাইয়াছি। আর একটী যথা—

"যস্যান্তো নাদি মধ্যো নচ করচরণং নাস্তি কায়নিদানং
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম বা যস্য।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনগতং সর্ব্বলোকৈকনাথম্
তত্ত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ॥"

এ মন্ত্রটী আমরা হুগ্লাগাছির ধর্ম্মপণ্ডিতের নিকট পাইয়াছি। পণ্ডিত মহাশয় জাতিতে ময়রা, উচ্চারণ বড় অপরিষ্কার। এ ধর্ম্মঠাকুর পেটের অসুখের ঔষধ দেন। ইনি উচ্চ সিংহাসনের উপরে বসিয়া আছেন। ইহার গায়ে পিতলের টোপ। কিন্তু সে টোপ নিতান্ত কাছে না গেলে দেখা যায় না। আর একটী মন্ত্র যথা—

"যস্যান্তো নাদিমধ্যো নচকরচরণৌ নাস্তি কায়ো নো নাদঃ
নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য।
যোগীন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকলজনময়ং সর্ব্বলোকৈকনাথং
ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং॥"

এ ধ্যানটি পূর্ব্বোক্ত দুইটির একটি ভাল সংস্করণ মাত্র। ইহা ভাটপাড়ার ন্যায়শাস্ত্রধ্যায়ী একটি পড়ুয়ার নিকট পাইয়াছি। তাঁহার নিবাস রাজঘাটের সন্নিকট। নিজের মানত থাকিলে পূজা করিতে হয় বলিয়া তিনি এইটি মুখস্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের দেশে ধর্ম্মঠাকুরের দুই রকম পুরোহিত থাকে, ছোট লোক পুরোহিতেরাই প্রায় পূজা করে। ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে এবং স্বজাতির মানতের জন্য পূজা করিয়া থাকেন। বোধ হয় যে কালের বাঙ্গালায় অথবা কোনরূপ প্রাকৃত ভাষায় এ ধ্যানটি আগে রচিত হইয়াছিল, তাহার পর ক্রমে সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে; কিন্তু যতই চেষ্টা করিতে চান, ব্যাকরণাশুদ্ধির দায় কিছুতেই এড়ান যায় না। এ ঠাকুরটি শূন্যমূর্ত্তি। শূন্যমূর্ত্তি হয় কি করিয়া। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, "অস্তি নাস্তি তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যরূপং" এটি সেই শূন্যরূপ না কি?

ময়নাগড় হইতে সংবাদ পাইলাম যে বহু পূর্ব্বে তথায় একটি পুষ্করিণীর মধ্য হইতে ধর্ম্ম, শঙ্খ ও একখানি পাথর উঠিয়াছিল। পাথর ও শঙ্খ কেহ কখন দেখে নাই, ধর্ম্ম সবাই দেখিতেছে। এ কি ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব না কি? কালক্রমে বুদ্ধ লোপ পাইয়াছেন, সঙ্ঘ শঙ্খ হইয়াছেন ও পরে লোপ পাইয়াছেন।

ধর্ম্মঠাকুর বঙ্গদেশের এক মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি যেখানে বর্ত্তমান, সেইখানে অনাচরণীয় জাতির সংখ্যা অধিক এবং মুসলমান কম। রাঢ়ে এই ভাব, দক্ষিণেও এই ভাব; কিন্তু পূর্ব্ব ও মধ্য বাঙ্গালার ভাব স্বতন্ত্র, সেখানে মুসলমান অধিক অনাচরণীয় জাতি কম। সেখানে ধর্ম্মই যবনরূপী হইয়া আছেন না কি?

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল আগাগোড়াই পড়, ব্রাহ্মণসজ্জনের নাম পাইবে না, কোথাও বারুই রাজা, কোথাও বা অন্য ছোটলোক রাজা। গৌড়ের রাজার কোন জাতি তাহা কেহ বলে না। তাঁহার শ্যালীপো লাউসেনেরও কোন জাতি, তাহাও কেহ বলে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থের কোন প্রাধান্যই এ পুস্তকে নাই।

ধর্ম্মঠাকুরের আরও অনেক কথা আছে। আমরা ক্রমে বলিব এবং এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে, সকল পুস্তকও সংগৃহীত হয় নাই। যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ। বৌদ্ধরা তো আপনাদিগকে কখন বৌদ্ধ বলিত না, তাহারা আপন ধর্ম্মকে সদ্ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম বলিত। সেই ধর্ম্ম নামটাই বজায় রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের উপাস্য বস্তু তিনটা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। সঙ্ঘ অর্থে সন্ন্যাসীর দল। কালে বুদ্ধদেব লোপ পাইয়াছেন। ধর্ম্ম বজায় আছেন। পাকা বারমেসে সন্ন্যাসীর দল লোপ পাইয়াছে, গাজনী সন্ন্যাসীরদল হইয়াছে। ইহারা দশ পোনের দিনের জন্য সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাসী হইলে বারমেসে সন্ন্যাসীর যেরূপ মান্ত ছিল, ইহাদেরও সেইরূপ মান্ত হয়। ইহারা হবিষ্য করে ও নিজ হস্তে পূজা পাঠ করে। এ সকল ব্যাপারই লুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের কথা মনে করিয়া দেয়। তার পর ধর্ম্মঠাকুরের সিংহলে খাতির বড় অধিক, তিনি যজ্ঞ নিন্দা করেন; এ দুইটি কথাতেও তাঁহাকে বৌদ্ধদিগের ত্রিরত্নের অন্যতম রত্ন বলিয়া মনে হয়। রমাই পণ্ডিত এক জায়গায় তাঁহাকে ললিত অবতার বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবের জীবনচরিত ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে ললিত শব্দটি কেন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। ললিতবিস্তরের ললিত আর ললিত অবতারের ললিত একই অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। ইহার পর আর এক কথা আছে, বৌদ্ধদিগের সর্ব্বোচ্চ দর্শনের নাম শূন্যবাদ। প্রজ্ঞাপারমিতাদিগ্রন্থগুলি শূন্যতা ও মহাশূন্যতার বিচারেই প্রবৃত্ত। নির্ব্বাণ-লাভ শব্দের অর্থ শূন্য হইয়া যাওয়া। হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রধান মত ভেদ এই যে হিন্দুরা বলেন "সদেব ইদমগ্র আসীৎ"; বৌদ্ধেরা বলেন, 'অসতঃ সৎ জায়তে।' আমাদের ধর্ম্মঠাকুর নিজে শূন্যমূর্ত্তি ও শূন্য হইতেই সৃষ্টি করেন; সুতরাং আমাদের ধর্ম্মপূজার ব্যাপার যেরূপেই পরীক্ষা করিয়া দেখি, ঘুরিয়া ফিরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখনও কিছু নিশ্চয় করিয়া বলিবার সময় হয় নাই।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পরিশিষ্ট।

ময়নাগড়।

যে লাউসেন হইতে ধর্ম্মঠাকুরের প্রচার সমস্ত ধর্ম্মাশ্রিত একবাক্যে স্বীকার করেন, সেই লাউসেনের রাজধানী ধর্ম্মের প্রথমোৎপত্তি স্থল ময়নাগড় তমলুক হইতে ১৩। ১৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিম দিকে অবস্থিত। স্থানটী একটি জঙ্গলময় ক্ষুদ্রতম গ্রাম, ভদ্রলোকের বসবাসতো নাইই, ইতরলোকের সংখ্যাও খুব কম। তমলুক হইতে যাইবার পথও নাই, কোন রকমে মাঠ ঘাট দিয়া যাইতে হয়। ময়নাগড়ে অন্য আর কিছুই নাই, থাকিবার মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত প্রাচীন গড় আছে। কিংবদন্তী এই গড়ই রাজা লাউসেন কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত। গড়টি এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও শ্বাপদসঙ্কুল, তাহার চারিপাশে পরিখা আছে, তাহারও এখন দুরবস্থা, মধ্যে মধ্যে চর হইয়াছে, কোথাও বা সমভূম হইয়াছে। আসল কথা এখন আর কিছুই নাই, কেবল অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি আছে। তাই আজও লোকে ইহাকে ময়নাগড় বলে ও অতীতের সুখ সমৃদ্ধি মনে করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। সেই পরিখায় পরিবেষ্টিত একটি সুপ্রশস্ত প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী আছে (লোকে উহাকেই গড় বলে।) বাড়ীটির অবস্থাও অতি শোচনীয়। ময়নাগড়ে রাজবাড়ী ভিন্ন অথবা রাজগড় ভিন্ন আর বাড়ী নাই। এখন এ বাড়ীর অধিকারী রাজাদের নাম শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ বাহুবলেন্দ্র, সচ্চিদানন্দ বাহুবলেন্দ্র ও পূর্ণানন্দ বাহুবলেন্দ্র, ইহারা তিন সহোদর। ইহারা লাউসেনের বংশীয় নহেন। ইহাদের আদি-পুরুষের নাম গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলেন্দ্র, আদি নিবাস বালিসিতা, পরে শিকদা (দুইটিই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত।) গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলেন্দ্র ময়নায় আসিয়া কি এক অপরিস্ফুট সূত্রে রাজত্ব করেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরাই এখানকার রাজা। ইহাদের বিস্তৃত ইতিহাস ইহাদের কাছে আছে। এবং কতক Modern History of Rajas & Zemindars, by Loknath Ghosh Part II গ্রন্থের ৩২৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই বাড়ীতে লাউসেনের একটি আসন আছে, কিংবদন্তী এই আসনে বসিয়া রাজা লাউসেন ইষ্টদেবীর পূজাদি করিতেন। আসনটি ইষ্টকনির্ম্মিত চতুষ্কোণ একটী বেদী মাত্র, এখন উহা ভগ্ন ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, কিন্তু পরম পবিত্র স্থান বলিয়া বিশেষরূপে সম্মানিত। রাজবাড়ীতে লাউসেন-প্রতিষ্ঠিত এক কালীমূর্ত্তি আছেন। দেবী প্রস্তরময়ী, মাপে তিন পোয়া মাত্র, তাঁহার চারিটী হস্ত। তিনি যে মন্দিরে থাকেন, সে স্থানে একই মন্দিরে একটি মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি এখন ভগ্নপ্রায়, মন্দিরের আকার অনেকটা চাল দেওয়া একচূড়া থেবড়া বড় ঘরের মত। মন্দিরটী বড়, দেয়ালে ইটের উপর নানাবিধ খোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতি কারুকার্য্য।—দেবীর নাম রঙ্কিণী। মহাদেবের নাম লোকেশ্বর (সম্ভবতঃ লোকেশ্বর।) দেবদেবীর নিত্য পূজা হইয়া থাকে। পূজা কিন্তু সাত্ত্বিক,

কোনকালে বলিদান হয় না। গড়ের একদিকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছে, তথায় ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়। ধর্ম্মঠাকুর কিন্তু সেখানে থাকিতে পান না, তিনি গড় হইতে প্রায় দুইক্রোশ. উত্তরে বৃন্দাবন-চক নামক স্থানে থাকেন। কেবল বৎসরে একদিন ভাদ্র সংক্রান্তিতে সন্ধ্যার সময় তথা হইতে আনীত হইয়া গড়ের সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পূজিত হয়েন ও সেই দিবসই পূজার পর তাঁহাকে স্বস্থানে লইয়া যাইতে হয়, কেন যে থাকিতে পান না বা থাকেন না, তাহার কোন কারণ কেহ জানেন না। বৃন্দাবন-চক একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, তবে তত জঙ্গলময় নয়, দশ ঘর শ্রমজীবী গৃহস্থের বাস আছে। চারিদিকে বড় বড় মাঠ ও মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণীও আছে। এই বৃন্দাবন-চকে যেখানে এখন ধর্ম্মঠাকুর থাকেন, তাঁহার মন্দিরের সম্মুখে ও সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুকুর আছে, পুকুরটি দেখিলে একেবারেই প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। তবুও কিংবদন্তী যে সেই পুকুর হইতেই নাকি এই ধর্ম্মঠাকুর, একখানি পাথর ও একটী শঙ্খ এবং একখানি ধর্ম্মেরই পূজার পদ্ধতি আবির্ভূত হইয়াছিল। তখন নাকি লাউসেনের আধিপত্য, আবার সেই লাউসেনই নাকি ইহার বহুল প্রচার করিয়া যান। এখন কিন্তু আর সে শঙ্খ নাই, পাথর খানিও নাই, আছেন কেবল স্বয়ং ধর্ম্মঠাকুর ও তাঁহার পূজার পদ্ধতি। ঠাকুরের আকার কচ্ছপের মত, দন্তর মত শুঁড় প্রভৃতি কচ্ছপের যাহা যাহা থাকে, সবই আছে, অধিকন্তু তলপেটে একটি সচক্র ছোট সর্প খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের পূজকেরা বলেন, উহা অনন্ত, অনন্তের উপর ভগবান্ অবস্থিত ইত্যাদি ইত্যাদি। পুকুর হইতে উত্তোলিত হইয়া ঠাকুর সেই বৃন্দাবন-চকেই রহিলেন। যে স্থানে ঠাকুর থাকেন, উহা প্রসিদ্ধ মন্দিরের মত নহে, উহা একখানি ঘর। ঘর খানির চারিদিকে পাকা দেয়াল, উপরে খড়ের চাল, ঠাকুর ঘরের মধ্যস্থলে একটি বেদীর উপর কাঠের দোলচৌকিতে থাকেন। ঠাকুরের কিছু জমি জারাৎ আছে, তাহাতে আয় প্রায় বার্ষিক তিনশত টাকা হইবে। উহার উপস্বত্ব হইতে উহার পূজা হয়। এই উপস্বত্ব উহার পূজকেরাই আহার ও খরচাদি করিয়া থাকে। উহার পূজকেরা জাতিতে কৈবর্ত্ত। ব্রাহ্মণে ইচ্ছা করিলে ধর্ম্মের পূজা করিতে পারেন এইমাত্র, কিন্তু কৈবর্ত্তেরাই পূজার প্রকৃত মালিক। পূজকদিগকে পণ্ডিত বলে। ইহারা কৈবর্ত্ত হইলেও ধর্ম্মের পূজক বলিয়া ১৫ দিন অশৌচ ভোগ করে। ইহারা আপনাদের অন্যান্য কুটুম্বদের বাড়ীতে আহার করে না, এমন কি শ্বশুর বাড়ীতেও খায় না, তবে নূতন হাঁড়িতে রাঁধিয়া দিলে খায়। ইহারা মাছ খায় না, ইহাদের চিহ্ন তর্জ্জনীতে একটি অষ্ট ধাতুর অঙ্গুরীয় থাকে। ইহারা স্বজাতিমহলে বিশেষ সম্মানিত। ইহারা চাষা হইলেও নিজে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করে না, কিন্তু [illegible]ধরা তাহাদের সহিত কুটুম্বিতা করে। ধর্ম্মের পূজা নিত্য হয়। প্রাতঃকালে স্নানাদির পর অনাহারেই পূজা বিহিত; স্নান না করিয়া হয় না। ধর্ম্মের ঘট স্থাপনা নাই। পূজা করিবার নিয়ম এই—নিত্য তিথি অনুসারে সংকল্প করিতে হয়। নিত্যই ঠাকুরকে স্নান করাইতে

হয়। (স্নানের মন্ত্র মূল প্রবন্ধে দেখ।) তারপর শালগ্রামশিলার মত উপর নীচে সচন্দন তুলসী দিয়া ধ্যান করিতে হয়।—(ধ্যানের মন্ত্র মূলে দেখ।) পরে যথাক্রমে পুষ্পাদি দিয়া পূজা করিতে হয়। ধাং ধীং ধং ধর্ম্মায় নমঃ ইহাই ইহার বীজ, তুলস্যাদি এই মন্ত্রেই দিতে হয়। পূজা পঞ্চোপচারে, ষোড়শোপচারে যখন যেমন ঘটিয়া উঠে করিলেও চলে। কোন বাঁধা বাঁধি নাই। ধর্ম্মের স্তুতি—"শ্বেতবস্ত্রং শ্বেতমাল্যং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকং। শ্বেতাসনং শ্বেতরূপং নিরঞ্জন নমোস্তুতে॥"—ধর্ম্মের প্রণাম "আকাশাৎ পতিতো তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং। সর্ব্বদেবনমস্কারং কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥" এই গেল পূজার বিধি।

ধর্ম্মের নিত্য পূজায় /৫ সের করিয়া আতপ চাউলের নৈবেদ্য চাই, কমে হইবে না, বেশী যে যত দিতে পারে। অন্যান্য উপকরণ কলা, বাতাসা, নারিকেল, শশা, মুগ, কাচা দুধ (জল দেওয়া চলিবে না) ইত্যাদি। প্রত্যহ সায়াহ্নে পঞ্চ প্রদীপ দিয়া আরতি করিতে হয়। এখানে ধর্ম্মের বলি হয় না, তুলসীপত্র দিয়া পূজা করিতে হয়। বিল্বপত্র একেবারে চলে না।

ধর্ম্মকে সকলে বিশেষ মান্য করে। পীড়াদি কোনরূপ দৈব দুর্বিপাকে ধর্ম্মের মানত করে। শনি বা মঙ্গলবারে মানসিক পূজা দিবার নিয়ম। তবে পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যদিনেও দিতে পারা যায়। ধর্ম্মের মানত করিয়া লোকে মাথায় চুল রাখে, দাড়ি কি নখ রাখে না। গৃহস্থেরা বালক বালিকার চুল ধর্ম্মের কাছেই দেয়, দ্বিতীয় পঞ্চানন নাই। ভাদ্র ও বৈশাখে সংক্রান্তিতে ধর্ম্মের গাজন হয়, তাহাতে নানাস্থান হইতে অনেক যাত্রী সমবেত হয়, যাত্রীরা সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিনে হবিষ্য অথবা ফলমূলাদি আহার করিয়া থাকে। পরে গাজনের দিন পূজা দিয়া ধর্ম্মের প্রসাদ পায় ও সারা দিন রাত ধর্ম্মেরই গান গায়। এ পূজাও প্রাতঃকালেই হয়। গাজনের যাত্রীরা রাত্রিতে ধর্ম্মের ঘরে পূজা দেয়। যাত্রীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিই আসে। তবে ব্রাহ্মণের পূজা ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণে করিতে পারে। ধর্ম্মের মানস করিলে কোন বার করিবার নিয়ম নাই। ধর্ম্মকে লোকে বাড়ী আনিয়াও পূজা দেয়, খুব ধূমধাম করে, ঢাক ঢোল বাজায়। আমি একটি মানসকারীর বাড়ীতে পূজা দেখিয়াছি। মানসকারী একটি ঘরের মধ্যস্থলে ধর্ম্মঠাকুরকে আনিয়াছে, ধর্ম্মপূজক পণ্ডিত পূজা করিতেছে। হাজার পঁচিশ তুলসী দিতেছে। (গৃহস্থের ত মানসই সেই রূপ।) তাহার পার্শ্বে দুই ধারে দুই তিনজন ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলা পূজা করিতেছেন ও তুলসী দিতেছেন। পণ্ডিতদের সম্মান ব্রাহ্মণের মতই। পণ্ডিত শালগ্রাম শিলা পূজা করিতে পারে না। ধর্ম্মের পক্ব অন্ন ভোগ হয় না, নৈবেদ্যাদি আমান্নই দিতে হয়। বলিতো হয়ই না। শুনিতে পাওয়া যায়, মহনাগড় পরগণাতেই নাকি বলি নাই। এখানকার লোকে ধর্ম্মকে কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু বলে। ধর্ম্ম পূজা করিতে গেলে আসন শুদ্ধ্যাদি দস্তুর মত সবই করিতে হয়। মোট কথা এখানকার ধর্ম্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানেও ইহাকে মানে। গাজনের যাত্রীরা যাহা যাহা পূজা দেয়, পণ্ডিত সে সমস্তই নাম ও গোত্র নির্দ্দেশ করিয়া উৎসর্গ করিয়া দেয়। পরে দক্ষিণা পায়।

গাজনের যাত্রীরা ধর্ম্মের ঘরে কাদার একটা চাপের উপর একটি কাটী পুতিয়া তাহাতে তুলা জড়াইয়া ঘৃত দিয়া দীপাকার করিয়া জ্বালিয়া দেয়। তাহাও উৎসৃষ্ট হয়। এ দীপ যাত্রীদের দিতেই হইবে। যাহাদের শিন্নী হয়, তাহারা চুণ মানস করে অর্থাৎ সারিয়া গেলে চুণ দিয়া ধর্ম্মের পূজা দেয়, সেই চুণ ঠাকুরের ঘরে দেওয়া হয়।

শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ।

পরিষদের কার্য্য-বিবরণ।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

বিগত ২৭শে বৈশাখ (১৮৯৭। ৯ই মে) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট পরিষৎকার্য্যালয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ (সহ-সভাপতি), মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ডি-এল, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি-এল, বাবু কুঞ্জলাল রায়, বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম-এ বি এল, বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ, বাবু প্রতুলচন্দ্র বসু, বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বাবু পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, বাবু মন্মথচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাবু প্রমথনাথ মিত্র, বাবু ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল, বাবু কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, বাবু বাণীনাথ নন্দী, বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ, বাবু অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন এম-এ বি-এল, বাবু রাধাকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ বি-এল, বাবু মনোমোহন বসু, বাবু সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু গোবিন্দলাল দত্ত, বাবু রামেশ্বর মণ্ডল, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (ব্যারিষ্টার), বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি-এল (সম্পাদক), বাবু কুঞ্জবিহারী বসু বি-এ (সহ-সম্পাদক)।

অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১ গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২ সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩ ভারতেশ্বরীর হীরক জুবিলি উপলক্ষে অভিনন্দন পত্র। ৪ নিয়মাবলী সংশোধনসমিতির মন্তব্য। ৫ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আবেদন-পত্র। ৬ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "ছাতনার ইষ্টক-লিপি" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ। ৭ নূতন ধনরক্ষক নিয়োগ। ৮ বিবিধ বিষয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

বিগত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত হইলে গৃহীত হইল।

অতঃপর যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক।	অনুমোদক।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু	ডাক্তার চুনীলাল বসু।
২। ,, চারুচন্দ্র ঘোষ	,, প্রফুল্লচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দত্ত।
৩। ,, চারুচন্দ্র ঘোষ	,, প্রফুল্লচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু।
৪। ,, চারুচন্দ্র ঘোষ	,, প্রফুল্লচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত শ্যামলাল বসু।
৫। ,, চারুচন্দ্র ঘোষ	,, প্রফুল্লচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এটর্নি।
৬। ,, কুঞ্জলাল রায়	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যানিধি।
৭। ,, কুঞ্জলাল রায়	,, মনোমোহন বসু	শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী।
৮। ,, কুঞ্জলাল রায়	,, মনোমোহন বসু	ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ।
৯। ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	,, কুঞ্জলাল রায়	শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ।
১০। ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	,, কুঞ্জলাল রায়	কুমার যতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
১১। ,, শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সম্পাদক হীরক-জুবিলীসমিতি কর্তৃক স্থিরীকৃত অভিনন্দন-পত্রের পাণ্ডুলিপি সভায় পাঠ করিলেন। উক্ত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পাণ্ডুলিপিতে "সংস্কৃত চর্চার ও ভাবী উন্নতির" স্থলে "সংস্কৃত চর্চার পুনরুন্নতি" ব্যবহার করা হউক। উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে অভিনন্দন পত্রের সর্ব্বত্র "আপনি" স্থলে 'মহারাজ্ঞী' শব্দ প্রযুক্ত হউক। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পাণ্ডুলিপিতে 'প্রতীচ্য' শব্দ স্থলে 'পাশ্চাত্য' শব্দ প্রযুক্ত হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পাণ্ডুলিপিতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আশাতীত উন্নতি স্থলে "বিজ্ঞান ও" শব্দগুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পরিবর্ত্তিত আকারে অভিনন্দন পত্র সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সম্পাদক নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির মন্তব্য সভায় উপস্থিত করিলেন। উক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে মন্তব্য মুদ্রিত হইয়া আগামী মাসিক অধিবেশনের পূর্ব্বে সকল সভ্যের নিকট প্রেরিত হউক এবং বিচারের জন্য আগামী মাসিক সভায় উপস্থিত করা হউক।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীপে প্রেরণের জন্য আবেদন-পত্র সভার বিচারার্থ উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলিলেন যে আবেদন-পত্রোক্ত প্রস্তাবগুলির সহিত তাঁহার বিশেষ মতভেদ আছে। সাহিত্য-পরিষদ্ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার যোগ্যপাত্র নহেন। শিশু পরিষদ্ এ বিষয়ে আলোচনা করিতে অনধিকারী। এরূপ করায় বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়া হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের Board of Study প্রভৃতি থাকিতে আমাদের এ অনধিকার চর্চ্চা কেন? ইহাতে পরিষদ্ হাস্যাস্পদ হইবে মাত্র। আমরা যেন University-Reform-Association হইয়াছি। বক্তা একে একে প্রস্তাবগুলির সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে যে শিক্ষার্থীদিগের কোনরূপ অনিষ্ট হইতেছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। বক্তা শেষে প্রস্তাব করিলেন যে আবেদন পত্রখানি পাঠান না হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, যখন শিক্ষাসমিতি গঠিত হইয়াছে এবং সমিতির সভ্যেরা উক্ত আবেদনপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তখন উহা পাঠানই উচিত। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের এক বিগত অধিবেশনে যে শিক্ষাসমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি অধিবেশনে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তিনি আবেদনপত্রে সেই প্রস্তাবসমূহ গ্রথিত করিয়াছেন মাত্র। অবশ্য পরিষদ্ কোন অধিবেশনে যদি কোন অনিষ্টকর প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া থাকেন, তবে যে তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারে না, তিনি এরূপ বলেন না। পূর্ব্বে ভাবিয়া চিন্তিয়া শাখা সমিতি গঠিত করিলে, শাখা-সমিতির পরিশ্রমের লাঘব হইতে পারিত। প্রস্তাবকর্ত্তা সাধারণের কাছে পরিষদের হাস্যাস্পদ হওয়ার আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু আমরা যেন নিজেদের কাছে হাস্যাস্পদ না হই।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, যে শিক্ষাসমিতির নিয়োগ-বিষয়ক মন্তব্য যতদিন না প্রত্যাহৃত হয়, ততদিন আবেদনপত্র প্রেরণ বন্ধ করিতে কোন সভ্যেরই অধিকার নাই। যিনি উক্ত মন্তব্য প্রত্যাহৃত করিতে চান, তাঁহার রীতিমত বিজ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব আনা উচিত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে পূর্ব্ব মন্তব্য পুনর্ব্বিচার হইতে পারে, ইহা তিনি অস্বীকার করেন না। পূর্ব্বে যখন এ বিষয়ের বিচার হইয়া নির্দ্ধারণ হইয়াছিল, তখন তিনি সভাপতিরূপে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মত নির্দ্ধারণের পক্ষেই ছিল। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে পরিষদ্ হইতে আবেদন পাঠান তাঁহার মতে অপ্রাসঙ্গিক নহে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এখন নির্ভর ইংরাজির উপর। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠ্য ও পরীক্ষাপ্রণালীর

সংস্কার হওয়া আবশ্যক। অতএব এ বিষয়ে পরিষদের আবেদন পাঠান অনধিকার চর্চ্চা নহে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে পূর্ব্ব অধিবেশনে যখন এ বিষয় উপস্থিত হয়, তখন পরিষদ্ এরূপ আবেদন পাঠাইতে অধিকারী কি অনধিকারী তাহার কোন বিচার বা মীমাংসা হয় নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে আবার বলিলেন যে তাঁহার বিশ্বাস এই যে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর দোষে আমাদের ইংরাজি শিক্ষা সম্যক্ হইতেছে না। বর্ত্তমান কালে ইংরাজি ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। অতএব শিক্ষাপ্রণালীর যাহাতে সংস্কার হয়, সে বিষয়ে আমাদের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

সম্পাদক বলিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক সভা স্বমতানুযায়ী প্রস্তাব বিচারার্থ পাঠাইতে পারেন। দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণের সমষ্টি স্বরূপ পরিষদ্ ঐরূপ করিলে শাসনের চাঁদে হাত দেওয়া হইবে কেন? প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীতে দেশের প্রভূত অনিষ্ট হইতেছে, তাহার নিবারণের চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় যতীন্দ্র বাবুর বাক্যের পোষকতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিয়া ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করা উচিত ছিল।

প্রস্তাবকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলিলেন যে যে আবেদন পত্র পাঠাইবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা দ্বারা যে শিক্ষার্থীদিগের কোন উপকার সাধিত হইবে, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন না।

অবশেষে উপস্থিত সভ্যের অধিকাংশের মতে স্থির হইল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীপে এরূপ আবেদন পত্র পাঠাইবার অধিকার পরিষদের আছে। আবেদন-পত্রের বিচার স্থগিত রহিল।

সম্পাদক প্রস্তাব করিলেন যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার পদ গ্রহণ না করাতে তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পরিষদের হিসাবরক্ষক নিযুক্ত হউন।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রহিল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সম্পাদক।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
সভাপতি।

১৩০৪ সালের প্রথম বিশেষ অধিবেশনের

কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৭ সাল ২৩ শে মে) রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট স্থিত রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুরের ভবনে পরিষৎকার্য্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ডি এল্, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী, বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল, বাবু হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথনাথ মিত্র, শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বি এল, বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু, বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ, বাবু অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু অমৃতলাল বসু, বাবু মতিলাল ঘোষ, কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু বাণীনাথ নন্দী, বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, বাবু গোবিন্দলাল দত্ত, বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), কুঞ্জবিহারী বসু বি এ (সহসম্পাদক)।

অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১ বিগত অধিবেশনে গৃহীত হীরক জুবিলির অভিনন্দন পত্রের পুনর্ব্বিচার। ২ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীপে প্রেরণের জন্য আবেদন পত্রের আলোচনা। ৩ বিবিধ বিষয়।

যে পত্রের অনুসারে সভা আহূত হইয়াছিল, সম্পাদক সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সেই পত্র পাঠ করিলেন। পত্র খানি এইরূপ ;—

১০ই মে ১৮৯৭, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

শ্রীযুক্ত সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

আমাদের বিবেচনায় বিগত অধিবেশনে অনুমোদিত ভারতেশ্বরীর সমীপে অভিনন্দন পত্রের পুনর্ব্বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে পরীক্ষা ও পাঠ্য সম্বন্ধে যে আবেদনপত্র পাঠান স্থির হইয়াছে, তাহাও শীঘ্র প্রেরণ করা আবশ্যক। এই জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে আগামী ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় আপনি নিয়মাবলীর তৃতীয় ধারা মতে একটী বিশেষ সাধারণ সভা আহূত করুন ইতি।

ভবদীয়—শ্রীমনোমোহন বসু।
শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র।
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।
শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।
শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু।
শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু।
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।
শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

সম্পাদক পুনর্ব্বিচারের জন্য সংশোধিত অভিনন্দন পত্র সভায় উপস্থিত করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে উহা পঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "ভক্তি" স্থলে "রাজভক্তি" শব্দ প্রযুক্ত হউক।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর প্রস্তাবকারী মহাশয় উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, যে বদান্যতার স্থলে ঐকান্তিক যত্ন শব্দ প্রযুক্ত হউক। শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "আপনার অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি যে" এই শব্দ গুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে শিক্ষা প্রণালীর "প্রভাবে" স্থলে "গুণে" শব্দ এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে অভিনন্দন পত্রের শেষে "হউক" স্থলে "করিতে থাকুক" শব্দদ্বয় গৃহীত হইল।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পরিবর্ত্তিত আকারে আবেদন পত্র অনুমোদিত হউক।

শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সম্পাদক মহাশয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমীপে প্রেরণের জন্য আবেদন পত্র সভার বিচারার্থ উপস্থিত করিলেন।

মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে আবেদন পত্র বিশ্ব-বিদ্যা-

লয়ের সমীপে প্রেরিত হউক। মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও বলিলেন যে এরূপ আবেদনপত্র প্রেরণ করাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতি কোন রূপ অসম্মান প্রদর্শিত হইতেছে না। কারণ আমাদের এইমাত্র অনুরোধ যে, আবেদনপত্রলিখিত প্রস্তাবগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয় বিবেচনা করুন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমাদের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইলে প্রকৃত শিক্ষার অবনতি হইবে। প্রকৃত শিক্ষা কি? শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য দুইটী—(১) প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ। (২) শিক্ষার্থীর বুদ্ধির বিকাশ ও উন্নতি। আমরা দেখিতে পাই বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রথম উদ্দেশ্যটীর প্রতি লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু দ্বিতীয়টীর প্রতি দৃষ্টি তেমন রাখেন না। বিশ্ব-বিদ্যালয় পরীক্ষার্থীদিগকে যতগুলি বিষয় শিখিতে বলেন, তাহার সকল গুলি তাহারা সম্যক্ বুঝিতে পারে না। পরীক্ষার অর্দ্ধেকের অধিক পরীক্ষার্থী "ফেল" হয় কেন? প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে (যাহারা খুব ভালও নহে, খুব মন্দও নহে), ভাল মনে হয় না। আমাদের প্রস্তাব গুলি গৃহীত হইলে, সাধারণ শিক্ষার্থীর উপকার হইবার সম্ভাবনা। প্রবেশিকা ও এফ এ পরীক্ষা কঠিন করিলে পাঠার্থীর শিক্ষার অর্দ্ধ পথে গতি রোধ করা হয়।

বক্তা মহাশয় একে একে প্রস্তাবগুলির উপযোগিতা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে আবেদন পত্রের মূল উদ্দেশ্যের সহিত তাহার সহানুভূতি আছে। কিন্তু আবেদনোক্ত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হইলে যে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, সে আশা তিনি করেন না। কয়েক খানি গ্রন্থ বাদ দিলেই অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি যে সুচারুরূপে পঠিত হইবে, তাহার প্রমাণ কি?

বক্তা একে একে প্রস্তাব গুলির সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে তিনি কোন প্রস্তাব করিতেছেন না। আবেদন-পত্র দ্বারা যে কোন উপকার সাধিত হইবে না, তাহাই দেখান তাঁহার উদ্দেশ্য। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য পীড়নের যাহাতে কতকটা লাঘব হয়, আবেদন পত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। শিক্ষাপ্রণালীর একবারে ঐকান্তিক সংস্কার হইবে এরূপ আশা করা যায় না। যদি বিশেষ কমিটী করিয়া অন্ততঃ এক বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করা যায়, তবে যদি শিক্ষা-সংস্কারের কোন বিশেষ (Positive) উপায় বাহির হইতে পারে। যদি শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় বুদ্ধির পরিমার্জ্জন, তবে কিছু কিছু বিজ্ঞানশিক্ষা মন্দ নহে, সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসাদিরও শিক্ষা হওয়া উচিত। মনুষ্যত্বকে কেন্দ্র স্থলে রাখিয়া বিজ্ঞানাদি সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রাকৃতিক ভূগোল উঠাইয়া দেওয়া না হয়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষার উপযোগিতা দেখাইয়া উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে প্রাকৃতিক ভূগোলে কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পড়িতে আমোদও আছে। অতএব প্রবেশিকা পরীক্ষায় উক্ত বিষয় না উঠাইলেই ভাল হয়। বিশেষতঃ যখন ভূগোলের পরিমাণ কম করা হইল। তখন তাহার স্থানে প্রাকৃতিক ভূগোল থাকিলে মন্দ হয় না।

সম্পাদক প্রাকৃতিক ভূগোল প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর উপযোগী নহে, এই হেতু দেখাইয়া উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন।

মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উত্তরে বলিলেন যে যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে পাঠ্যের আধিক্য প্রযুক্ত শিক্ষা সম্যক্ হইতে পারে না, তবে আমরা যাহা করিয়াছি তাহাই ঠিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র ক্ষমতা যে তাঁহারা পাঠ্যের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারেন। সেই জন্য আমরা কমাইতে বলিয়া ঠিক করিয়াছি। আমরা রোগের কোন ঔষধ প্রয়োগ করিতেছি না বটে, কিন্তু কুপথ্য বারণ করিতেছি, ইহা ব্যর্থ হইবে না। ভূগোল খগোল পড়িয়া অনেক সময়ে এরূপ গোল বাধিয়া যায় যে, পাঠার্থী স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে স্থির করিতে পারে না। যদি পাঠ্য পাঠার্থীর উপযোগী না হয়, যদি সে তাহা বুঝিতে না পারে, তবে সেরূপ পাঠ না একরূপ প্রবঞ্চনা মাত্র। সুশস্য বিজ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞান ভাল। প্রাকৃতিক ভূগোলের সকল অংশ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর উপযোগী নহে। কিন্তু যখন অনেকের মত হইতেছে, প্রাকৃতিক ভূগোল রাখা উচিত, তখন বোধ হয় আবেদন পত্রের তৃতীয় দফার (b) অংশ এইরূপ পরিবর্ত্তিত করিলে সকল পক্ষের অনুমোদিত হইতে পারে।

Physical Geography as a complete subject be omitted from the course as too difficult but that som text-book explaining some of the ordinary elementary notions on the subject be prescribed.

প্রস্তাবকারী বাণীনাথ নন্দী উক্ত পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিলেন।

মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও প্রস্তাব করিলেন যে উক্ত তৃতীয় দফার (a) অংশ এইরূপ পরিবর্ত্তিত হউক—

The fourth book of Euclid be omitted from the course as being comparatively of little use to the general student. উক্ত পরিবর্ত্তন সকলের অনুমোদিত হইল। পরিবর্ত্তিত আকারে আবেদন পত্র সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে অভিনন্দন পত্র ও আবেদন পত্র সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সম্পাদক।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
সভাপতি।

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ সাল।

৪র্থ ভাগ।] [২য় সংখ্যা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

দুর্গামঙ্গল
ও
কবি রূপনারায়ণ।

জগতে যাহারা ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে অমরকীর্ত্তির আশা করেন, কবির নির্ম্মল-প্রতিভা তাঁহাদিগকে "যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী" এই উদাস কবিতা শুনাইয়া দেয়। বস্তুতঃ "ইষ্টক উপরে ইষ্টক স্থাপন করিয়া" কাহারও অমরতার আশা পূর্ণ হয় নাই। অযোধ্যা, মথুরা, উজ্জয়িনী বা হস্তিনাপুরী—ইষ্টকগ্রথিত কীর্ত্তিমাত্রেরই পরিণাম একই। কিন্তু যাঁহারা প্রতিভার দিব্যজ্যোতিতে বিশ্বপ্রহেলিকা ভেদ করিয়া মানবমণ্ডলীকে কোন নূতন পথ দেখাইতে পারিয়াছেন অথবা জগতে কোন নূতন সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিতে পারিয়াছেন, সেই বাগ্দেবীর উপাসকগণের রসভাবময়ী লেখনীই জগতে অমরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে। সর্ব্ববিনাশক কাল সে কীর্ত্তির কণামাত্রও ধ্বংস করিতে পারে নাই। উজ্জয়িনীর অভ্রভেদী রত্নগঠিত রাজপ্রাসাদ বালুকাকণায় পরিণত হইয়াছে, কিন্তু শকুন্তলা ও মেঘদূতের মধুময়ী কবিতাকৌমুদী আজিও তেমনি জ্যোতির্ম্ময়ী রহিয়া কালিদাসের অমরত্ব প্রকাশ করিতেছে। শতশ্রীসমৃদ্ধিসঙ্কুলা যে অযোধ্যানগরী এখন আর নাই, কিন্তু তমসার শীতল প্রবাহের ধারে মহর্ষির শান্ত হৃদয়কন্দর হইতে রামায়ণী গঙ্গার যে করুণস্রোতঃ নিঃসৃত হইয়াছিল, বাল্মীকির অমরতার চিহ্নস্বরূপ তাহা আজিও বিমলরূপে তেমনি

প্রবাহিত আছে। জগতে কবিই অমর। আমরা অদ্য এইরূপ অমর এক মহাত্মার কীর্ত্তির কথা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

বঙ্গভাষার শৈশব অবস্থায় যে সকল প্রতিভাশালী বঙ্গসন্তান স্বীয় লেখনী দ্বারা মাতৃভাষার সেবা করিয়াছিলেন, কবি রূপনারায়ণ ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে একজন। রূপনারায়ণ বঙ্গের বেদস্থানীয় মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে বিবিধ ছন্দে বিবিধ রসালঙ্কারের লীলা দেখাইয়া 'দুর্গামঙ্গল' নামক গীতকাব্য বা পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। রূপনারায়ণের গ্রন্থ চণ্ডীর অনুবাদ। কিন্তু সে অনুবাদ, সংস্কৃত শ্লোকের অনুস্বার-বিসর্গহীন আবৃত্তিমাত্র নহে। যাহাতে সাধারণে চণ্ডীর তত্ত্বকথা সহজে বুঝিয়া আগ্রহের সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তন করে, রূপনারায়ণ সেই উদ্দেশ্যে বিচিত্র ব্যাখ্যার সহিত বিবিধ রাগরাগিণী ও ছন্দের রসে রসময় করিয়া ললিত পদে চণ্ডীর তত্ত্ব গ্রহন করিয়াছেন। তাঁহার রাগরাগিণী ও পদমাধুর্য্যে অনেক বৈষ্ণব কবির গরিমা ম্লান হইয়াছে; তাঁহার সরল মধুর ব্যাখ্যায় চণ্ডীর অনেক জটিলতত্ত্ব সহজবোধ্য হইয়াছে। রূপনারায়ণের কৃতিত্ব অসাধারণ। রূপনারায়ণ ভিন্ন সে কালে কেন, একালেও বোধ হয় কোন কবি সংস্কৃতের পদ্যানুবাদে এমন মধুরতায় ঝঙ্কার করিতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা কাটাবিয়ার অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের চণ্ডীর অনুবাদের কথা সাহিত্য-পরিষদে প্রকাশ করিয়াছি। ভাষার শৈশব সময়ে ভবানীপ্রসাদ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বড়ই গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। তাহাতে আবার তিনি অন্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে উহা যে কত আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বঙ্গভূমি চিরদিন অন্ধের এক কীর্ত্তিরত্ন সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া অন্য দেশের সহিত স্পর্দ্ধা করিবে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, রূপনারায়ণের অনুবাদের সহিত ভবানীপ্রসাদের অনুবাদের কি ভাষার মধুরতা, কি মূলের সহিত সমতা-রক্ষা, কি অলঙ্কার, কি ছন্দ, কোনও বিষয়েই তুলনা হয় না। নারায়ণ কবিত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই চণ্ডীর অনুবাদ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার রচনায় প্রতিপদে ছন্দ, অলঙ্কার ও রসের লীলাভিনয় হইয়াছে। ভবানীপ্রসাদের কাব্যসম্পদ্ ছিল না। তিনি অন্ধতাহেতু বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া চণ্ডীর অনুবাদচ্ছলে, বড়ই সরল প্রাণে সরল ভাষায় জগন্মাতার নিকট হৃদয়ের বেদনা জানাইয়াছেন। সুতরাং দুই জনের গ্রন্থ দুই রূপ হইয়াছে। একের রসালঙ্কার-লীলাময়ী রচনা বিবিধ ভূষণভূষিতা যুবতীর ন্যায় আনন্দোৎফুল্লা ও চঞ্চলা। অপরের রচনা পারিপাট্যবিহীনা শোকাতুরা বিধবার ন্যায় অশ্রুসিক্তা ও আর্ত্তনাদময়ী। এই কারণে এবং ভবানীপ্রসাদের অঙ্গহীনতার কথা স্মরণ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধে উভয়ের রচনা তুলনা করিতে বিরত হইব।

দুর্গামঙ্গলে রূপনারায়ণ আপনার কোন পরিচয় বা গ্রন্থরচনার কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। আমরা যে গ্রন্থ খানি পাইয়াছি, উহার লিপিকারকের নাম প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ। গ্রন্থের শেষ ভাগে নিম্নলিখিত কএকটী কথা লিখিত আছে ;—

"স্বাক্ষর শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ দীন, ভজন সাধনহীন, ভরসা কেবলমাত্র কালীর চরণ। আরাজান। সন ১২৩৫ সনের ১১ই বৈশাখ বেলা দুই প্রহরের সময় পুস্তক লেখা সমাপ্ত।"

এক্ষণে এই প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের পৌত্র শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় বর্ত্তমান আছেন। ইহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছে। ইহার নিকটেই আমরা দুর্গামঙ্গল পাইয়াছি। প্রসন্নবাবু ও তদ্বংশীয়েরা রূপনারায়ণকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দেন, সেই জন্য পুরুষানুক্রমে 'দুর্গামঙ্গল' গ্রন্থ যত্নের সহিত স্বীয় গৃহে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালাকে আজিও অনেক প্রাচীন লোকে প্রাকৃত বা পরাকৃত বলেন। এইজন্য ঘোষ মহাশয়দিগের গৃহে রক্ষিত এই গ্রন্থ 'পরাকৃত চণ্ডী' বলিয়া কথিত হয়। গ্রন্থ-শেষে যে আরাজান গ্রামের উল্লেখ আছে, উহা ময়মনসিংহ জেলার আটীয়া পরগণায় অবস্থিত। আরাজানের ঘোষ স্বদেশে 'কুলীন' বলিয়া পরিগণিত। আরাজানের ঘোষ মহাশয়দিগের বংশপত্রিকা অনুসারে রূপনারায়ণ ঘোষ প্রসন্নবাবু হইতে ৮ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। পূর্ব্বকালে বালিকা-বিবাহের রীতি ছিল বটে, কিন্তু পুরুষেরা ৩০।৪০ বৎসর বয়সে * বিবাহ করিতেন। এইজন্য গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ৩৫ বৎসর ধরিলে রূপনারায়ণ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ২৮০ বৎসর (৮ পুরুষ) পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

বঙ্গজ কায়স্থদিগের যে কএকটী সমাজ আছে, বাজুর সমাজ তন্মধ্যে একটী। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা ও ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহাকুমার অন্তর্গত স্থান 'বাজু' বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাজুতে বসতি করিলে কৌলীন্য নষ্ট হইবে—চন্দ্রদ্বীপের রাজা তৎকালীন কায়স্থ-সমাজপতি পরমানন্দ রায় এইরূপ নিয়ম করেন। এইজন্য কোন কুলীন সহজে এদেশে আসিতে চাহিতেন না। আদিশূর যে পাঁচজন কায়স্থ এদেশে আনয়ন করেন, মকরন্দ ঘোষ তাঁহার অন্যতম। এই মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষের নাম কার্য্য ঘোষ। এই কার্য্য ঘোষবংশীয় কামদেব ঘোষকে যশোহরাধিপতি বিক্রমাদিত্য চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহরে লইয়া যান। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য, মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে কামদেব ঘোষের প্রপৌত্র বাণীনাথ ও জগন্নাথ নামক ভ্রাতৃদ্বয় রাজবিপ্লবে ভীত হইয়া যশোহর হইতে পলাইয়া মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত আমডালা গ্রামে উপস্থিত হন। বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় আমডালার অধিপতি করবংশীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাণীনাথ নিহত হন। জগন্নাথ আমডালা হইতে পলায়ন করিয়া টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বাফলা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। তথাকার ভূম্যধিকারী যাদবেন্দ্র রায় (কাগমারী পরগণার প্রসিদ্ধ জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ) তাঁহার পরিচয় পাইয়া ইন্দুমতী নাম্নী স্বীয় কন্যাকে জগন্নাথের সহিত বিবাহ দিয়া আপন জমিদারীর অন্তর্গত বাফলাদিগর ২৭ খানি গ্রাম যৌতুক প্রদান করেন। কিন্তু জগন্নাথ ঘোষ এইরূপ প্রচুর যৌতুক পাইয়াও বাফলার

---

* কুলীন সন্তানেরা অল্পবয়সে বিবাহিত হইতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।—প : স

রহিলেন না। বাকলা হইতে পলাইয়া আদাজান গ্রামের হরা বৈরাগীর আখড়ায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যাদবেন্দ্র বহু যত্ন করিয়াও জগন্নাথকে বাকলা আনিতে না পারিয়া আদাজান গ্রামের কিয়দংশ ভূমি তাঁহাকে দান করিলেন। তদবধি জগন্নাথ ও তদীয় বংশধরগণ আদাজানে বসতি করিয়া দেশে 'আদাজানের ঘোষ' বলিয়া বিখ্যাত হন।" যাদবেন্দ্রের মৃত্যুর পর জগন্নাথ ঘোষ বাকলার জমিদার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া যত কষ্ট পাইয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি যে শ্লোক রচনা করেন, সে শ্লোকের অর্দ্ধ "যাদবেন্দ্র-বিহীনেয়ং বাকলা নিষ্ফলা মৃতা" এখনও লোক মুখে শুনা যায়। জগন্নাথের উল্লিখিত বিবরণ কুলজী গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"যশোর নগরে বাস ভাই দুইজন।
পিতামাতা হীন হৈয়া উৎকণ্ঠিত মন॥
রাজবিপ্লবনে ছিন্ন ভিন্ন হৈল দেশ।
বাণীনাথ জগন্নাথ চিন্তিল অশেষ॥
যশোর ত্যজিয়া দোঁহে চলে খাজুদেশ।
আমড়াদা নগরেতে করিল প্রবেশ॥
তথাকার অধিকারী ছিল করবংশ।
ধর্ম্মলেশ নাহি তার নিতান্ত নৃশংস॥
পরিচয় দোঁহাকার পেয়ে সেই কর।
যতনে রাখিল নিয়া আপনার ঘর॥
মনে মনে বিচারিয়া বলে সেই কর।
ভ্রাতৃদ্বয়ের অগ্রভাগে যুড়ি দুই কর॥
মোর ঘরে দুই কন্যা আছে সুলক্ষণা।
তাহা দোঁহে পরিণয় কর দুই জনা॥
হৈল দোঁহে অস্বীকার, ক্রোধে জ্বলে দুরাচার,
বলে শুন শুন মোর বাণী।
যদি বিয়া না করিবা, তার প্রতিফল পাবা,
পদ্মানদীমধ্যে যাবে প্রাণী॥
দুই ভাই হৈয়া ব্যস্ত, পলায়ন করে ত্রস্ত,
ধৃত হৈল বাণীনাথ ঘোষ।
কহে কর ধীবরেরে, ছালাতে ভরিয়া এরে,
পদ্মাতে ডুবালে নাহি দোষ॥
নাবিকেরা অতঃপরে, বাণীনাথে ধরি করে,
পুরা ভরি ছালার ভিতর।

ধরিতে তাহারে গিয়া, চলে পদ্মানদী বাহিয়া,
মধ্যে মিলে হইয়া সত্বর॥
বলে শুন মহাশয়, বিয়া কারে প্রাণ রয়,
নহেত পদ্মায় ডুবাইব।
তাহে বাণী বলে মন, করিয়াছি এই পণ,
যদি তবু বিয়া না করিব॥
"যেহি ভাই জগন্নাথ, না মিলুগেই কাদৃকি নাথ,
বেটা বেটিকো না দিবেগা বিয়া।
যব তক রহে শুদ্ধি বংশ, না করে ইয়া কৌন ধ্বংস,
যাগন্নাথ পদ্মায় রহে গিয়া।" (কায়স্থবংশাবলী ধৃত।)

এই জগন্নাথ ঘোষের পুত্রই রূপনারায়ণ ঘোষ। মানসিংহ ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তৎপরবর্ত্তী ১০ বৎসর মধ্যে জগন্নাথের যশোহর হইতে আদাবাদে বাস ও রূপনারায়ণের জন্ম ধরিলে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে রূপনারায়ণের জন্মকাল নির্ণীত হয়। এ হিসাবে রূপনারায়ণ ৩০০ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আমাদের পূর্ব্বোক্ত হিসাবে (প্রত্যেক পুরুষে ৩৫ বৎসর ধরিয়া) ২৮০ বৎসর পাওয়া যায়। সুতরাং এই উভয় মতে ২০ বৎসরের তফাৎ দেখা যায়। কিন্তু আমরা যে পূর্ব্বে প্রত্যেক পুরুষে ৩৫ বৎসর ধরিয়াছি, তাহা খুব ঠিক হয় নাই। সে কালে এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকেই প্রায় ৪০ বৎসরে বিবাহ করিতেন। এইজন্য এই ২০ বৎসর কম পাওয়া যাইতেছে। যাহাহউক রূপনারায়ণের আবির্ভাবকাল আমরা ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ বা বাঙ্গালা ১০০০ সন নির্দ্দিষ্ট করিতেছি।

ভাষাবিচার দ্বারাও রূপনারায়ণ যে ২৫০।৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, তাহা বুঝিতে পারা যায়। রূপনারায়ণের গ্রন্থে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ এখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। বাঙ্গালা-ভাষাভিজ্ঞ পাঠকগণ তদ্দর্শনে রূপনারায়ণের প্রাচীনত্ব অনুমান করিতে পারিবেন।

রূপনারায়ণের গ্রন্থে		বর্ত্তমান প্রচলিত	
১। কহন্তি	...	কহেন বা কহে।	"মহামুনি যেমন কহন্তি লোকপথ।"
২। করন্তি	...	করেন বা করে।	"মহা মহা দৈত্যকুল করন্তি চর্ব্বণ।"
৩। করুকা	...	করুন।	"আমা সমার দুর্গতি, হরুকা যে ভগবতী, কৃপাকরি করুকা কল্যাণ।"
৪। হরুকা	...	হরুন।	
৫। সমার	...	সবার।	
৬। আলাপন্তি	...	আলাপ করে।	"যতেক বিদ্যাধরী, কিন্নর কিন্নরী, রাগ আলাপন্তি রসাল।"

৭। মুনিতে ... মুনিকর্ত্তৃক। "মুনিতে পূজিত হৈয়া সুরথ নৃপতি।"
৮। তোমাত ... তোমাকে। "দেবীর চরিত্র কিছু কহিব তোমাত।"
৯। তোমাক ... তোমাকে। }
১০। বলোঁ ... বল। } "অতএব বলোঁ তোমাক কি করিব স্তুতি।"
১১। ভকতিয়ে ... ভকতিতে। "ভকতিয়ে নম্রমূর্ত্তি মুদিত লোচন।"
১২। তাহান ... তাঁহার। "কি কর্ম্ম করেন কিবা স্বভাব তাহান।"
১৩। তাথে ... তাহাতে। "উৎপন্ন করিয়া তাথে করিয়া পোষণ।"
১৪। ইবা ... এই। "ইবা শিশু, ইহার করিবে কোন্ কর্ম্ম।"
১৫। ই ... এ। "তাহার ইরূপ হোক তাহা নাহি লিখি।"
১৬। এমত ... এমন। "কি হেতু এমত হয় মুনির সম্ভম।"
১৭। মাউর ... মাতৃর। "ধানপী মাউর"
১৮। মাঙ্গিলা ... মাগিলা। "যে বর মাঙ্গিলা ব্রহ্মা সেহি বর পাইলা।"
১৯। সেহি ... সেই। "সেহি দেবী বহুরূপা, সমাকে করুক কৃপা।"
২০। বিনু ... বিনা। "যা বিনু শকতিহীন, ঈশ আদি লোক তিন"
২১। জিন ... যিনি। "পূর্ব্বাপর প্রতিদিন, সুরেন্দ্র সেবিত জিন"
২২। সহসাৎ ... সহসা। "উঠিয়া সহসাৎ, দেখিলা সাক্ষাৎ"
২৩। কমুন ... কেমন। "না জানি কমুন পুণ্যে আসিয়াছি হেথা।"
২৪। এতেক ... এত, বা এই। "এতেক স্তবন যদি কৈলা প্রজাপতি।"
২৫। দেখিল ... দেখিলাম। (১) "বড়ই সাহস এই দেখিল তোমার।"

রূপনারায়ণ শক্তির উপাসক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। দুর্গামঙ্গলে তিনি স্বয়ং যে সকল সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। গ্রন্থ মধ্যে সংস্কৃত তূণকাদি ছন্দ প্রয়োগ, সুললিত বহুল সংস্কৃত শব্দ, ক্রিয়াপদ ও অলঙ্কারযুক্ত রচনা এবং প্রসিদ্ধ কবিগণের ভাব অবিকল গ্রহণ তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞতার অভ্রান্ত প্রমাণ। গ্রন্থারম্ভে কবি যে দুইটী শ্লোক লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"প্রণম্য পরমানন্দং শ্রীগুরুং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
বক্ষ্যামি দিক্কিশোরকায় দেবী মাহাত্ম্যমুত্তমং।
খর্ব্বং স্থেরকরং মহীধরসুতাসুতং গজেন্দ্রাননং।
নানাসাধ্যসুসাধ্য কর্ম্মসুখদং সিদ্ধিপ্রদং সুন্দরং।
বন্দেহহং সততং গজেন্দ্রবদনং সিন্দূরশৈলপ্রভং
সিদ্ধিং দেহি গণেশাধীশ! পরমং দুর্গামহামঙ্গলে॥"

(১) এইরূপ প্রয়োগ অর্থাৎ কর্ত্তা উত্তম পুরুষ, ক্রিয়া নাম পুরুষ, গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়।

গ্রন্থারম্ভে বিনয়-প্রকাশার্থ রূপনারায়ণ, মহাকবি কালিদাসের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন ;—

"দেবীর মাহাত্ম্য শুনি চপল হৃদয়। পারিবা না পারি কিছু বলিব নিশ্চয় ॥ (১)
গুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে। দুস্তর সাগর চাহি উড়ুপে তরিতে ॥ (২)
প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ। হাতে পাইতে ইচ্ছা করয়ে বামন ॥ (৩)
পরন্তু ভরসা এক মনে ধরিতেছে। বজ্রবিদ্ধ মণিতে সূত্রের গতি আছে ॥ (৪)
এহি সব দৃষ্ট কথা হৃদয়ে ভাবিয়া। চণ্ডীর বৃত্তান্ত কহি শুন মন দিয়া ॥"

সংস্কৃত ব্যতীত ব্রজভাষা ও হিন্দীপ্রভৃতিতেও রূপনারায়ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে বহুপরিমাণে ব্রজভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। রূপবর্ণনা-স্থলে রূপনারায়ণ বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় বিবিধ সুললিত ছন্দে ব্রজভাষায় ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল স্থলের রচনা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের রচনা হইতে কোনও অংশে হীন নহে। বরং অনেক স্থলে বর্ণনার নূতনত্ব ও ভাবের চাতুর্য্য আছে। আমরা দুই একটী স্থল পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য উদ্ধার করিতেছি ;—

১। বদন মদন স্যন্দন জানি। কুণ্ডল চারুচক্র মানি ॥
　যো রথ আরোহি মদন বীর। জিনিল পিনাকপাণি ধীর ॥
২। সবিতা সিন্দূরবিন্দু, চন্দনতিলক ইন্দু, উজ্জ্বল কজ্জল মেঘ, ভালে ভাল শোভিনী।
৩। ললিত ত্রিবলি জানি, মনে এহি অনুমানি, ভঞ্জনের ভীতিহেতু, কটি তটে আটনী।
৪। উচ্চ কুচ অতি চারু, জিতিল সুমেরু মেরু, হাররূপে ছোঁহি গঙ্গু, রঙ্গে বাগকারিনী।

রূপনারায়ণ মার্কণ্ডেয়-পুরাণ অবলম্বন করিয়া 'দুর্গামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। "পুরাণ প্রমাণে কহে রূপনারায়ণ" একথা তিনি বারংবার বলিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে নিম্নলিখিত দুএকটী শ্লোকে গ্রন্থরচনার কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

"পক্ষি সবে কহে কথা জৈমিনি শুনয়। সে কথা গাঁথিলা শ্লোকে ব্যাস মহাশয় ॥
মহামুনি বেদব্যাস তাঁহার বচন। সংস্কৃত কারণে না বুঝে সর্ব্বজন ॥
সতত চণ্ডীর কথা শুনিতে অভিলাষ। ই হেতু পাঁচালী করি করিল প্রকাশ ॥
সেহি পুণ্যময় কথা শুনিতে সন্তোষ। পয়ারে কহিল রূপনারায়ণ ঘোষ ॥"

'সর্ব্বজন' বুঝাইবার জন্য রূপনারায়ণ 'চণ্ডীর কথা' পাঁচালী বা গীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার অনুবাদ আক্ষরিক হয় নাই। বিচিত্র রাগরাগিণী ও বিবিধ ছন্দে সুললিত শব্দবিন্যাস দ্বারা সর্ব্বজনের হৃদ্য, সুখশ্রাব্য ও সহজবোধ্য করিয়া তাঁহাকে এই গীত রচনা করিতে হইয়াছিল। এ অবস্থায় ও মূলের সহিত আক্ষরিক সাম্য-রক্ষা

(১) "তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ।"
(২) "তিতীর্ষুঃ দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।"
(৩) "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"
(৪) "মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" (রঘুবংশ।)

করিতে তিনি অল্প চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার চেষ্টা অনেক স্থলেই বিস্ময়কর সফলতা লাভ করিয়াছে। যে সকল স্থলে মূলের সহিত আক্ষরিক সমতা রক্ষা করিতে গেলে গ্রন্থের মর্ম্ম সুব্যক্ত হয় না, রূপনারায়ণ সে স্থলে সমতা-রক্ষার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বিচিত্র ব্যাখ্যা দ্বারা চণ্ডীর মর্ম্ম বুঝাইয়াছেন। এই সকল স্থলে তাঁহার অমর লেখনী অনুবাদের বন্ধন-মুক্ত হইয়া কি বর্ণনা কি ভাব সকল বিষয়েই অমৃত উদ্গার করিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের সহিত দুর্গামঙ্গলের প্রথমভাগে ঘটনাগত দুই একটী বৈষম্য দেখা যায়।—মার্কণ্ডেয়পুরাণে বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী পক্ষিগণ বক্তা, জৈমিনি শ্রোতা। দুর্গামঙ্গলের বক্তা ও শ্রোতা তাহারাই। কিন্তু জৈমিনির বিন্ধ্যপর্ব্বত-গমন ও প্রশ্নজিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত ঘটনা, দুই গ্রন্থে একরূপ নহে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, একদিন ব্যাসশিষ্য জৈমিনি মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

১। কস্মাৎ মানুষতাং প্রাপ্তো নির্গুণোঽপি জনার্দ্দনঃ।
বাসুদেবো জগৎসৃষ্টিস্থিতিসংযমকারণং।
২। কস্মাচ্চ পাণ্ডুপুত্রাণামেকা সা দ্রুপদাত্মজা।
পঞ্চানাং মহিষী কৃষ্ণা হ্যত্র নঃ সংশয়ো মহান্।
৩। ব্রহ্মহত্যাং ব্রহ্মহত্যায়া বলদেবো মহাবলঃ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন কস্মাচ্চক্রে হলায়ুধঃ।
৪। কথঞ্চ দ্রৌপদেয়াস্তেঽকৃতদারা মহারথাঃ।
পাণ্ডুনাথা মহাত্মানো বধমাপুরনাথবৎ॥

প্রশ্ন শুনিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি কহিলেন, আমার এখন ক্রিয়াকাল উপস্থিত, আমি বলিতে পারিব না। তুমি বিন্ধ্য পর্ব্বতে যাও; সেখানে পিঙ্গাক্ষ, বিবোধ, সুপত্র ও সুমুখ নামে বেদশাস্ত্রজ্ঞ চারিটী পক্ষী আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই সবিস্তর জানিতে পারিবে। জৈমিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই পক্ষীরা কে? মার্কণ্ডেয় পক্ষিগণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন উপলক্ষে কহিলেন, ইহারা সুকৃষ নামক মুনির পুত্র; অতিথিকে আত্মমাংস প্রদান করিতে অস্বীকার করায় পিতৃশাপে পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। জৈমিনি অতঃপর বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিয়া পক্ষীদিগকে প্রশ্নচতুষ্টয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর দেন। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের এই ঘটনা দুর্গামঙ্গলে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"ব্যাসশিষ্য মহাতেজা জৈমিনি তপোধন। গুরুকে জিজ্ঞাসে মুনি অপূর্ব্ব কথন॥
কহ গুরুদেব মোকে পরম তত্ত্বকথা। চণ্ডীর বৃত্তান্ত কহ না কর অন্যথা॥
অষ্টম মন্বন্তরেত সন্দেহ বহুতর। তার প্রতি ভ্রম মোর ঘুচাও সত্বর॥
এতেক কহিলা যদি করিয়া ভকতি। কহিলেন ব্যাসদেব তবে তার প্রতি॥
পরম আমোদে তবে তাহাকে কহিলা। সাধু সাধু বলি মুনি অতি প্রশংসিলা॥

ভাল প্রশ্ন করিছ জৈমিনি তপোধন। সকল না জানি আমি সেহি বিবরণ॥
মার্কণ্ডেয় মহামুনি তপ করে যথা। সত্বর গমনে তুমি চলি যাও তথা॥
এতেক কহিলা যদি ব্যাস মহামুনি। গুরুর আজ্ঞায় তথা চলিলা জৈমিনি॥
মার্কণ্ডেয় স্থানে উত্তরিলা তপোধন। জৈমিনি করিলা তাঁর চরণ বন্দন॥
মার্কণ্ডেয় দিলা তাকে বসিতে আসন। অতিথি ব্যবহারে মুনি করিলা অর্চ্চন॥
প্রশ্ন দুর হৈলে তবে জিজ্ঞাসে বচন। কহ মুনিবর এথা গমন কারণ॥
তবে মুনি জৈমিনি করিলা নিবেদন। অষ্টম মন্বন্তরের কথা অপূর্ব্ব বিবরণ॥
সেহি পুণ্যময় কথা বিশেষ শুনিতে। ই হেতু আইল মুনি তোমা সম্ভাষিতে॥
তবে মার্কণ্ডেয় মুনি বিনয় করিয়া। উপদেশ কহিলা জৈমিনি সম্বোধিয়া॥
নিয়ম করিছি আমি তপস্যা কারণ। কহিতে বিলম্ব হয় না পারি এখন॥
বিন্ধ্য পর্ব্বতে আছে পক্ষী দুইজন। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তারা বড়ই নিপুণ॥
গৌতমের পুত্র তারা গৌতম সমান। গৌতমের শাপে পক্ষিযোনি উপাদান॥
তা সবার ঠাঁঞি তুমি যাও মুনিবর। সকল বৃত্তান্ত তারা কহিবে সুন্দর॥
মার্কণ্ডেয় স্থানে শুনি এতেক বচন। বিন্ধ্যপর্ব্বতে তবে গেলা তপোধন॥
দেখিলা তথাতে গিয়া পক্ষী দুইজন। পক্ষী সম্ভাষিলা বলি বিনয় বচন॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হেন জানিলা নিশ্চয়। কিন্তু পক্ষীরূপ দেখি মনেতে বিস্ময়॥
ইরূপ হইল কোন কর্ম্মের বিপাকে। কহিবা সে সব কথা যদি কৃপা থাকে॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম্মপক্ষী কহে কথা। জিজ্ঞাসিলা মুনিবর কেন আইলা এথা॥
পক্ষিরূপ হৈল আমি শাপের কারণ। শুন মুনিবর আগে সেহি বিবরণ॥
গৌতম নামে শুনিয়াছ মহাতপোধন। তাহার আশ্রমে আইলা অতিথি একজন॥
অতিথি কহিল কথা মুনি সম্বোধিয়া। আতিথ্য করিবা আজি নরমাংস দিয়া॥
শুনিয়া এতেক কথা গৌতম তপোধন। পুত্র সব আনি মুনি জিজ্ঞাসে তখন॥
মাংসাকাঙ্ক্ষী অতিথি হইল উপস্থিত। আপনার মাংস তাকে দিবার উচিত॥
আমরা সম্মত নহি বলিল তখন। পুত্রকে মারিতে চাহে বাপ নিদারুণ॥
এতেক শুনিয়া মুনি কুপিল অন্তরে। দুঃসহ দারুণ শাপ শাপিলা সত্বরে॥
না জান অতিথিপূজা অজ্ঞান কারণ। পক্ষিযোনি হও গিয়া তোরা দুইজন॥
তবেত গৌতম মুনি মহা তপোধন। অতিথের পূজা হেতু ভাবিলা তখন॥
কাটিতে আপন তনু উদ্যম করিলা। হেন কালে সেহি দেশ আসিয়া ধরিলা॥
মুনি সম্বোধিয়া তিনি বলিলা তখন। তোমার মাংসেতে আমার নহে প্রয়োজন॥
ব্রাহ্মণের মাংস আমি না করি ভোজন। প্রকারে বুঝিল তোমার অতিথি কেমন॥
এতেক কহিলা যদি প্রভু নারায়ণ। আমা সবা প্রতি মুনি ভাবিলা তখন॥
কপট না বুঝি শাপ দিল অকারণ। প্রতিকার বলি শুন পুত্র দুই জন॥

আমার মুখের কথা না হবে অন্যথা। পক্ষী হইয়া পাইবে পরম জ্ঞানকথা॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইবা ব্রহ্মজ্ঞানবন্ত। সর্ব্বতত্ত্ব জানিবা বেদের কত অন্ত॥
এতেক কহিলা মুনি শাপ প্রতিকার। তদবধি পক্ষী হইয়া আছি বহুকাল॥
ধর্ম্মপক্ষী হইয়া আছি শুন তপোধন। তোমার গমন হেথা কহ কি কারণ॥
তবে মুনি জৈমিনি করিলা নিবেদন। শুন পক্ষিরাজ কহি গমন কারণ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীর পূর্ব্বকথা। তোমা হৈতে শুনিবারে আসিয়াছি হেথা॥
পরম কৌতুক কথা মহা পুণ্যময়। শুনিতে করিল ইচ্ছা কহ মহাশয়॥
তবে সেহি ধর্ম্মপক্ষী লাগিলা কহিতে। মার্কণ্ডেয় যে কহিল তাহার সহিতে॥"

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, জৈমিনি মহাভারতীয় প্রশ্নচতুষ্টয় লইয়া মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট উপস্থিত হন। প্রথমে ব্যাসের নিকট জিজ্ঞাসা রূপনারায়ণের কল্পনা-প্রসূত। প্রথমে স্বীয় গুরুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যের নিকট যাওয়া বোধ হয় রূপ-নারায়ণের মনে ভাল লাগে নাই। সেই জন্যই মূলে ব্যাসের নিকট জিজ্ঞাসা না থাকিলেও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতীয় প্রশ্নচতুষ্টয়ের স্থলে "চণ্ডীর বৃত্তান্ত কহ না কর অন্যথা" এই প্রশ্ন কল্পনা করা বোধ হয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততা ও চণ্ডীর গৌরব সূচনার জন্য। চারি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া চণ্ডীর বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত পঁহুছিতে অনেক বর্ণনা করিতে হইত এবং তাহাতে চণ্ডীর বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িত, কিন্তু চণ্ডীর বৃত্তান্ত প্রধান ভাবে বর্ণনাই রূপনারায়ণের উদ্দেশ্য ছিল, এই জন্যই প্রশ্নের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পক্ষিগণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত, জৈমিনির পুনঃ পক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা, পক্ষিগণের পিতার নাম শৃঙ্গী না বলিয়া গৌতম বলা, চারি পক্ষী স্থলে দুই পক্ষী বলা, এবং অতিথিরূপে ইন্দ্রকে উপস্থিত না করিয়া নারায়ণকে উপস্থিত করার কারণ নির্ণয় করা যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে পক্ষিগণের শাপ-মোচনের স্থলে লিখিত হইয়াছে—

> "যদাত্র যুষ্মাভিরহং প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ।
> তস্মাৎ তির্য্যক্ত্বমাপন্নাঃ পরং জ্ঞানমবাপ্স্যথ।
> জৈমিনেঃ প্রশ্নসন্দেহান্ যদা বক্ষ্যথ পুত্রকাঃ
> তদা মোক্ষ্যথ মচ্ছাপাদেষ বোহনুগ্রহঃ কৃতঃ॥"

রূপনারায়ণ পক্ষিগণের শাপ-মোচনের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু জৈমিনির প্রশ্নের উত্তর দিলেই যে তাহাদের শাপ-মোচন হইবে সে কথা বলেন নাই। প্রস্তাব এইরূপ অসম্পূর্ণ রাখিবার কারণ কি, নির্ণয় করা যায় না। যাহা হউক, ইহা ব্যতীত মার্কণ্ডেয়পুরাণের বর্ণনার সহিত দুর্গামঙ্গলের ঘটনাগত আর কোন অনৈক্য দেখা যায় না। "সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো" হইতে "সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ" পর্য্যন্ত ঘটনাগুলি একই প্রকার। তবে অনুবাদের সরলতা বা সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য অথবা ভক্তি বা

কবিত্ব-প্রদর্শনার্থ স্থানে স্থানে মূল অপেক্ষা কোন কোন বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে স্থলে দেবীর রূপ-বর্ণনা এক কথায় সমাপ্ত হইয়াছে, রূপনারায়ণ সেই রূপ বর্ণনা হয়ত দুই পৃষ্ঠায় পূর্ণ করিয়াছেন। উপমা, অতিশয়োক্তি, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা প্রাচীন বঙ্গকবিরা অতি প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন। রূপনারায়ণও দুর্গামঙ্গলে অনেক স্থলে সে কর্তব্য বিবিধ ছন্দ ও অলঙ্কারে পালন করিয়াছেন। এইকালে আমাদের নিকট এই সকল রূপবর্ণনার ঘনঘটা তাদৃশ প্রীতিকর না হইলেও সে কালের শ্রোতাগণ উহাতে মুগ্ধ হইতেন। বরং সে কালে অন্ত বর্ণনা অপেক্ষা এই সকল বর্ণনারই অধিক আদর ছিল। উপমার জন্ত কবিগণ অর্দ্ধচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র, প্রবাল, মুক্তা, বিম্ব, রাজহংস, কদম্ব, কদলী, সিংহ, হস্তী, কোকিল, খঞ্জন প্রভৃতি খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক এক মহাসত্য আবিষ্কার করিতেন। রূপনারায়ণ রূপবর্ণনাদি স্থলে এই সকল চিরন্তন উপমা-সহচরীর লীলা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। এই সকল স্থলেই তাহাকে মূল হইতে দূরে যাইতে হইয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রূপনারায়ণ চণ্ডী অবলম্বনে দুর্গামঙ্গল নামক গীতকাব্য বা পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ চণ্ডীমাহাত্ম্য রসালঙ্কার রাগ রাগিণীবিশিষ্ট গীতে পরিবর্ত্তিত করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। আধুনিক আক্ষরিক অনুবাদের মত নীরস অনুবাদ অনুস্বার বিসর্গহীন বঙ্গীত প্রকাশ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সাধারণে যাহাতে চণ্ডীমাহাত্ম্য অনুরাগের সহিত শ্রবণ কীর্ত্তন করে, তাহার জন্ত তিনি বিবিধ রাগ রাগিণী, বিবিধ ছন্দ অলঙ্কার, ও বিচিত্র ব্যাখ্যা দ্বারা চণ্ডীর নীরস কথাগুলিকে সরস করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি যে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, দুর্গামঙ্গল পাঠ করিলে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

রূপনারায়ণের গ্রন্থে ত্রিপদী, চতুষ্পদী, তূণক, একাবলি, পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কবি এই সকল ছন্দের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে কেবল দুইটী ছন্দের নাম দেখা যায়—পয়ার ও গীতছন্দ। আমরা যাহাকে পয়ার বলি, রূপনারায়ণও তাহাকেই পয়ার বলিয়াছেন। কিন্তু গীতছন্দ বলিয়া কোন বিশেষ ছন্দকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কোন স্থলে পয়ার কোন স্থলে ত্রিপদী গীতছন্দ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতছন্দের অর্থ 'গাহিবার পদ' করা যাইতে পারে, কিন্তু সে অর্থ এ গ্রন্থে খাটে না। কেন না দুর্গামঙ্গলের সমস্তই গান। যেখানে নূতন ছন্দ বা নূতন কোন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থলেই রাগিণী ও ধুয়া লিখিত আছে। ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের নাম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। রাগিণী ও তাল অনুসারে পদ রচনা করা হইত। রূপনারায়ণের গ্রন্থে মালসী, পটমঞ্জরী, কামোদ, ভৈরবী প্রভৃতি বিবিধ রাগিণী ব্যবহৃত হইয়াছে। রূপনারায়ণের রচনার আদর্শ ও রাগ রাগিণী প্রয়োগের প্রথা দেখাইবার জন্ত আমরা কএকটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

মালশী—ভৈরবী।

বরতি জগতি সুন্দরী দেবী।
শৌরি গৌরীনাথ সেবি॥ ধুয়া।

পাবক তপন কিরণ দেহ।
চিকুর নিকর সজল মেহ॥
পীযূষ সদন বদন ইন্দু।
তরল কমল শঙ্কু সিন্ধু॥
অলক তিলক ভালে শোহে।
সুন্দর সিন্দূর বিন্দু তাহে॥
কবরী কেশর কুসুম শালী।
শিরসি প্রকট মুকুট ভালি॥
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন তিন।
ঈষৎ আলক নিমিখ হীন॥
জলধি অসীম ভাঙর ভঙ্গ।
উপেখি কাম ধনুক রঙ্গ॥
বদন মদন স্যন্দন জানি।
কুণ্ডল চারু চক্র মানি॥
সো রথ আরোহি মদন বীর।
জিনিল পিনাকপাণি ধীর॥
নাশা উপর নাস মোতি।
কনক চন্দ্র কাঁতি সাঁথি॥
ভুবনবিজয়ী বৈজয়ন্তী।
উপেখি কাম বাম চিত্তি॥

বিম্ব নিন্দিত অধর রঙ্গ।
তহি ভুলি ভ্রমতি ভৃঙ্গ॥
চারু দশন অশনি কাঁতি।
নিন্দে দাড়িম্ব বীজ পাঁতি॥
অমিঞা বরিখে মধুর ভাখি।
মধুর মন্দ মন্দ হাসি॥
কম্বু কণ্ঠ মোহে গর্ব্ব।
হরল কমল নাগ গর্ব্ব॥
পাণি মানি পদ্মনাল।
শোহে কনক করট জাল॥
পীন সঘন সুকুচ ভার।
ভাতি বিবিধ রতন হার॥
ক্ষীণ মধ্য ত্রিবলি বন্ধ।
সাধন শম্ভু সিদ্ধি পন্থ॥
হেরি গভীর নাভি কূপ।
বাম আশ ভুজগ ভূপ॥
নূপুরে শ্রীপুরে নাদযুক্তি।
শবদ অবোধ বোধযুক্তি॥
সেহি পাদপদ্ম সঙ্গ।
রহল রূপ নারায়ণ ভৃঙ্গ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

নমো নমো মহাদেবী, তোকে সতত সেবি, তুমি নারায়ণী বহুরূপা।
কি করিব তোমা স্তুতি, আমার অল্পমতি, আপন প্রভাবে কর কৃপা।
অখিল জগৎ জনে, আর পঞ্চভূত প্রাণে, যিনি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা।
নমো নমো তাঁর পদে, সতত পরমাহ্লাদে, বিশ্বরূপা তুমি জগন্মাতা।
চৈতন্যরূপিণী যিনি, ব্যাপিয়া জগৎ তিনি, আছেন পরম সূক্ষ্মস্থলে।
তিনি দেবী কৃপাময়ী, সৃষ্টের রক্ষা কর্ত্রী, নমো নমো তাঁর পদতলে।

আমা সবার দুর্গতি, হরুকা সে ভগবতী, কৃপা করি করুকা কল্যাণ।
যেহি দেবী পূর্ব্বকালে, অমর স্তবন কৈলে, মারিলা মহিষ বলবান।
পূর্ব্বাপর প্রতিদিন, সুরেন্দ্রসেবিত বিন, ইষ্ট লাভ করেন যাহায়।
তিনি সে পরমেশ্বরী, অসুর-সংক্ষয়-কারী, নমো নমো নমো তার পায়।
যাহাকে স্মরণ মাত্র, হরে দুঃখ অচিরাত, সর্ব্বাপদ বিনাশে তখন।
ব্রহ্মা আদি করি সেবে, যাহার চরণ সেবে, সে পদ কমলে রহু মন।
মহাদৈত্য তাপ পাইয়া, ভক্তি নম্র মূর্ত্তি হৈয়া, সম্প্রতি স্মরণ করি তাক।
করুণা অসুর নাশ, পূর্ণ হউক অভিলাষ, শুনিয়া সুরের স্তুতিবাক্।
ভগবতী তারিণী, ভবভয়-হারিণী, দুর্গা দুর্গভয়ে কর পার।
তোমার পদারবিন্দে, সতত পরমানন্দে, নমো নমো নমো বারে বার।
এই অভিলাষ করি, স্তুতি কৈলা কর যুড়ি, অরি ভয় পাইয়া দেবগণ।
কহে রূপনারায়ণ, সংযত করিয়া মন, তাবে যেন সদা সে চরণ।

ভৈরবী।

দেখ দেবী ভদ্রকালী,
দিক্ চণ্ড ভুণ্ড শালী,
দিক্ পাদ দিক্পাণি পালিনী। ধুয়া।

দিক্ তিন গুণ আঁখি,
বিরিঞ্চি + রাখি,
বিবিধ আয়ুধ আধ
গুরধীশ ধারিণী।

জানকী শ্রেয়সী দেবী,
পাদপদ্ম নিত্য সেবি,
অঞ্জন গঞ্জন দেহ,
ভীম ভীম রূপিণী।

খড়্গপাণি লোহ দণ্ড,
নিশ্চিত + মুণ্ড,
দৃঢ়তর কোদণ্ড দণ্ড,
শঙ্খ শূল ধারিণী।

কৌমোদকী চারু চক্র,
শোহে বৈরী নাশে দক্ষ,
অসংখ্য বিপক্ষে কক্ষ,
সর্ব্বভক্ষ্য ভক্ষণী।

ইন্দ্র চন্দ্র দেববৃন্দ,
পূজহি পদারবিন্দ,
বাহন মৃগেন্দ্র ইন্দ্র,
ব্রহ্মবন্দ্যবন্দিনী।

এহি রূপে দেখি মাতা,
আনন্দে বন্দিলা ধাতা,
প্রসন্ন প্রসন্ন + ,
দৈব ভীতি বারিণী।

ই ভব তরিতে সেতু,
শক্তি ভক্তি মুক্তি হেতু,
আনন্দে মহারবিন্দে,
তার তাই ভাবিনী।

সেহি দেবী বহুরূপা,
সবাকে করুক্‌ কৃপা,
রূপনারায়ণ ঘোষ,
ভাব পরকাশিনী।

সাধারণে যাহাকে আগ্রহে শ্রবণ কীর্ত্তন করে এবং নিতান্ত অজ্ঞ লোকেও যাহাতে চণ্ডীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, রূপনারায়ণ তাহার জন্য বিবিধ রাগ-রাগিণী যোগে চণ্ডীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই জন্য মার্কণ্ডেয়-পুরাণে যে কথা দুই শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, রূপনারায়ণ দুই পত্রে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য চণ্ডীর এক অংশ ও দুর্গামঙ্গলে তাহার যে অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ।
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ।
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্।
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতু বৈশ্যপার্থিবৌ॥

রাজোবাচ।

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা।
মমত্বং মমরাজস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।
জানতোঽপি যথাঽজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম।
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্‌ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দী তথাপ্যতি।
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ।
তৎকেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা।

ঋষিরুবাচ।

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্।
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ।

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলাঃ।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যৎ তেষাং মৃগপক্ষিণাং।
মনুষ্যাণাঞ্চ যৎ তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ।
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা।
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি।
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ।
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

এতেক কহিয়া তবে সুরথ নৃপতি। বৈশ্য সঙ্গে করি তথা গেলা শীঘ্র গতি॥
যথা ঋষি মেধস তাহার ঠাঞি গেলা। প্রণাম করিয়া দুই কহিতে লাগিলা॥
প্রণাম করিয়া কহে সুরথ রাজন। এক নিবেদন করি শুন ভগবান॥
আমার হৃদয়ে এক জন্মিল বিস্ময়। খণ্ডাও সংশয় ঋষি তুমি মহাশয়॥
যে রাজ্য ছাড়িছি তার প্রজাগণ প্রতি। হস্তী ঘোড়া ধন রত্ন আর যত ইতি॥
এতেক রাজ্যাঙ্গ প্রতি দয়া কেন হয়। বিজ্ঞ হৈয়া অবিজ্ঞ হই বড়ই বিস্ময়॥
জানিতেছি যদ্যপি দারুণ ভৃত্যগণ। তথাচ অজ্ঞান প্রায় হই কি কারণ॥
আর এক বৈশ্য প্রভু দেখ সমুখেক। পুত্রদারা স্বজনে সর্ব্বস্ব হরিলেক॥
নিরস্ত করিল অতিশয় কুবচনে। মহাদুঃখী হৈয়া বৈশ্য আসিয়াছে বনে॥
যদ্যপি কলত্র পুত্র অতি নিদারুণ। তথাচ করয়ে স্নেহ কহ কি কারণ॥
সহা দুঃখে দুঃখিত আমরা দুইজন। দৃষ্ট দোষ বিষয় মমতা করে মন॥
দয়ারে আকুল চিত্ত ইবা কি বিষম। কি হেতু এমত হয় শুনিব সত্বর॥
অবিবেক তিমিরান্ধ হয় মূঢ় জন। অজ্ঞানে আবৃত সেহি থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
তাহার ইরূপ দোষ তাহা নাহি লিখি। জ্ঞানবন্ত হৈয়া কেন দেখিয়া না দেখি॥

সর্ব্বতত্ত্ব জানি তুই সকল সর্ব্বার্থ। জানিয়া যে জ্ঞানি কেন সব হয় ব্যর্থ॥
এতেক অপূর্ব্ব কথা রাজা নিবেদিল। তবে সে মেধস ঋষি কহিতে লাগিল॥
মহামুনি যেমন কহন্তি মোক্ষপথ। সাবধান হৈয়া শুনে সমাধি সুরথ॥
কহিহ ভকত ভাই হৈয়া একমন। দুর্গামঙ্গল কহে রূপনারায়ণ॥

ভৈরবী।

ভগবতী ভাবিনী ভবমোহিনী। হয়ার নিধান তিন লোকের জননী॥ ধ্রু
তবে ঋষি কহে শুন সুরথ নৃপতি। কহিব পরম তত্ত্ব কর অবগতি॥
আহার মৈথুন নিদ্রা ভয় আদি করি। বিষয় গোচর জ্ঞান ইহাকে সে বলি॥
এহিত বিষয় জ্ঞান সর্ব্বপ্রাণী ধরে। বিষয় স্বভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাব করে॥
ই বস্তু তোমার কহে ই বস্তু আমার। সুখ দুঃখ অভিলাষ যত ইতি আর॥
এ সকল জ্ঞান প্রাণী মাত্রের সমান। প্রকৃতি আকার ভিন্ন কিন্তু মতিমান্॥
এহি দেখ পরত্তেক আপন সাক্ষাত্। বিশেষিয়া কহি কিছু শুন নরনাথ॥
ভিন্ন প্রকৃতি দেখ ভিন্ন আকৃতি। দিবসে না দেখে পেচকাদি পক্ষীজাতি॥
কোন প্রাণী রাত্রি-অন্ধকাক আদি করি। রাত্রি দিনে অন্ধ কোন প্রাণী করি বলি॥
মার্জ্জারাদি করি জন্তু দেখে রাত্রি দিনে। বিষয়েত জ্ঞান আছে সকলের মনে॥
ইরূপ জ্ঞানেক যদি বল তুমি জ্ঞান। অনেক মনুষ্য তবে আছে জ্ঞানবান্॥
কেবল মনুষ্য নহে যেহি ধরে প্রাণ। পশু পক্ষী মৎস্য আদি সবের সমান॥
বিষয় গোচর জ্ঞানে জ্ঞানী সর্ব্বজন। মৃগ পক্ষী যেমত তেমতি নরগণ॥
ই জ্ঞানেক জ্ঞান না বলি নরনাথ। এহি পক্ষী দেখ রাজা আপন সাক্ষাত॥
যদ্যপি আপনে পক্ষী পীড়িত ক্ষুধাতে। আহার দিতেছে দেখ শিশুর মুখেতে॥
ইরা শিশু ইহার করিবে কোন কর্ম্ম। দেখহ মনুষ্যরাজ এহি জ্ঞানধর্ম্ম॥
উপকার পাবে করি অভিলাষ হৈয়া। শিশুকে আহার দেয় আপনে দুঃখ পাইয়া॥
ইহা কিনা দেখ রাজা আপন সাক্ষাত। সকলেরি মোহ আছে শুন নরনাথ॥
অতি মহাজ্ঞানী যিনি তার মোহ আছে। মায়ায় মোহিত মোহগর্ত্তে পড়িয়াছে॥
তোমরা সংসারী রাজা সংসারে উৎসুক। মোহ হয় করি মনে ভাব কেন দুঃখ॥
এহি যে তোমার মোহ না কর বিস্ময়। মহামায়ার প্রভাবে সকলের মোহ হয়॥

মায়ুর।

জয় জয় দেবী কে জানে তব সীমা। হরিহর ব্রহ্মা যার না জানে মহিমা॥ ধ্রু।
জগৎ পতির মায়া সেহি মহামায়া। জগৎ মোহেন তিনি মহামোহ দিয়া॥
মোহিত করেন মহাজ্ঞানী সেহি দেবী। ব্রহ্মা আদি করিয়া যাহার পদ সেবি॥
যোগনিদ্রা বিষ্ণুর সেহি ভগবতী। পরম আনন্দময়ী সর্ব্বত্র তার স্থিতি॥
সকল জ্ঞানীর চিত্ত বলে আকর্ষিয়া। মোহ দিতেছেন তিনি মহামায়া দিয়া॥

পরম জ্ঞানীর আত্মা এতাদৃশ হয়। তোমার হইব মোহ ই কোন বিস্ময়॥
সেহি মহামায়া দেবী সৃজনকারিণী। প্রসন্না হইলে তিনি মুকুতিদায়িনী॥
মহাবিদ্যারূপা ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী। পরম মুক্তির হেতুভূতা সনাতনী॥
মোক্ষসাধনরূপা সদা বিদ্যমানা। সংসার বন্ধের হেতু তিনি সে নির্গুণা॥
অবিদ্যা স্বরূপ মহাবিদ্যা স্বরূপিণী। সর্ব্বসুরেশ্বরী তিনি পরম কল্যাণী॥
যত ইতি চরাচর ব্রহ্মা আদি করি। সর্ব্ব সম্পূর্ণা তিনি সকলের ঈশ্বরী॥"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সাধারণে যাহাতে আগ্রহের সহিত শ্রবণ কীর্ত্তন করে, সেই উদ্দেশ্যে রূপনারায়ণ 'রায়মঙ্গল' 'মনসামঙ্গল' 'ভারতমঙ্গল' প্রভৃতি পাঁচালীর ন্যায় দুর্গামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মভূমিতে দুর্গামঙ্গল কীর্ত্তিত হইত। এই সকল কীর্ত্তন গ্রন্থে দুই শ্রেণীর গান দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর গান সকলে মিলিয়া বিশুদ্ধ রাগিণী ও তালযোগে গাইয়া থাকে। আর কতকগুলি গান প্রধান গায়ক সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়া যায়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর গানের প্রথম পদ বা ধূয়া পদের অন্যান্য লোকে প্রধান গায়কের এক এক চরণ আবৃত্তির মধ্যে মধ্যে গাইয়া থাকে। এই গান গুলি ঘটনার বর্ণনা মাত্র। এ গুলি প্রায়ই পয়ার ছন্দে রচিত, কদাচিৎ ত্রিপদীও দেখিতে পাওয়া যায়। রূপবর্ণনা, স্তব প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর গান। এ শ্রেণীর কোন কোন গানেও ধূয়া আছে। দুর্গামঙ্গলে এই উভয় শ্রেণীর গানই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থ মধ্যে বহু সংখ্যক ধূয়া আছে। আমরা দুই একটী ধূয়া উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

(১). ভৈরবী।

জয় জয় চণ্ডে, জিত চণ্ডমুণ্ডে,
প্রচণ্ডরূপিণী চণ্ড অসুর মুদণ্ডে॥

(২) ভৈরবী রাগ—গীতছন্দঃ।

কপালী করালী কালী, গোলে মুণ্ডমালা ডালি,
রক্তবীজ দৈত্যরাজ, হীন বীর্য্য বীর্য্যাদি।

(৩) ভৈরবী।

জননী গো জনম সৈরা অভিলাষা।
অভিমত এহি দেখি, করুণাময়ী তুঁহি, তুয়া নিজ কিঙ্করে আশা।

যে স্থলে কোন রসের অবতারণা করিবার অবসর ঘটিয়াছে, রূপনারায়ণ সেই স্থলে স্বীয় লেখনীকে অনুপ্রাসের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রস্তাব বা ছন্দের অবসান স্থলে কবি স্বীয় নামের ভণিতা দিয়াছেন। ভণিতাতে রূপনারায়ণ কবিত্বের সহিত ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকগণের অবলোকনার্থ আমরা তিনটী উদ্ধৃত করিলাম;—

১। সেহি পাদপদ্ম সঙ্গ।
রহল রূপনারায়ণ ভৃঙ্গ॥

২। স্তন দেবী বলি আমি, অসীম মহিমা তুমি,
তথাচ কহিতে করি সাধ।
কহে রূপনারায়ণ, শিশুর বচন যেন,
মায় শুনে করিয়া আহ্লাদ।

৩। যা বিনু শকতি হীন,
ঈশ আদি লোক তিন,
রূপনারায়ণ ঘোষ-ভাষপরকাশিনী।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে রূপনারায়ণ সংস্কৃত, ব্রজভাষা প্রভৃতি জানিতেন। দুর্গামঙ্গলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত, ব্রজভাষা প্রভৃতির রচনা এবং বাঙ্গালার সহিত উহাদের মিশ্রিত রচনা উভয়বিধ রচনাই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে পারসী, উর্দ্দু প্রভৃতির বহুল প্রচার ছিল; কিন্তু রূপনারায়ণের রচনায় পারসী বা উর্দ্দুর মিশ্রণ নাই। ইহার দুই কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, হয়ত—কবি পারসী বা উর্দ্দু জানিতেন না। নয়ত—ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া তিনি যাবনিক শব্দ প্রয়োগ ইচ্ছা করেন নাই।

রূপনারায়ণের সময়ে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, দুর্গামঙ্গলে তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। তৎকালে দেশে বাঙ্গালা কাব্যে বৈষ্ণবকবিদিগের প্রভাব বড় বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহাদের ব্রজভাষার বা ব্রজভাষা মিশ্রিত বাঙ্গালায় রচিত প্রেমবিরহবিষয়ক গীতিকবিতাগুলি বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। সাধারণ ভাষাতেও ব্রজভাষার মিশ্রণ কম ছিল না। দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' স্থলে 'ক', সপ্তমীর 'তে' স্থলে 'ত' ব্যবহৃত হইত। কারক বিশেষে এখন যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন তেমন হয় নাই। কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়ার 'কে' এর পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে সপ্তমীর 'ত' দেখা যায়। তৃতীয়ার 'কর্ত্তৃক' বিভক্তির ব্যবহার ছিলনা, 'কর্ত্তৃক' স্থলে 'তে' ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান কালের 'ইতেছে' প্রভৃতি ক্রিয়া বিভক্তির প্রয়োগ কম। তৎপরিবর্ত্তে সংস্কৃতের অনুরূপ 'করন্তি' 'পারন্তি' প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। সম্ভ্রম বুঝাইতে কোন কোন ক্রিয়াপদে 'আ' যোগ করা হইত। যেমন—করকা (করুন), হরকা (হরুন), 'আশ্রয় করিয়া' স্থলে 'আশ্রাইয়া', আক্রমণ করিল স্থলে 'আক্রাইল'। এইরূপ কৃধাতুর প্রয়োগ ব্যতীত শব্দ বা ধাতু হইতে মুখ্য ক্রিয়ার রচনা দেখা যায়। তৎকালে বাঙ্গালায় বিবিধ ছন্দের ব্যবহার হইয়াছিল। কিন্তু এক পয়ার ব্যতীত অন্য কোন ছন্দের নাম রূপনারায়ণ উল্লেখ করেন নাই। রূপনারায়ণের সময়ে ব্যবহৃত অনেক শব্দ বর্ত্তমানে একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দুর্গামঙ্গলের ভাষার প্রাচীনত্ব

প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল শব্দ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতেই উহা দৃষ্ট হইবে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে আর লিখিত হইল না।

রূপনারায়ণের সময়ে বাঙ্গালা 'অপভাষা' বলিয়া পণ্ডিত সমাজে গণ্য ছিল। এই জন্য গ্রন্থারম্ভে রূপনারায়ণকে বিনয়ের সহিত বলিতে হইয়াছে ;—

"তাহার চরিত্র কিছু কহিতে করি আশা।
দ্বেষ না করিহ ভাই বলি অপভাষা।
চণ্ডাল ভাণ্ডেতে যদি থাকে গঙ্গাজল।
তথাপি পবিত্র বড় জানিহ নিশ্চল॥"

রূপনারায়ণের সময়ের বঙ্গদেশে মঙ্গলাখ্য গীতগুলির খুব প্রচার হইয়াছিল। শিক্ষিত লোকের মধ্যে যাঁহাদের কবিত্ব ও গানশক্তি ছিল, তাহারা দল বাঁধিয়া এই মঙ্গলগীত গাহিতেন। এইকালে শাক্ত বৈষ্ণবের দেষাদ্বেষি খুব ছিল (১), কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের অধিকার শাক্তিগণের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। রূপনারায়ণ শাক্ত ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবকবিগণের কবিত্বপ্রভাব তিনি এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার শাক্তকাব্যে বৈষ্ণবের ভক্তি, বিনয় ও মধুরতা প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

---

(১) এই দেষাদ্বেষি নিবন্ধনই 'দুর্গামঙ্গলে' বৈষ্ণবাবতার চৈতন্যদেবের বন্দনাদি করা হয় নাই।

ছাতনার ইষ্টক-লিপি।

(জ্যৈষ্ঠমাসের অধিবেশনে পঠিত)

ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইষ্টকে খোদিত লিপির সংখ্যা অতি কম। তদ্দ্বারা প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য বাহির করা অতিশয় কঠিন; কিন্তু সুখের বিষয়, আজ যে খোদিত ইষ্টকখানি এই সভাস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে, এই ইষ্টকখানি হইতে কতকটা ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারিবে।

প্রবাদমালা অনেক সময়ে অলীক ঘটনামূলক হইলেও সময়ে সময়ে তাহা হইতেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য জানিতে পারা যায়। বহুদিন হইতে ছাতনায় যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, এই ক্ষুদ্র ইষ্টকলিপি হইতে তাহার ঐতিহাসিকতা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে। এই কারণে এই খোদিত ইষ্টকখানি আমাদের আলোচ্য। যে স্থান হইতে ও যেরূপে ইষ্টকখানি পাওয়া গিয়াছে, অগ্রে তাহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বাঁকুড়া হইতে প্রায় চারিক্রোশ দূরে হাজারীবাগ হইতে সহরঘাটী পর্য্যন্ত যে পুরাতন বড় রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার ধারে ছাতনা গ্রাম অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে একটী বিখ্যাত সামন্তরাজা ছিল।

কোন্ সময়ে এই রাজ্য স্থাপিত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রবাদ আছে যে, প্রথমে এখানে ব্রাহ্মণ-রাজগণই রাজত্ব করিতেন। পরে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবী ব্রাহ্মণ রাজাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং সামন্তগণ রাজা হইবে বলিয়া রাজাকে স্বপ্ন দেন। স্বপ্ন দেখিয়া রাজা অতিশয় চিন্তিত হইলেন; তিনি পাত্রমিত্র ডাকিয়া সামন্তগণকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে প্রায় সকল সামন্তই নির্ম্মূল হইল। এই সামন্তগণ কোন্ জাতীয় ও কিরূপে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় না। সমাজে ইহারা জলাচরণীয় ও নবশাখদিগের ন্যায় সম্মানিত। একই পুরোহিত উভয় জাতির যাজকতা করে। কোন কোন সামন্ত উপবীত পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন, সামন্ত সম্ভবতঃ সামতাল নামেরই রূপান্তর মাত্র। সামতাল অর্থাৎ সাঁওতালগণই ব্রাহ্মণ রাজাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার এবং ক্ষমতাবলে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্রমে লোকে তাহাদের উৎপত্তি ভুলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এই অনুমান কতদূর সত্য, তাহা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিত-দিগের বিবেচ্য বিষয়। ছাতনার বর্ত্তমান সামন্তরাজগণ আপনাদিগকে ছত্রি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন।

কথিত আছে, ব্রাহ্মণরাজ সামন্তদিগের উচ্ছেদ সাধন করিলে ১২ জন সামন্ত জনৈক কুম্ভকারের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া অনেক কষ্টে জীবন রক্ষা করে। তাহারা কুম্ভকারদিগের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করায় রাজার লোকেরা ধরিতে পারে নাই। যাহা

হউক, তাহারা অরণ্যে আশ্রয় লইল এবং প্রতিশোধ লইবার চিন্তা করিতে লাগিল। জঙ্গলেই তাহারা দলপুষ্ট করিতে লাগিল এবং একদিন অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া বলিল, 'আজি আমাদের সঙ্গে যে যে ভোজন করিবে, সেই আমাদের জাতিভুক্ত হইবে।' বলা বাহুল্য, এই সুযোগে অনেক নীচজাতি সামন্তদিগের সহিত মিশিয়া যায়। কেবল একজন সামন্ত সেই ছত্রিশ জাতির সহিত আহার করিতে আপত্তি করিয়া দূরে এক পাথরে বসিয়া আহার করিতে লাগিল। এইজন্ত সকলেই তাহাকে সমাজচ্যুত করিল। সে 'পাথর কাটা' সামন্ত নামে খ্যাত হইল। আজও তাহার বংশীয়েরা 'পাথরকাটা সামন্ত' বলিয়া পরিচিত। সামন্ত-সমাজে ইহারা মর্য্যাদায় হীন। যাহা হউক, এক দিন সামন্তগণ অতিশয় ক্ষুৎপিপাসা পীড়িত হইয়া জঙ্গলে বেড়াইতেছিল, এমন সময়ে বাশুলীদেবী বৃদ্ধা অরতীবেশে কেঁদ লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহারা কেঁদ চাহিলে তিনি সকলকে দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধার ঝুড়ি হইতে কেঁদ কাড়িয়া লইল। তখন বাশুলী পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই ১২টী টাঙ্গি (পরশু) ও খাঁড়া গ্রহণ কর, অমুক দিনে তোমরা ছদ্মবেশে রাজ-বাটী প্রবেশ করিবে। ঐ দিবস উৎসবে রাজা বাহিরে আসিবে। যখন ঢাকের বাজনায় নির্দ্দিষ্ট বোল বাজিতে থাকিবে, তখন তোমরা প্রকাশ্যে রাজাকে আক্রমণ করিবে। যুদ্ধে তোমাদের জয় হইবে, কিন্তু তোমরা আমার কেঁদ কাড়িয়া লইয়াছ, সুতরাং প্রথম রণে একজন কাটা পড়িবে।' তদনুসারে ১২ জন সামন্ত অনুচর সমভিব্যাহারে উৎসব দেখিবার ছলে গুপ্তভাবে রাজবাটীতে প্রবেশ করিল। রাজা দেবদর্শনে বাহিরে আসিলেন। এ দিকে ঢাকে সহসা সঙ্কেত বোল বাজিয়া উঠিল,

"ভে ভেং ভে ভেং আশমলা। মারবি পারবি এই বেলা॥"

১২ জন সামন্ত তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাশুলীপ্রদত্ত তীক্ষ্ণধার টাঙ্গি ও খাঁড়া বাহির করিয়া হুঙ্কার রবে রাজাকে আক্রমণ করিল। বাশুলীর কথামত একজন সামন্ত হত হইলে অবশিষ্ট ১১ জন রাজাকে কাটিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিল। এইরূপে সামন্তগণ কুলক্ষয়ের প্রতিশোধ লইয়া রাজ্যাধিকার করিল। প্রবাদ, এখন যেখানে রাজবাড়ী তাহার ঈশানকোণে ছাতনার পশ্চিমে ব্রাহ্মণ-রাজাদিগের রাজপ্রাসাদ ছিল। দুই এক-খানি ইষ্টক ও ভাস্করকার্য্য সমন্বিত প্রস্তর আজও তথায় পাওয়া যায়। লোকে বলে, তথায় রাজারা যে সকল লোককে কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা এখনও তথায় কবন্ধ হইয়া আছে, মধ্যে মধ্যে ভয় দেখাইবার জন্য মানবের সমক্ষে উপস্থিত হয়। অশোকবনে ঐ স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণীর অগ্রভাগে তামার এক প্রকাণ্ড কটাহে পারদ-তৈল রক্ষিত ছিল। ঐ কটাহের উপর তামার ঢাকনিতে ব্রাহ্মণ-রাজাদিগের বিবরণ লিখিত ছিল। কিন্তু ঐ কটাহ বা উহার ঢাকনি কে রাখিয়াছে, জানিবার উপায় নাই।

১১ জনেই রাজ্যাধিকার করিয়াছে, সুতরাং কে রাজা হইবে, তাহা লইয়া গোলযোগ

হইল। প্রতিদিন এক একজন রাজা হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল, পরে সকলেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একদিন পরামর্শ করিল যে, কল্য প্রাতে উঠিয়া অগ্রে যাহাকে দেখিব, তাহাকেই রাজা করিব। এ দিকে বিধাতার নির্বন্ধক্রমে ঠিক ঐ দিন দুইটি রাজপুত্রবালক জগন্নাথদর্শনে যাইতে যাইতে সম্বলহীন হইয়া ছাতনায় উপস্থিত হইল এবং রাজাদিগের দানশীলতার পরিচয় পাইয়া অতি প্রত্যূষেই ভিক্ষা করিবার জন্য রাজ-ভবনে প্রবেশ করিল। সেই সময় সামন্তগণ কাহাকে রাজা করিবে? এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। এমন সময় তাহাদের সম্মুখে দুইটী সর্ব্বসুলক্ষণ কুসুম-সুকুমার বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকদ্বয় আসিয়াই তাহাদিগকে অভিবাদন করিল। তাহাদের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "মহারাজ আমরা জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি, পথে নিঃস্ব হইয়া আপনাদের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" সামন্তগণ বলিলেন, "আমাদের ভিক্ষা দিবার কিছুই নাই,—রাজ্য, ধন, জন, যান, বাহনাদি যাহা কিছু সকলই আপনাদের হইয়াছে, আমরা আপনাদের আজ্ঞাবহ দাসমাত্র। এক্ষণে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে ও প্রজামণ্ডলীকে পালন করেন।" এই বলিয়া তাহারা সেই বালক দুইটীকে রাজোচিত অভিবাদন করিল। উভয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠই সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বালকদ্বয় এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যলাভে তথায় রাজা হইয়া পরাক্রান্ত সামন্তগণের সাহায্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই দুই জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হাম্বীর রায় ও কনিষ্ঠের নাম উত্তর রায়। বর্ত্তমান রাজবংশীয়েরা এই হাম্বীর ও উত্তরের বংশধর। উত্তররায় বাশুলী দেবীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, উহার ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। ভগ্নমন্দিরের প্রাচীর ও প্রধান দেবালয় ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল। ঐ সকল ইষ্টকের অধিকাংশই লিপিযুক্ত। আমরা ঐ দেবালয়ে দুই প্রকার (এক প্রকার উচ্চ অক্ষরে ও একপ্রকার গভীর অক্ষরে) খোদিত ইষ্টক-লিপি দেখিয়াছি। উচ্চ অক্ষরে খোদিত ইটকে লেখা আছে—"শ্রীং ছাতনানিগরেশ শ্রীং উত্তররায় সক ১৪৭৫"। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সর্ আলেক্জান্দার কনিংহাম্ পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি এই স্থান সম্বন্ধে তাঁহার আর্কিওলজিক্যাল সর্ভে রিপোর্টে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

"About fourteen miles from Bankura on the old grand Trunk Road through Hazaribagh to Shaharghati at the village of Chatna are some ruins ; the principal consists of some temples and ruins within a brick enclosure, the enclosure and brick temples that existed having long become mere mounds, while the laterite temples still stand ; the bricks used are mostly inscribed, and the inscription gives a name which I read as Konaha Utara Raja, while the pandits read it as Hamira Utara Raja ; the date at the end is the same in all, *viz* sake 1475." (Arch. Sur. Rept. VIII. p. 199.)

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ বাঁকুড়া হইতে ছাতনার দূরত্ব ১৪ মাইল লিখিয়াছেন, উহা প্রকৃত পক্ষে ৮ মাইল হইবে। তিনি ও তাঁহার পণ্ডিত ইষ্টকলিপি হইতে 'কোনহ উত্তর রাজা' বা 'হমীর উত্তর রাজা' পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্রবাদ অনুসারে উত্তররায় মন্দির করিয়াছিলেন এবং ঐ মন্দিরের ইষ্টক সমূহে "শ্রী২ ছাতনানগরেস শ্রী২ উত্তররায় সকে ১৪৭৫" লিখিত হইয়াছে। আমরা সেই প্রাচীন ভগ্নমন্দির হইতে যে ইষ্টকখানি * সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই অদ্যকার সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে।

ইহাতে দেখিতে পাইবেন, "শ্রী২ ছাতনানগরেন † শ্রী২ উত্তররায় সক ‡ ১৪৭৫" খোদিত আছে।

পূর্ব্ববর্ণিত প্রবাদবাক্য সমস্ত প্রকৃত হউক বা না হউক, কিন্তু উত্তররায় নামে যে একজন রাজা ছাতনায় রাজত্ব করিতেন, তাহা এই সামান্য ইষ্টক-লিপিই কতকটা সমর্থন করিতেছে এবং পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সকল সময়ে প্রকৃত পাঠ প্রকাশ করেন না, এ বিষয়েও আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছে।

যেখান হইতে এই ইষ্টকখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহার আরও একটু পরিচয় দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

গভীরাক্ষরে লিখিত ইষ্টক আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ ইষ্টকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইবে। আমরা ইহার একখানিও ইট গোটা পাই নাই। সুতরাং ইহার লেখা পড়া অসম্ভব। সেই প্রাচীন মন্দিরের সদর দরজা ও পশ্চিমের একটা প্রস্তর-

---

* ইষ্টক-লিপির প্রতিকৃতি উপরে দেওয়া গেল। † নগরেশ। ‡ শক।

মণ্ডপ আজও দণ্ডায়মান আছে। এই মন্দির বর্ত্তমান রাজপথের ঠিক উত্তরে অবস্থিত। এখন বাশুলী দেবী ঐ মন্দিরে নাই। প্রবাদ আছে, ইংরাজেরা এদেশ জয় করিলে মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া গোরা পল্টন যাতায়াত করিতে লাগিল। বাশুলীদেবী তাহাতে রাজাকে স্বপ্ন দিলেন, "ফিরিঙ্গীর পায়ের ধূলা উড়িয়া আমার গায়ে লাগে, আমাকে তুমি অন্য স্থানে লইয়া যাও।" তদনুসারে বিবেকানন্দ নৃপতি ১৬৫৫ শকে রাজবাটীর অভ্যন্তরে প্রস্তর নির্ম্মিত এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা ঐ মন্দিরের খোদিত লিপিতে লিখিত আছে;—

"ব্রহ্মাশেষসুরেশবন্দ্যচরণশ্রীবাশুলীপ্রীতয়ে
শর্ব্বাস্যস্মরশায়কর্ত্তুশশভৃৎসংখ্যে শকাব্দে শুভে।
সামন্তান্বয়সাগরেন্দুররুবদন্তীশজিৎ কেশরী
ভূভৃন্নদয়ো বিবেক নৃপতিঃ সৌধং দদৌ দার্শদং ॥"

ব্রহ্মা, অনন্ত ও ইন্দ্রের চরণবন্দনাপূর্ব্বক শ্রীবাশুলী দেবীর প্রীতির জন্য শুভ মহাদেবের মুখ (৫), মদনের বাণ (৫), ঋতু (৬) ও চন্দ্র (১)-সংখ্যক শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬৫৫ শকে) সামন্তবংশার্ণবসম্ভূত চন্দ্রস্বরূপ রাজহস্তী-জয়কারী সিংহস্বরূপ ভূপতিগণের প্রধান বিবেক নামক নৃপতি (এই) প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির দান করিয়াছিলেন।

ঐ মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে। স্থানে স্থানে কাটিয়া গিয়াছে এবং দুই একখানি প্রস্তর খসিয়া পড়িতেছে। মন্দিরের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে।

প্রবাদ এইরূপ, বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস ঐ বাশুলীর উপাসক ছিলেন এবং প্রাচীন মন্দিরের নিকট বাস করিতেন। তাহার পর ১২৭৯ সালে বর্ত্তমান বাশুলী মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহাতেই এখন বাশুলী দেবী আছেন।

উক্ত মন্দিরাদি ভিন্ন ছাতনায় আরও কএকটী অতি প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আছে। ছাতনার মধ্যস্থানে কামারপাড়ার পূর্ব্বে রাস্তার উত্তরে অনতিদূরে তিনটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটী মূর্ত্তি প্রায় ৪ ফিট উচ্চ, উহার এক হস্তে শঙ্খ ও অপর হস্তে দণ্ড বিদ্যমান। আর একখানি পাথরে একটী ধনুষ্পাণি ও নিকটে একটী শিশু মূর্ত্তি আছে।

এই সামন্তরাজ্যের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক পুরাতত্ত্ব বাহির হইতে পারে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

কবি উদ্ধবানন্দের "রাধিকামঙ্গল" ও তাহার সমালোচক।

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য-জগতে বিশেষ পরিচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অবৈতনিক ও বৈতনিক সহকারী সম্পাদক পদে থাকিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। তিনি বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নসহকারে যে ১৬ খানি বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরঋণে আবদ্ধ থাকিব। তাঁহার সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে কবি উদ্ধবানন্দের "রাধিকামঙ্গল" একখানি। গত কার্ত্তিকমাসের পরিষদে এই সম্বন্ধে একটী সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। পুঁথিখানির পত্র-সংখ্যা ছয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি অবলম্বন করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় যে বিস্তৃত সমালোচনাটী লিখিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহার গভীর যুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনার সকল কথা আমরা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। সেইগুলি একে একে বলিতেছি।

বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সমালোচনায় প্রথমে এই কয়েকটী বিষয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—১ উদ্ধবানন্দ কোন্ সময়ের লোক? ২ তাঁহার বাড়ী কোথায়? ৩ তিনি কোন্ জাতি? এখানে বলা আবশ্যক যে, উদ্ধবানন্দের "রাধিকামঙ্গলে" এ সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু নাই।

১। যে সকল পুঁথিখানি সমালোচক মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে, তাহা ১২৩৯ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ শনিবার বেলা চারি দণ্ডের সময় সমাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রতিলিপিখানির বয়ঃক্রম এখন ৭০ বৎসর। ইহা হইতে বিদ্যানিধি মহাশয় স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন যে, উদ্ধবানন্দ এই সময়ের "বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী"। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না যে, কবি উক্ত সময়ের বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী কি করিয়া হইলেন। ইহা কি সম্ভবপর নহে যে কবি ২৫।৩০ বৎসর বয়সে "রাধিকামঙ্গল" প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং পুঁথি প্রণয়নের পরই সমালোচক মহাশয়ের প্রাপ্ত প্রতিলিপিখানি নকল করা হইয়াছিল?

কিন্তু সমালোচক মহাশয় এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ দেখাইতেছেন। নানা কারণে তাঁহার বোধ হইয়াছে, কবি ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বতন লোক। এই "নানা কারণের" মধ্যে একটি মাত্র কারণ তিনি জগতে প্রচার করিয়াছেন। সে কারণটী এই;—"কবির রচনায় ইংরেজ আমলের কোন তত্ত্ব, কোন পদার্থ, কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের নিদর্শন মাত্রও নাই।" আমরা সমালোচক মহাশয়ের এ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কাহারও গ্রন্থে যদি কোন সময়ের কোন তত্ত্ব, কি পদার্থ, কি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত না থাকে, তবে সেই লেখক যে, সে সময়ের লোক হইতে পারেন না, এ যুক্তি আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

তাহার পর, শ্রীমতী রাধিকার জন্মবৃত্তান্তের মধ্যে ইংরেজ-আমলের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভৃতি লেখার প্রয়োজনীয়তাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

তৎপরে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন যে, "কোন্ অব্দে তাঁহার আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব, আর কখনই বা তাঁহার তিরোভাব হইয়াছিল, তাহার যুক্তিসঙ্গত কোন মীমাংসায় সমুপনীত হওয়া অসম্ভব। সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতারই একটা না একটা প্রতীকার আছে। অতএব এতৎ সম্পর্কেও হতাশ হওয়া সমীচীন নয়। দেখা যাউক কিসে কি হয়। আশ্বস্ত হইবার একটু স্থল আছে।" আমরা কিন্তু আশ্বস্ত হইবার স্থল কিছুই তাঁহার সমালোচনার মধ্যে খুঁজিয়া পাইলাম না। বোধ হয়, বিদ্যানিধি মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

২। কবির বাসস্থান।—এ সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় অতি অদ্ভুত যুক্তির দ্বারা অদ্ভুত মীমাংসায় সমুপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ পুঁথি হইতে একটী চরণ তুলিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, কবি কর্ত্তৃকারককে "প্রথম পুরুষ", কিন্তু উহার ক্রিয়াপদে "উত্তম পুরুষ" ব্যবহার করিয়াছেন। এখন উৎকল দেশে কর্ত্তা ও ক্রিয়া প্রয়োগের ঐরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। সুতরাং সমালোচক মহাশয় সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উদ্ধবানন্দ উৎকলবাসী ছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, এই অনুমান অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। কারণ, "বাঙ্গালার প্রাচীন গদ্যলেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উড়িয়া ছিলেন, আর তিনি ব্রাহ্মণ।" তিনি আরও একটী অকাট্য প্রমাণ বা নিদর্শন পাইয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার বৈতল-উত্তরবাড় গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ সিত্রজ মহাশয় তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, সিত্রজ মহাশয়দিগের প্রদেশে "সারল বিরাট" বা "বৃহৎ বিরাট" নামে এক বাঙ্গালা পদ্য-পুস্তক আছে। তাহার প্রণেতা আপনাকে "উৎকল ব্রাহ্মণ" বলিয়া স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইহারা দুই জনে যখন উৎকলবাসী, তখন সমালোচক মহাশয়ের মতে উদ্ধবানন্দ উড়িষ্যার লোক না হইবেন কেন? সমালোচক মহাশয় যে যুক্তির দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরাও সেই যুক্তির দ্বারা কি বলিতে পারি না যে উদ্ধবানন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন? বিদ্যানিধি মহাশয়ের বোধ হয় উদ্ধবানন্দের জাতি নির্দ্দেশ করিবার সময় ঐ কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিস্মৃত হইয়াছেন।

এখানে সমালোচক মহাশয়ের নিকট আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তিনি কি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন যে, এক উৎকল দেশ ভিন্ন আর কোথাও এরূপ কর্ত্তা ও ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই? আমরা কিন্তু অনেক বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির পদে কর্ত্তা ও ক্রিয়ার এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাই। সমালোচক মহাশয় কি তাঁহাদের সকলকেই উৎকলবাসী বলেন?

৩। জাতি-নিরূপণ।—সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন যে, অন্যান্য কবির ন্যায় উদ্ধবানন্দ স্বীয় গ্রন্থে আপনাকে "দ্বিজ" বা "দাস" বলিয়া বিশেষিত করেন নাই। সুতরাং

কবি "ব্রাহ্মণ" কি "ব্রাহ্মণেতর বর্ণ" তাহা সাব্যস্ত করা সমালোচক মহাশয়ের পক্ষে কিছু কঠিন হইয়া পড়িল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কবিতার ভণিতায় আপনাদিগকে "দাস" বলিয়া লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস, জ্ঞানদাস, পরমানন্দদাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তাহার পর বিদ্যানিধি মহাশয় বলিতেছেন যে, উপাধি দেখিতে পাইলেও কবির জাতি নিরূপণ করা যাইত। তিনি কি কৌশলবলে ইহা নিরূপণ করিতেন, তাহার একটী উদাহরণও দিয়াছেন। যেমন, এই পুঁথি-পাঠকের নাম "শ্রীমধুসূদন আশ।" এই "আশ" উপাধি দেখিয়া সমালোচক মহাশয় পুঁথি-পাঠকের জাতি নির্ণয় করিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তন্তুবায়, সুতরাং বস্ত্র-বয়ন তাহার জাতি-বৃত্তি। কিন্তু তন্তুবায় ভিন্ন অন্য জাতিরও "আশ" উপাধি আছে, তাহা বোধ হয় সমালোচক জ্ঞাত নহেন। এই প্রসঙ্গে, তিনি পুঁথি-পাঠকের বাসস্থান কোন্ জেলায় তাহাও সুন্দররূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পুঁথিতে লেখা আছে যে পুঁথি-পাঠকের বাসস্থান "শ্যামপুর গ্রাম"। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের পর তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্যামপুর বাঁকুড়া জেলায়। এই "কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান"টী যে কি, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। তবে তাঁহার অবলম্বিত পুঁথিখানিও বাঁকুড়া জেলা হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং তাঁহার মতে, শ্যামপুর যে বাঁকুড়া জেলান্তর্গত, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না। কি সুন্দর যুক্তি!

এইত গেল কবির কথা। তাহার পর সমালোচক মহাশয় কাব্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুঁথির সমালোচনা এই কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(ক) পুঁথির নামকরণ; (খ) ঐতিহাসিক তত্ত্ব; (গ) ভাষা; (ঘ) ছন্দ; (ঙ) কাব্যের মিলন; (চ) ব্যাকরণ দোষ; (ছ) কবির কল্পনাশক্তি।

(ক) পুঁথির নামকরণ।—উদ্ধবানন্দ তাঁহার পুঁথির নাম কেন "রাধিকামঙ্গল" রাখিলেন, তৎসম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "পূর্ব্বাচার্য্য চৈতন্যমঙ্গলকার লোচনদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ, উদ্ধবানন্দের পক্ষে শ্রেয়স্কর ও মনঃপূত কার্য্য বিবেচিত হইয়াছিল। তাই তিনি "রাধিকামঙ্গল" নাম দিয়া অভীষ্ট দেবতার মহিমা-কীর্ত্তন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।" এ বেশ কথা। কিন্তু এখানে একটী রহস্যের কথা বলিব। বিদ্যানিধি মহাশয় পরিষদের সভায় যখন এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন, তখন সেখানে অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়ের উক্ত কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, "বিদ্যানিধি মহাশয় যে লোচনদাসের প্রণীত চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে তাহা ঠিক নয়। চৈতন্যমঙ্গল বৃন্দাবন দাসের প্রণীত, কিন্তু লোচনদাসের প্রণীত নহে।" গোস্বামী মহাশয়ের উল্লিখিত কথাগুলির মধ্যে একটু রহস্য আছে। ইনি প্রভু নিত্যানন্দের সন্তান। প্রভু নিত্যানন্দের সহিত ঠাকুর নরহরির বরাবরই একটু খটমট চলিত। এমন কি, প্রভু নিত্যানন্দের

কিন্তু বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে পারতপক্ষে ঠাকুর নরহরির নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। নরহরি ঠাকুর মহাপ্রভুকে চামর ব্যজন করিতেন। বৃন্দাবনদাস সেই ঘটনা বর্ণনাস্থলে নরহরির নাম উল্লেখ না করিয়া, লিখিলেন, "কোন কোন ভাগ্যবান চামর ঢুলায়।" বৃন্দাবনদাস প্রভু নিত্যানন্দের আদেশক্রমে এই লীলাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং ইহার নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখেন। এই গ্রন্থের কথা শুনিয়া ঠাকুর নরহরি উহা দেখিবার জন্য বৃন্দাবনদাসের বাড়ীতে গমন করেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, গ্রন্থখানি তাঁহার দেখা ঘটে নাই। তিনি ইহাতে বিশেষ ক্ষুন্ন হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন, এবং তাঁহার প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ত্রিলোচনদাসকে মহাপ্রভুর মধুর লীলাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিতে অনুমতি দেন। ত্রিলোচন বা লোচনদাসও তাঁহার গ্রন্থের নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখেন। তিনি বোধ হয় তখন জানিতে পারিয়াছিলেন না যে, বৃন্দাবনদাসও তাঁহার গ্রন্থের নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখিয়াছেন। যাহাহউক, দুই গ্রন্থের এক নাম হইতে পারে না। শেষে বৃন্দাবনদাসের মাতা শ্রীমতী নারায়ণী ঠাকুরাণী মধ্যস্থা হইয়া এই নাম-করণের বিবাদ মিটাইয়া দেন। তিনি লোচনদাসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন, এবং উহারই নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখিতে অনুমতি দেন। আর, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম "চৈতন্য ভাগবত" রাখিতে বলেন। এখন, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় প্রভু নিত্যানন্দের সন্তান। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি লোচনদাসের "চৈতন্য-মঙ্গল" বলিয়া যে একখানি গ্রন্থ আছে, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। যখন এ কথা উত্থাপন করিলাম, তখন এ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াই উহার প্রতিলিপি বৃন্দাবনের গোস্বামীপাদদিগের অনুমোদনার্থে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ইহা পাঠ করিবার পর তাঁহার "চৈতন্য-চরিতামৃত" প্রণয়ন করেন। তখন ইহার নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" ছিল, এবং তখন লোচনদাসের "চৈতন্য-মঙ্গল" লিখিত হইলেও বৃন্দাবনে প্রেরিত হয় নাই। সুতরাং কবিরাজ ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্য-মঙ্গল" অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

(খ) ঐতিহাসিক তত্ত্ব।—"রাধিকা-মঙ্গল" হইতে সমালোচক মহাশয় যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিষ্কাশিত করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন। যথা, "ঘুঙ্গুর", "সোণার ঝাঁপা", "ঝুরি", "গরল-শঙ্খ", "নূপুর" ও "সোণার চুড়ি"। তিনি যে এই সমুদায় অতি আবশ্যকীয় "ঐতিহাসিক তত্ত্ব" নিষ্কাশিত করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে প্রকৃতই "বিস্মিত ও পুলকিত" হইবারই কথা। তবে এইখানে আমরা একটী কথা বলিতে চাহি। যখন রাধিকামঙ্গলের মধ্যে ইংরেজ আমলের "ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও পদার্থ"—সোণার চুড়ি আছে, তখন তিনি "ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বতন লোক" কি করিয়া হইলেন?

(গ) ভাষা।—বিদ্যানিধি মহাশয় বলিতেছেন, "সরল ভাষায় কবি যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট বাহাদুরী।" যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে ক্রমে সংস্কৃত-বাঙ্গালা বা অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জ্জিত সংস্কৃত ভাষা করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উহা "যথেষ্ট বাহাদুরী," সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাঁহার বৈষ্ণব-কবিদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করা অভ্যাস থাকিত, তাহা হইলে উদ্ধবানন্দের সরলভাষা দেখিয়া তিনি এত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না।

(ঘ) ছন্দ।—সমালোচক মহাশয় এই পুঁথি হইতে একটী নূতন ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন। ছন্দটীর নামকরণ এখনও হয় নাই। এই ছন্দের মিলন তিন চরণে। যথা—

"শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ ভজ এক মনে।
শ্রীরাধিকার জন্মকথা শুন সাবধানে।
সূর্য্য আরাধন করে অপত্য কারণে॥"

আমাদের কিন্তু বোধ হয় লিপিকার নকল করিবার সময় তৃতীয় চরণটী ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে, "সূর্য্য আরাধন করে" ইহার কর্ত্তা কে? বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার নূতন ছন্দের আরও দুইটী উদাহরণ দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, লিপিকরের ভুলে উহাদেরও এক একটী চরণ পড়িয়া গিয়াছে।

তাহার পর সমালোচক মহাশয় ছন্দের দোষ ধরিয়াছেন, কারণ পুঁথির সকল পদে তিনি অক্ষরের সমতা পান নাই। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা—

"বৈদ্য বলে বায়ুদোষ ছাঁকিয়াছে তাঁরে।
ভাগ্যবলে আজি আমি আইলাম তোমার ঘরে॥"

বিদ্যানিধি মহাশয় এই কবিতার প্রথম চরণটী গণিয়া সচরাচর প্রচলিত নিয়মানুযায়ী চৌদ্দ অক্ষর পাইয়াছেন। কিন্তু শেষ চরণে দেখেন সতেরটী অক্ষর। এখন এই ভ্রম-প্রমাদ কবির নিজের ত্রুটিতে, কি লিপিকরের অনবধানতায় ঘটিয়াছে, সমালোচক মহাশয় তাহারই বিচার করিতে বসিলেন। বিচারে গরীব লিপিকরই দোষী সাব্যস্ত হইলেন। তাহার পর বিচারক মহাশয় শেষ চরণটী সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রথমতঃ "আমি" শব্দ বিলুপ্ত করিয়া দেখেন ছন্দঃপাত ঘটে না। অধিকন্তু উহাতে না ব্যাকরণ দোষ, আর না অর্থ হানি, কিছুই হয় না। কিন্তু তাহাতেও দেখেন, এক বর্ণের আধিক্য থাকিয়া যাইতেছে। তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিতে ত্রুটী করেন নাই। "তোমার ঘরে" পরিবর্ত্তে "তোমা ঘরে" ধরিয়া লইয়া দেখেন, সকল দিক বজায় থাকে। অর্থাৎ একমাত্র "র" বর্জ্জিত হইলে, তাঁহার আপদের শান্তি হয়। এখন সমালোচক মহাশয়ের সংশোধিত চরণ দুটী কিরূপ হইল দেখা যাউক:—

"বৈদ্য বলে বায়ুদোষ ছোঁকিয়াছে তাঁরে।
ভাগ্যবলে আজি আইলাম তোমা ঘরে॥"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কবি উদ্ধবানন্দ ইংরেজ আমলের সুশিক্ষিত পণ্ডিত নহেন, তাই তিনি হালের কবিদিগের ন্যায় প্রতি চরণে চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া ছন্দদোষ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু বলিতে কি, এই সংশোধিত চরণ অপেক্ষা কবির নিজ চরণটী আমাদের নিকট অধিক মিষ্ট বোধ হইতেছে।

কিন্তু একটী মাত্র ত্রুটী ধর্তব্য নয়। বারংবার এরূপ ত্রুটী অমার্জ্জনীয়। কবি আবার এই দোষে দুষিত হইয়াছেন। যথা—

"যাহারে ভাবিছ তুমি, গোলোক ছাড়ি আইলাম আমি,
একবার দরশন দাও।"

"গোলোক ছাড়ি আইলাম আমি" এই অংশে এগারটী অক্ষর আছে। সমালোচক মহাশয় ইহাও কমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে "আইলাম" স্থলে "এলাম" করিলেন, কিন্তু দেখেন, তথাপি দুই বর্ণের আধিক্য থাকিয়া যাইতেছে। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া "গোলোক ছাড়ি আইলাম আমি" স্থলে "গোলোকের হরি আমি" বসাইতে বাসনা করিলেন। কিন্তু তাহাতে অর্থের একটু গোলমাল হয় দেখিয়া, একরূপ হতাশ হইয়া বলিতে বাধ্য হইলেন যে, "এমন স্থলে কাহারও করস্পর্শ ঘটিলে মূলবস্তু সংস্কৃত বা মার্জ্জিত হয় না, কিন্তু দুষিত ও বিষাক্ত হয়।" আমরাও বলি কবির লেখার উপর হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হয়।

(ঙ) কাব্যের মিলন।—সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "গ্রন্থে হীন-মিলনের অভাব নাই।" প্রাচীন-বাঙ্গালা-কবিদিগের পদে এইরূপ হীন মিলনের ছড়াছড়ি। কিন্তু তাহাতে কবিতার মিষ্টতা কিঞ্চিন্মাত্র লাঘব হয় নাই। ফল কথা, প্রাচীন কবিগণ অক্ষর মিল করিয়া কবিতা লিখিতেন না। তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, সুতরাং কবিতা লেখা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না, উহা আপনাআপনি তাঁহাদের ভাবপূর্ণ হৃদয় হইতে বাহির হইত।

(চ) ব্যাকরণ-দোষ।—বিদ্যানিধি মহাশয় পুঁথিতে অনেক ব্যাকরণের দোষ দেখাইয়াছেন। যেমন, বিশেষ্য শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত, স্ত্রীলিঙ্গের পরিবর্ত্তে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ, প্রথম পুরুষের স্থানে উত্তম পুরুষ প্রযুক্ত ইত্যাদি।

কিন্তু এ দোষ উদ্ধবানন্দের নহে, তিনি যাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, সেই সে কালের কবিগণের দোষ।

কোন ভক্ত যখন মন প্রাণ খুলিয়া শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার স্বর, তাল, মানের দিকে দৃষ্টি থাকেনা ও থাকিতে পারেনা। সেইরূপ কবি যখন হৃদয়ের আবেগের সহিত কবিতা লেখেন, তখন তাঁহার কাব্যের অক্ষর মিল কি ব্যাকরণ দোষের দিকে বড় দৃষ্টি থাকেনা। তাই প্রাচীন কবিদিগের পদে এই সকল দোষের এত প্রাচুর্য্য। কিন্তু তাহাতে কবিতার মিষ্টতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

(ছ) কবির কল্পনা-শক্তি।—সমালোচক মহাশয় উদ্ধবানন্দের কল্পনা-শক্তি দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। তিনি চিরকাল শুষ্ক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং উদ্ধবানন্দের কল্পনা-শক্তি তাঁহার নিকট চিত্ত-চমৎকারিণী হইবারই কথা। যে সমস্ত বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতার সামান্য আভাস লইয়া উদ্ধবানন্দ তাঁহার "রাধিকা-মঙ্গল" লিখিয়াছেন, আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়কে সেগুলি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, "রাধিকার দশ নখ দশ ইন্দু" প্রভৃতি তাঁহাদের লেখার মধ্যে ছড়াছড়ি। এ বর্ণনা উদ্ধবানন্দের নূতন নহে, এবং ইহাতে তাঁহার "বিশেষ প্রশংসা যোগ্য"ও কিছু নাই।

যাহা হউক পুঁথিখানি সংশোধন করিতে সমালোচক মহাশয় অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছেন। বিশেষতঃ লিপিকরের প্রমাদে তাঁহার বিলক্ষণ দায়ে ঠেকিতে হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, তিনি উহা কিরূপে সংশোধন করিয়াছেন।

সমালোচক মহাশয় পুঁথির একস্থানে পাইয়াছেন, "গলিত কাঞ্চন জিনি, রাত্রবরণ খানি।" তিনি এই অংশ সংশোধন করিয়া করিলেন, "কষিত কাঞ্চন জিনি, গাত্রাবরণ খানি।" এইটী পড়িয়া আমাদের বোধ হইতেছে যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের হস্তলিখিত পুঁথি পাঠ করা অভ্যাস নাই এবং সেই জন্যই তিনি সম্ভবতঃ অবগত নহেন যে, প্রাচীন লেখকগণ "ল" ও "ধ" একই প্রকার লিখিতেন। সুতরাং এখানে "গলিত" শব্দটী "কষিত" না হইয়া "গধিত" হইবে। আর, "রাত্রবরণ" স্থানে "গাত্রাবরণ" না লিখিয়া "গাত্রের বরণ" কি "গাত্র-বরণ" হইলেই ভাল হয়।

এখন, তিনি "রাধিকামঙ্গল" পুঁথিখানি কিরূপ সংশোধন করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী উদাহরণ দিয়া আমরা প্রবন্ধটী শেষ করিব। যথা,—

"এই মত ক্রমে দশ মাস পরবেশে।
আনন্দ বাড়িল বড় রাজার আবেশে॥
শুক্ল অষ্টমী তিথি ভাদ্র-গত মাসে।
অবতার কৈল রাই রাজার আবেশে॥"

দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের "আবেশে" কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না, বোধ হয় "আবাসে" হইবে॥

"নিষ্কলঙ্ক সোনার চাঁদ উদয় হইল।
এতদিনে গগনে চান্দের গৌরব টুটিল॥"

"গগনে চান্দের" স্থলে "গগন-চান্দের" হইলেই বোধ হয় ভাল হয়।

"নাম মোর বসুমতী ভাগ্য করি মানি।
রাই-পদ লাগে যেন কাঁচা ননি॥"

শেষ চরণে "কাঁচা ননি"র পূর্ব্বে বোধ হয় একটী কথা পড়িয়া গিয়াছে।

"লাখবান হেন বাণি রাখে বক্ষঃস্থলে।"

"হেন বাণি" অর্থ কি ? বোধ হয় "লাখবান হেম মণি" হইবে।

"বাহির উজানে রাজা রহে হেট মাথে।"

এখানে "উজানে" অর্থ অবগত করিতে পারিলাম না। "উঠানে" হইলে কিন্তু মানে হয়।

"রাজারে বিরস দেখি কহে নারদ মুনি।
আজিও কেন দেখিতে তোমার হরষিত বাণী॥"

শেষ চরণ হইতে বোধ হয় একটী "না" পড়িয়া গিয়াছে।

"নারদ আসিয়া ডাকে শির মগ্ন হইয়া থাকে—
চিত্রপটে আকার না নড়ে।"

আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন অর্থ করিতে পারিলাম না। চরণত্রয় এইরূপ হইলে কি অর্থ হয় না ?

"নারদ আসিয়া ডাকে, শির মগ্ন হৈয়া থাকে,
চিত্রপট আকার না নড়ে।"

"অমৃত পাইয়া মুনি, বিচার করিল শুনি,
এই শিশু কৃষ্ণপ্রিয়া হব।"

এখানে "অমৃত" স্থানে "নন্দিত" এবং "শুনি" স্থানে "পুনি" অর্থাৎ পুনঃ হইলে ভাল হয় না কি ?

"ধূপ দীপ মাল্য গন্ধ পুষ্প মাল্য চন্দন।"

বোধ হয় এখানে একটী "মাল্য" অতিরিক্ত হইয়াছে।

"বৃকভানুপুরের লোক ডেকে ডেকে বলে।
গগন ছেড্যা চাঁদ কিবা ভূমি চলি ভূলে॥"

"ভূলে" স্থানে বোধ হয় "বুলে" হইবে।

ক্রমে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইতেছে, সুতরাং এখানেই সমাপ্ত করিলাম। ফল, "রাধিকামঙ্গল" পুঁথি, যাহা কার্ত্তিকের সাহিত্য-পরিষদে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এত ভুলে পরিপূর্ণ যে অনেক স্থলে অর্থ করা কঠিন। যাঁহাদের হস্তলিখিত পুঁথি পাঠ করা অভ্যাস আছে, পত্রিকায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের কাহাকে দেখাইয়া লইলেই ভাল হইত।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

বঙ্গীয় সংবাদপত্র।

ইতিপূর্ব্বে আমরা সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় বাঙ্গালা সাময়িক-পত্রের তালিকা প্রকাশ করিয়াছি। অদ্য সংবাদপত্রের তালিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের এই সমস্ত তালিকা যে ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য নহে, তাহা আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি। কিন্তু ক্রমে এরূপ তালিকা সঙ্কলিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহের পথ পরিষ্কৃত হইবে বলিয়াই আমরা এই বহ্বায়াসসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকগণ আমাদিগের উদ্দেশ্যের সাধুতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ত্রুটিজনিত অপরাধ হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন এবং সাময়িক ও সংবাদপত্রসমূহের তালিকা সংগ্রহে যে সমস্ত ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশপূর্ব্বক সংশোধনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

শ্রীরাজবিহারী দাস।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।	পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
অনুবাদিকা ...	অপ্রকাশিত	অবোধবন্ধু ...	অপ্রকাশিত
অবলাবান্ধব ...	দ্বারকানাথ গঙ্গো (১)	অমৃতবাজারপত্রিকা ...	শিশিরকুমার ঘোষ(২)
অবকাশরঞ্জিকা ...	(ঢাকা হইতে প্রকাশিত)	অরুণোদয় ...	রেভারেণ্ড লাল-বিহারী দে
অপূর্ব্ব পঞ্চারৎ ...	অপ্রকাশিত	অরুণোদয় ...	পঞ্চানন বন্দো।
অবোধবোধিনী ...	„	আক্কেল গুড়ুম ...	রামনাথ (৩)

(১) নারীজাতির কল্যাণ-কামনায় বঙ্গদেশে যে সমস্ত পত্র প্রচারিত হইয়াছে, ইহা তাহাদিগের অন্যতম। পূর্ব্বতন ঢাকা ও ইদানীন্তন ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী লোনসিং গ্রাম হইতে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের মে মাসে অবলাবান্ধবের প্রচার আরম্ভ হয়। একবৎসর পাক্ষিকরূপে তথা হইতে প্রকাশিত হইয়া পরে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং পাঁচবৎসর কাল যথানিয়মে প্রকাশিত হইয়া অর্থাভাবে বন্ধ হয়। কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পরে ইহা মাসিক আকার ধারণ করে। এই পত্রের লেখকগণ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

(২) ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী অমৃতবাজার নামক গ্রাম হইতে এই বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রাদুর্ভূত হয়। প্রথমতঃ ইহা কেবল বঙ্গভাষায় লিখিত হইত। পরে কলিকাতা বাগবাজার হইতে ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে লর্ড লিটনের ভীষণ মুদ্রণ শাসনী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে অমৃতবাজার বাঙ্গালা অংশের পরিত্যাগ করে। এক্ষণে ইহা প্রাত্যহিক হইয়াছে। অমৃতবাজারের তীব্র লেখনী দেশবিখ্যাত।

(৩) ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে এই পত্র প্রকাশিত হয়। বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' লিখিয়াছেন, "ইহার লিখন ভঙ্গী দেখিয়া লোকের আক্কেল যথার্থই গুড়ুম হইত।"

পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম।
গম্বির	... কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য
গুণাকর	... অপ্রকাশিত
গোয়ালপাড়া হিতসাধিনী	
গ্রামদূত	... (বাখরগঞ্জ হইতে প্রকাশিত)
গ্রামবাসী	... (রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত)
গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা	হরিনাথ মজুমদার
চারুবার্ত্তা	... অদ্বৈতচরণ বসু, দীনেশচরণ বসু
চারুমিহির	... (ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত)
চিত্তরঞ্জিকা	... (ঢাকা হইতে প্রকাশিত)
চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ	... (চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত)
জগদ্দীপ	... অপ্রকাশিত
জগৎবাসী	...
জ্ঞানবিকাশিনী	... (পাবনা চাটমোহর হইতে প্রকাশিত)
জ্ঞানদীপিকা	... ভগবতীচরণ
জ্ঞানার্জ্জন	... চৈতন্যচরণ অধিকারী
জ্ঞানরত্নাকর	... তারিণীচরণ রায়
জ্ঞানচন্দ্রোদয়	... রাধানাথ বসু
জ্ঞানপ্রদায়িনী	... বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্ঞানদর্পণ	... উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্ঞানান্বেষণ	... রসিককৃষ্ণ মল্লিক (৮)
জ্ঞানোদয়	... চন্দ্রশেখর
জ্ঞানোদয়	... অপ্রকাশিত
ঢাকাগেজেট	... শশীভূষণ সেন
ঢাকাপ্রকাশ	... কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দপ্রসাদ রায়, গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী (৯)

পরে ক্রমান্বয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক জে রবিনসন সাহেব, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বাবু চন্দ্রনাথ বসু ইহার সম্পাদকতা কার্য্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। এই পত্রে গবর্ণমেণ্ট কৃত নানাবিধ বিজ্ঞাপন, রাজকীয় বিধি ব্যবস্থা ও রাজকর্ম্মচারিগণের নিয়োগাদির প্রভৃতি পত্রসমূহ অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

(৮) ১৮৩৬ কি ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে এই পত্র প্রচারিত হইয়া অল্পকাল জীবিত ছিল। তদানীন্তন হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহাতে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

(৯) বঙ্গীয় ১২৬৭ (১৭৮২ শক) সালের ৫ই চৈত্র তারিখে ঢাকা নগর হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ"-লেখক মৃত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর পিতৃব্য ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু ও বাবু চন্দ্রকান্ত বসু প্রভৃতির একান্ত চেষ্টায় পূর্ব্ববঙ্গের এই প্রাচীন ও প্রধান সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সদ্ভাবশতক প্রণেতা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বপ্রথম ইহার সম্পাদক পদে বরিত হয়েন। তৎকালে ঢাকাপ্রকাশ এরূপ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইত যে, ইহা সোমপ্রকাশের

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
ঢাকাদর্পণ	... অপ্রকাশিত
ঢাকাদর্শক	... তারিণীচরণ বসু
তিমিরনাশক	... অপ্রকাশিত
ত্রিপুরা-বার্ত্তাবহ	... "
ত্রিপুরা-প্রকাশ	... "
দর্পণ	... পূর্ণচন্দ্র পাঠক (চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত)
দিগ্বিজয়	... দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
দিগ্দর্শন	... গৌসাইদাস গুপ্ত
দিনমণি	... গোপালচন্দ্র দে
দিবাকর	... অপ্রকাশিত
দূত	... অপ্রকাশিত
দৈনিক	... ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত (১০)
দৈনিকবার্ত্তা	... অপ্রকাশিত
ধূমকেতু	... কালীকিশোর কাহালী
ধূমকেতু	... (চন্দননগর হইতে প্রকাশিত)
ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ	... (কালীঘাট হইতে প্রকাশিত)
নববিভাকর	... গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় (১১)

সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইত। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার "বিজ্ঞাপনী" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া ঢাকাপ্রকাশের সংস্রব পরিত্যাগ করিলে ব্যাকরণসারপ্রণেতা বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে ঢাকাপ্রকাশ ক্রমে নিস্তেজ ভাব ধারণ করে। বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হইলে ঢাকাপ্রকাশ হস্তান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান সম্পাদক বাবু গুরুগঙ্গা [illegible] চৌধুরী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ইনি ঢাকার ধনী বাবু রূপলাল দাস কর্ত্তৃক অভি[illegible]ক্ত হইয়া একবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

(১০) এইপত্র প্রতিদিন "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন "সমাচারচন্দ্রিকা" ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

(১১) খৃষ্টীয় ১৮৭৮ অব্দে লর্ড লিটন বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করিলে ভার্নাকুলার প্রেস আক্ট অনুসারে গবর্ণমেন্ট প্রথমে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট মুচলকা চাহেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় মুচলকা দিয়া পত্রিকা প্রকাশিত অপমান বোধ করেন এবং সোমপ্রকাশ উঠাইয়া দেন। সোমপ্রকাশ তখন বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র ছিল। উহার আকস্মিক বিয়োগে সর্ব্বসাধারণ সাতিশয় দুঃখিত ও প্রপীড়িত হইলেন। সোমপ্রকাশের অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য বাঙ্গালা ১২৮৫ সালের বৈশাখ মাসে "নববিভাকরের" অভ্যুদয় হইল। বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] প্রেমচাঁদ [illegible] সুত বাবু গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে এই পত্রের সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হয়েন। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় নববিভাকর অল্পদিনেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইল এবং সর্ব্বাংশেই উহা সোমপ্রকাশের অভাব পূরণ করিল। কিন্তু গুরুতর পরিশ্রমে গঙ্গাধর বাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় এক বৎসর পরে তিনি ইহা বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "সাধারণী"র সহিত সম্মিলিত করিয়া দিলেন এবং কিয়ৎকাল নববিভাকর ও সাধারণী সম্মিলিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া পরে বিলুপ্ত হইয়া গেল। নববিভাকরের অভাবে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার পূরণ হয় নাই।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
নবযুগ ...	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
নব মেদিনী ...	(মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত)
নদীয়াবাসী ...	অপ্রকাশিত
নগেন্দ্র বিনোদিনী ...	”
নিশাকর ...	নীলকমল দাস
পতাকা ...	জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়
পথ্যপ্রদান ...	অপ্রকাশিত
পরিদর্শক ...	জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
পরিদর্শক ...	(শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত)
পাষণ্ড পীড়ন ...	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী ...	(চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত)
প্রজাবন্ধু ...	(চন্দননগর হইতে প্রকাশিত)
প্রতিধ্বনি ...	অপ্রকাশিত
প্রতিকার ...	(বহরমপুর হইতে প্রকাশিত)

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
প্রকৃতি ...	অঘ্নকুমারচন্দ্র মুখো
প্রতিবাসী ...	অপ্রকাশিত
প্রভাতী ...	রাজমোহন মুখো
প্রভাত-সমীর ...	দুর্গাচরণ বন্দ্যো
প্রয়াগ-দূত ...	অপ্রকাশিত
ফরিদপুর-হিতৈষিণী ...	”
বঙ্গবাসী ...	যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১২)
বঙ্গদূত ...	নীলরত্ন হালদার
বঙ্গবিজ্ঞাপনী ...	মিত্র কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বঙ্গবন্ধু ...	(ঢাকা হইতে প্রকাশিত)
বঙ্গরবি ...	অপ্রকাশিত
বঙ্গনিবাসী ...	মহেশচন্দ্র পাল, উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩)

(১২) ১৮৮১ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে কলিকাতা মহানগরীতে এই বিখ্যাত পত্রের জন্ম হয়। "বঙ্গবাসী" প্রচারের পুর্ব্বে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের এরূপ বিস্তৃতি কি প্রসার ছিল না। যদিও "সুলভ সমাচার" প্রভৃতি অল্পমূল্যের দুই একখানা পত্র ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সমস্ত পত্র সাধারণ্যে তাদৃশ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। অল্পমূল্যে উচ্চ অঙ্গের পত্রিকা মধ্যে "বঙ্গবাসী"ই প্রথম ও প্রধান। বঙ্গবাসীর অনুকরণে এক্ষণে এদেশে অনেক পত্রের প্রচার হইয়াছে, কিন্তু গুণ গরিমায় বা গ্রাহক সংখ্যার প্রাচুর্য্যে কেহই অদ্যাপি "বঙ্গবাসীকে" অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ইহা অতীব আহ্লাদের বিষয় যে, বাঙ্গালাদেশে ইংরাজী বাঙ্গালা কোন সংবাদ পত্রেরই বঙ্গবাসীর তুল্য গ্রাহক সংখ্যা নাই। বঙ্গবাসীর গ্রাহক সংখ্যা বিংশতি সহস্রেরও অধিক হইবে।

(১৩) ১৮৯০ খৃঃ অব্দ (১২৯৭ বঙ্গাব্দে) এই পত্র বঙ্গবাসীর অনুকরণে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।	পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা ...	অপ্রকাশিত (১৪)	বাঙ্গালা এক্সচেঞ্জ গেজেট	চন্দ্রকিশোর রায়
বরিশাল বার্ত্তাবহ ...	"	বাঁদরামী ...	দ্বারকানাথ মুখো
বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী ...	"	বিশ্বদর্শন ...	শিবচন্দ্র চট্টো
বামাবোধিনী ...	"	বিক্রমপুর ...	অপ্রকাশিত (১৬)
বামারঞ্জিকা ...	(বরিশাল হইতে প্রকাশিত)	বিজ্ঞাপনী ...	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
		বিজলী ...	অপ্রকাশিত
বালকবন্ধু ...	অপ্রকাশিত	বেঙ্গল গেজেট ...	গঙ্গাধর ভট্ট (১৭)
বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয় ...	"	বেঙ্গল স্পেক্টেটর ...	রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র(১৮)
বর্দ্ধমান সংবাদ ...	"		
বসুমতী ...	(১৫)	বরাহনগর সমাচার ...	শশীপদ বন্দ্যো
বাঁকুড়া দর্পণ ...	"		
বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী	"	ভারতমিহির ...	অনাথবন্ধু গুহ(১৯)
বন্ধু ...	চারুচন্দ্র বসু	ভারতবাসী ...	হরিদাস গড়গড়ি

এক সময়ে ইহা বিশেষ যোগ্যতা সহকারে সম্পাদিত হইত। কিন্তু বাবু মহেশচন্দ্র পাল, মহিলা ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনীর দুর্নাম রটনা করায় কারাগারে আবদ্ধ হয়েন। পরে শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, তৎপরে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ইহার সম্পাদক হন। মহেশবাবু বঙ্গনিবাসীর স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি উহার পরিচালন ভার অর্পণ করেন। পরে সচিত্র ভারতসংবাদ বঙ্গনিবাসীর সহিত সংযোজিত হয়।

(১৪) ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে এই পত্র প্রথম প্রচারিত হয়।

(১৫) ১৩০৩ সালের ৩রা শ্রাবণ হইতে প্রকাশিত। প্রথমে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী, পরে গত পৌষ হইতে শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক হইয়াছেন।

(১৬) বাঙ্গালা ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে উত্তর বিক্রমপুরান্তর্গত লোহজঙ্গ গ্রাম হইতে তত্রত্য বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী বাবু রাধাবিনোদ পাল চৌধুরী কর্ত্তৃক বিক্রমপুর পরগণার মুখপত্র স্বরূপ এই পত্র প্রকাশিত হয়। তিন বৎসর কাল ইহা লোহজঙ্গ হইতে প্রকাশিত হইয়া পরে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে। তদবধি রাজধানী হইতেই প্রকাশিত হইতেছে।

(১৭) খৃষ্টীয় ১৮১৬ অব্দ এই পত্রের প্রকাশারম্ভের কাল নির্দ্দেশ করিয়া কেহ কেহ ইহাকেই বাঙ্গালার প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

(১৮) খ্যাতনামা রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র ইংরাজী ১৮৪২ সালে এই পত্র প্রচার করেন। ইহাতে নানাপ্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইত, কিন্তু পত্রিকাখানি ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় মুদ্রিত হওয়ায় ব্যয়ের অত্যন্ত আধিক্য হইল এবং দুই বৎসর পরে এই কারণে উঠিয়া গেল।

(১৯) বাঙ্গালা ১২৮২ সালের শ্রাবণ মাসে ময়মনসিংহ নগরে এই উৎকৃষ্ট পত্রের আবির্ভাব হয়। লেখার তেজস্বিতায় ও মতের উদারতায় ইহা একখানি গণনীয় পত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
ভারত-সংস্কারক ...	কালীনাথ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত
ভারত-হিতৈষী ...	অপ্রকাশিত
ভারতদর্পণ ...	"
ভারত-বণিক ...	"
ভারত-বন্ধু ...	শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত-রঞ্জন ...	(মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত)
ভারতসংবাদ (সচিত্র) ...	অপ্রকাশিত (২০)
ভারতীয় মন্ত্রমন্দির ...	ব্রাহ্মঋষি সিদ্ধেশ্বর
ভৃঙ্গদূত ...	নীলকমল রায়
মহাজনদর্পণ ...	জয়কালী বসু (২১)
মদ না গরল ...	অপ্রকাশিত
মনোরঞ্জন ...	গোপালচন্দ্র দে
মার্ত্তণ্ড ...	অপ্রকাশিত
মিহির ...	"

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
মুক্তাবলী ...	কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য
মুর্শিদাবাদ-পত্রিকা ...	অপ্রকাশিত (২২)
মুর্শিদাবাদ-প্রতিনিধি ...	"
মুসলমান বন্ধু ...	"
মেদিনী ...	(মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত)
মেদিনীপুর অধ্যক্ষ ...	অপ্রকাশিত
মৃত্যুঞ্জয় ...	"
মুর্শিদাবাদ হিতৈষী ...	"
রসরাজ ...	রাজনারায়ণ সেন ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য(২৩)
রসমুদ্গর ...	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রসরত্নাকর ...	যদুনাথ পাল
রত্নবর্ষণ ...	মাধবচন্দ্র ঘোষ
রত্নাবলী ...	অপ্রকাশিত

---

(২০) বঙ্গবিবাসী ও সাহিত্যকল্পদ্রুম সম্পাদক শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফীই ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা অতি অল্পদিন ছিল। পরে ইহার স্বত্বাধিকারী শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহা বঙ্গনিবাসীর সহিত মিশাইয়া দেন।

(২১) ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে এই পত্র প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ ইহা বাঙ্গালার বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রথম পত্র।

(২২) ১৮৪০ খৃঃ অব্দে রাজা কৃষ্ণনাথ তদীয় প্রজাবর্গের উন্নতিবিধানার্থ এই পত্রের প্রচার আরম্ভ করেন।

(২৩) এই জঘন্য পত্র ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হয়। মৃত ভোলানাথ সেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহা ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। রসরাজের প্রথম সম্পাদক রাজনারায়ণ সেন কাশিমবাজার-নিবাসী রাজা কৃষ্ণনাথ ও তদীয় সহধর্ম্মিণী রাণী স্বর্ণময়ীর অপবাদ রটনা করায় উক্ত রাজা কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ হয়েন। দ্বিতীয় সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যও রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার নিমিত্ত কারাগারে গমন করেন। রসরাজ দীর্ঘকাল সংবাদপ্রভাকরের সহিত অশ্লীল কবিতা-যুদ্ধ করে। বাবু রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, "প্রভাকর ও রসরাজে যখন ঝগড়া হইত, তখন রাস্তায় দুইজন ময়লা পরিষ্কারক জাতীয় লোক ঝগড়া করিয়া পরস্পরের হস্তিকারিত ময়লা লইয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করিলে যেরূপ দৃশ্য হয়, সেরূপ অদ্ভুত দৃশ্য হইত।"

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
রত্নাকর	... অপ্রকাশিত
রঙ্গপুর-দিক্‌প্রকাশ	... (কাকিনিয়া হইতে প্রকাশিত)
রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ	... অপ্রকাশিত
রাজরাণী	... গঙ্গানারায়ণ বসু
রাজসাহী সমাচার	... অপ্রকাশিত
শক্তি	... (ঢাকা হইতে প্রকাশিত)
শান্তি	... অপ্রকাশিত
শিল্প ও কৃষিপত্রিকা	... (তাহেরপুর হইতে প্রকাশিত)
শুভসাধিনী	কালীপ্রসন্ন ঘোষ (২৪)
শ্রীহট্টপ্রকাশ	... অপ্রকাশিত (২৫)
সমাচারদর্পণ	... জন ক্লার্ক মার্শম্যান সাহেব (২৬)
সময়	জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস (২৭)
সমাচার চন্দ্রিকা	... ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত
সহচর	... বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়
সম্মিলনী	... উমেশচন্দ্র গুপ্ত
সত্যবাদী	... অপ্রকাশিত
সঞ্জয়	... (ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত)
সহযোগী	... অপ্রকাশিত
সমাচার সুধাবর্ষণ	... "
সভারাজেন্দ্র	... "
সত্যপ্রদীপ	... এম্ টাউন্‌সেণ্ড সাহেব (২৯)

(২৪) সুলভ সমাচারের অনুকরণে ইহাই ঢাকা নগরের সর্ব্বপ্রথম এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র।

(২৫) ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্ট হইতে এই পত্র প্রকাশিত হয়।

(২৬) ১৮১৮ খৃঃ অব্দের ২৩শে মে (কাহারও মতে ৩১শে মে) শ্রীরামপুর হইতে বঙ্গের এই আদি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রের প্রতি সংখ্যা চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইত এবং নির্দ্দিষ্ট ডাক মাশুলের এক চতুর্থাংশ মূল্যে ইহা দেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। ইহা ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত হইত। সুবিখ্যাত খৃষ্টধর্ম্মযাজক জন ক্লার্ক মার্শম্যান সাহেব এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। মার্শম্যান সাহেব বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িক পত্রের জনক। তিনিই 'দিগ্দর্শন' নামক নানা ঐতিহাসিক প্রবন্ধসম্বলিত সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার জন্ম অথবা মৃত্যুদিন উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র সম্পাদকগণের মহোৎসব করা কর্ত্তব্য।

(২৭) ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে বঙ্গবাসীর অনুকরণে এই পত্রের প্রকাশ হয়। পরে ইহার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা আমূল-সংস্কার-প্রিয়তার (Radicalism) পরিপোষক।

(২৮) ১৮২০ (কাহারও মতে ১৮২১) খৃঃ অব্দে পণ্ডিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংবাদ কৌমুদীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এই পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে সতীদাহের স্বপক্ষতা করা হইত। সমাচারচন্দ্রিকা এক্ষণে দৈনিকের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

(২৯) ১৮৫০ খৃঃ অব্দে এম্ টাউনসেণ্ড সাহেব এই সচিত্র পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যসংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকটিত হইত।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।	পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
সর্ব্বশুভকরী	… মতিলাল চট্টোপাধ্যায়	সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়	… হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র আঢ্য, অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য, গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য (৩২)
সর্ব্বরসরঞ্জিনী	… অপ্রকাশিত		
সমালোচক	… দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়		
সমাচারদর্পণ	… মার্শম্যান সরকার	সংবাদভাস্কর	… শ্রীনাথ রায়, গৌরী-শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য (৩৩)
সংবাদকৌমুদী	… রামমোহন রায় (৩০)		
সংবাদপ্রভাকর	… ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামচন্দ্র গুপ্ত, গোপালচন্দ্র মুখো (৩১)		

(৩০) এই পত্র ১৮২১ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহাতে সহমরণের বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইত।

(৩১) ১৮৩১ খৃঃ অব্দের (১২৩৭ বঙ্গাব্দের) ১৬ই মাঘ [illegible] কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই প্রসিদ্ধ পত্রের প্রচার করেন। গুপ্ত কবির "প্রভাকর" এক সময়ে দেশ মধ্যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। প্রভাকরে গদ্য পদ্য উভয়ই প্রকটিত হইত; কিন্তু উহার গদ্য অপেক্ষা পদ্যই লোকের মন অধিক আকর্ষণ করিত। গুপ্ত কবির প্রায় কবিতাসমূহ লোকের নিকট এত সমাদৃত হইত যে, অনেক সময় প্রভাকরের দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বারা লোকের ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করিতে হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অসামান্য কবিত্ব শক্তি-সম্পন্ন হইয়াও বিশুদ্ধ রুচির অভাবে 'ভাস্কর' ও 'রসরাজে'র সহিত অশ্লীল কবিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রভাকর অদ্যাপি জীবিত আছে এবং গুপ্ত কবির মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

(৩২) ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতার 'আঢ্য' পরিবার কর্ত্তৃক এই পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ ইহা প্রতি-পক্ষে একবার করিয়া বাহির হইত। তৎকালে বাবু হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি ঢাকা কালেজের অধ্যাপক হইয়া গমন করিলে বাবু উদয়চরণ আঢ্য ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। বাবু উদয়চরণ আঢ্য বাঙ্গালার আবকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলে বাবু অদ্বৈতচরণ আঢ্য ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে বাবু অদ্বৈতচরণ আঢ্যের মৃত্যু হয়। তৎপরে বাবু গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ইহার সম্পাদক হয়েন। ১২৪৮ সালে ইহা সপ্তাহে তিনবার করিয়া প্রকাশিত হইত; পরে ১২৫২ সালে (১৮৪৫ খৃঃ অব্দে) প্রাত্যহিক হইয়া এখনও তদবস্থায় জীবিত আছে।

(৩৩) ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীনাথ রায় এই পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। আন্দুলের রাজা [illegible] রায়ের বিরুদ্ধে কোন অপবাদ ঘোষণা করায় শ্রীনাথেরা উক্ত রাজার ২০।২৫ জন হিন্দুস্থানী দারবান কর্ত্তৃক ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ১০ই জানুয়ারি ৮ ঘটিকার সময় ধৃত, আক্রান্ত, প্রহৃত ও অর্দ্ধ উলঙ্গভাবে আন্দুলে নীত হয়েন। তথায় উত্তপ্ত লৌহে তাঁহার হস্ত ও শরীরের নানাস্থান দগ্ধ করা হয়। ঐ অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক তাঁহার এক সহস্র মুদ্রা মাত্র জরিমানা হইয়াছিল। যাহা হউক, তৎকালে ভাস্করের গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুদূরবর্ত্তী পঞ্জাব ও ইংলণ্ডে ভাস্করের গ্রাহক ছিল। অতঃপর পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ভাস্করের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। তিনি গদ্য রচনায় সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পদ্যে প্রভাকরের যেরূপ প্রতিপত্তি হয়, গদ্যে ভাস্করও সেইরূপ সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় বহুদিন হইল "ভাস্কর" অস্তমিত হইয়াছে।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।	পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
সংবাদ-সাধুরঞ্জন ...	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	সারসংগ্রহ ...	অপ্রকাশিত
সংশোধিনী ...	(চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত)	স্বাস্থ্যতত্ত্ব ...	"
		সুধীরঞ্জন ...	"
সঞ্জীবনী ...	কৃষ্ণকুমার মিত্র (৩৪)	সুনীতিসংবাদ ...	"
		সুধাপান ...	"
সাপ্তাহিক সমাচার ...	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	সুলভসমাচার ...	কেশবচন্দ্র সেন (৩৭)
সাধারণী ...	অক্ষয়চন্দ্র সরকার (৩৫)	সুরভি ...	যোগেন্দ্রনাথ বসু (৩৮)
সারস্বতপত্র ...	রাজবিহারী দাস, উমেশচন্দ্র বসু (৩৬)	সুলভ দৈনিক ...	কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এ,
সাহস ...	চন্দ্রশেখর সেন		

(৩৪) ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে বঙ্গবাসীর প্রতিবর্ণীরূপে ইহা কলিকাতার উন্নতিশীল ব্রাহ্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই পত্রে শিক্ষা ও রাজনীতিসংক্রান্ত নানা সারগর্ভ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়া থাকে, কিন্তু সমাজনীতির আলোচনায় সঞ্জীবনী সময়ে সময়ে হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিয়া থাকেন।

(৩৫) বাঙ্গালা ১২৮০ সালের ১লা কার্ত্তিক চুঁচুড়ানগরে এই শ্রেষ্ঠ পত্রিকার অভ্যুদয় হয়। প্রথম প্রথম "সাধারণী" রাজনীতি অপেক্ষা সাহিত্যচর্চায় অধিকতর মনোনিবেশ করিত, পরে উহা চুঁচুড়া হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং নববিভাকরের সহিত সম্মিলিত হইয়া বৃহদাকার পরিগ্রহ করে। ঐ সময়ে উহা বঙ্গের একখানি অত্যুৎকৃষ্ট রাজনৈতিক পত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।

(৩৬) ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক কর্ত্তৃক ঢাকা সারস্বত বা পণ্ডিত সমাজের মুখপত্রস্বরূপ এই পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা প্রাচীন হিন্দুরীতিনীতির পরিপোষক। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের শিক্ষা সৌকর্য্যবিধানার্থ ইহাতে রাজনৈতিক প্রস্তাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। কিছুকাল প্রবন্ধলেখক সারস্বত সমাজের সভ্যপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তকার্য্যে গমন করিলে নানা সম্পাদক পরিবর্ত্তিত হওয়ার পর বাবু উমেশচন্দ্র বসু উহার সম্পাদকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। সারস্বত পত্রের কলেবর এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছে।

(৩৭) সুবিখ্যাত বাগ্মী বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া য়ুরোপীয় সংবাদপত্রের অনুকরণে এতদ্দেশে একখানা স্বল্পমূল্যের সংবাদ-পত্র প্রকাশে যত্নবান্ হয়েন। তাঁহারই উদ্যোগে এক পয়সা মূল্যে কলিকাতা হইতে এই ক্ষুদ্র পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে এরূপ অল্প মূল্যের উৎকৃষ্ট পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

(৩৮) ১৮৮১ খৃঃ অব্দে বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু এই পত্রের প্রচার আরম্ভ করেন। এই পত্রে রাজনীতি অপেক্ষা সাহিত্যেরই অধিকতর আলোচনা হইত। ইহার সহিত পরে বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "পতাকা" নামক পত্র সম্মিলিত হয়। এক্ষণে উভয়ই বিলুপ্ত হইয়া "হিতবাদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

পত্রিকার নাম।		সম্পাদকের নাম।	পত্রিকার নাম।		সম্পাদকের নাম।
সুধাকর	...	আবদুর রহিম	সুলভসংবাদ	...	অপ্রকাশিত
সুজনবন্ধু	...	নবীনচন্দ্র দে	সোমপ্রকাশ	...	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ,
সুজনরঞ্জন	...	গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত			কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (৩৯)
সুধাসিন্ধু	...	অপ্রকাশিত	সৌদামিনী	...	অপ্রকাশিত

(৩৯) খৃষ্টীয় ১৮৫৮ অব্দের নবেম্বর মাসে (১৭৮০ শকের অগ্রহায়ণ) পণ্ডিত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় এই সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। রচনার বিশুদ্ধতায় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের রীতিসঙ্গত সমালোচনায় সোমপ্রকাশ একবিংশতি বর্ষকাল বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশীয় ও য়ুরোপীয় মহলে, সমানেই সোমপ্রকাশ পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। সোমপ্রকাশ হইতে অনেকেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনার পদ্ধতি অবগত হইয়াছেন। প্রাচীন সোমপ্রকাশের নির্ভীকতা, দূরদর্শিতা ও যুক্তি-প্রদর্শন-কুশলতা বাঙ্গালা সংবাদপত্র মাত্রেরই অনুকরণীয়। সোমপ্রকাশের প্রথম প্রচার বিবরণ কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ। সংস্কৃত কালেজে সারদাপ্রসাদ নামে একজন কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। পাঠদশায় তিনি ঈষৎ বধির ছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার বধিরতা বৃদ্ধি হইল। তিনি কৃতবিদ্য হইলেও একমাত্র বধিরতাদোষে তাঁহার কোন কাজকর্ম্ম পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। সারদাপ্রসাদের জীবনোপায় করিবার নিমিত্ত দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সোমপ্রকাশের সৃষ্টি কল্পনা করেন। সারদাপ্রসাদ সোমপ্রকাশের সম্পাদক হইবেন আর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি উহাতে লিখিবেন প্রথমে এই স্থির হয়। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ করাতে সারদাপ্রসাদের সেই স্থলে কর্ম্ম হইল, তিনি কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কল্প কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। কিন্তু তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় ভাল সংবাদপত্র ছিল না, একখানি ভাল বাঙ্গালা সংবাদ পত্র হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে এই অভিলাষ ছিল। এক দিবস তাঁহার সেই পূর্ব্বসঙ্কল্প স্মরণ হওয়াতে তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজনকে ডাকিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহার মতের অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বে যে সংবাদ-পত্রের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, তাহাই করা হইবে স্থির হইল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই লিখিবেন, এই অবধারণ করিয়া সম্পাদকতার ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল। কিছুদিন তাঁহারা সকলেই লিখিয়াছিলেন, ক্রমে দুই একজন করিয়া প্রত্যেকেই অবসর গ্রহণ করিলেন। সমুদয় ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্কন্ধে পতিত হইল। যখন সোমপ্রকাশের প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন ছাপাখানা কলিকাতা চাঁপাতলায় ছিল। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে মাতলা রেলওয়ে খোলা হইলে ঐ মুদ্রাযন্ত্র চাঙ্গড়িপোতায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিজ বসত বাটীতে নীত হয়। পরে তথা হইতে উহা ভবানীপুরে আনীত হইয়াছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার জীবনকাল (১৮৮৬ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত এই পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে ইহার সে তেজ, সে প্রতিভা বা সে রচনার মাধুর্য্য কিছুই নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একজন অনুগ্রহভাজন ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উৎসাহে বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে এই প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক সোমপ্রকাশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও ভগবতীচরণ দে প্রভৃতি ঐ আন্দোলনায় যোগ দান করেন। স্বয়ং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ঐ সময় নানা জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবে প্রভৃতি বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ লর্ড লিটনের ভীষণ মুদ্রাশাসনী ব্যবস্থা প্রচারিত হইলে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট মুচলকা চাহেন। তিনি মুচলকা দিতে

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
[illegible]হর পত্রিকা ...	অপ্রকাশিত
হা[illegible] প্রকাশিকা	ঐ
হাবড়া হিতকরী ...	ঐ
হিন্দুরঞ্জিকা ...	(বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত)
হিন্দুহিতৈষিণী ...	হরিশ্চন্দ্র মিত্র, আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত, (৪০)
হিতবাদী ...	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (৪১)
হিতসাধিনী ...	(বরিশাল হইতে প্রকাশিত)
হিতকরী ...	হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়
হিতৈষী ...	কালীচরণ মিত্র
হরিভক্তি প্রদায়িনী ...	প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী

পত্রিকা রাখিতে অপমান বোধ করিয়া সোমপ্রকাশ প্রচার বন্ধ করেন। পরে লর্ড রিপণের অনুগ্রহে মুদ্রাযন্ত্র আইন তিরোহিত হইলে সোমপ্রকাশ পুনর্জীবিত হয় এবং তদবধি অদ্যাপি ইহা জীবিত থাকিয়া নানারূপে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছে।

(৪০) বাঙ্গালা ১২৭৮ সনের ফাল্গুন মাসে ঢাকা জেলার কতিপয় প্রধান হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির মতে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার মুখপত্রস্বরূপ হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুকবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রথমে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। ১৩ বৎসর এই পত্রিকা দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয়। বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্রের পরলোক গমনের পর বাবু আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত ইহার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। এক্ষণে ঢাকার হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা ও হিন্দুহিতৈষিণী উভয়েরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

(৪১) সুপণ্ডিত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রথমে ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হয়েন। [illegible] শতাব্দীর অনেক লেখক তখন তাঁহার সহায়তা করিতেন। পরে ইহা হস্তান্তরিত হইয়া প্রথমে বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ মিত্র, পরে এখন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে হিতবাদী বাঙ্গালার একখানি অত্যুৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এখন পর্য্যন্ত অনেকের ধারণা যে, বাঙ্গালা পদ্যরামায়ণ-প্রণেতা কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত, দুই তিন শত বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন লোক নহেন এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৃত্তিবাস কৌলীন্যের শীর্ষস্থানাধিকারী হইলেও, অনেকে তাঁহাকে আদৌ ব্রাহ্মণ,—অন্ততঃ কুলব্রাহ্মণ বলিয়াই অবগত নহে। যাহাহউক, বাঙ্গালার আদি লেখক এবং কবিখ্যাতির পৌরোহিত্য বিবেচনা স্থলে, কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বাঙ্গালার আদি কবি; কেহ বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা গুণরাজ খাঁকেই সেই পদে অধিষ্ঠিত করিয়া থাকেন এবং কেহ বা এমনও নির্লজ্জ বিদ্বান্ আছেন, যাঁহার মতে, এমন কি, চণ্ডী-প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীও কৃত্তিবাসের অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে।

কেবল কৃত্তিবাস সম্বন্ধে এ কথা বলি কেন, আমাদের বাঙ্গালা দেশের ঐতিহাসিক অনেক বিষয় সম্বন্ধেই, ঐরূপ অপূর্ব্ব শত গল্প এ পর্য্যন্ত অতি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া খ্যাপিত ও বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি, শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও, অতি ধীর ও গম্ভীরভাবে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন যে,—

১। পাল বংশের আগে, শূরবংশ বলিয়া বাঙ্গালায় কোন রাজবংশ ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রাচীন যে রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা পালবংশ। ভাল, তাহাই যদি হইল, তবে আবার আদিশূরানীত শাণ্ডিল্য-গোত্রোদ্ভব ভট্টনারায়ণ-বংশীয় দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র, গুরবমিশ্র প্রভৃতিকে পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে পাল রাজাদিগের মন্ত্রিত্ব করিতে দেখা যায় কি রূপে?[১] অথবা ব্রাহ্মণদিগের আদি কৌলিন্য-স্থাপক আদিশূর-বংশীয় রাজা ধরাশূরই বা কোথায় যান?

---

(১) বাঙ্গালায় পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় অপর কোন ব্রাহ্মণ বংশ বাঙ্গালায় বর্ত্তমান ছিল না, অথবা স্বতন্ত্র আনীতও হয় নাই। পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার যে কয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিল, তাহাদের গোত্র নাম এই—শুনক, শনক, কাশ্যপ, গৌতম, পরাশর, বশিষ্ঠ, হারিত, বাক এই আট গোত্র। কিন্তু আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ১২ অধ্যায়ে যে গোত্রমালা দেওয়া আছে, তাহার মধ্যে 'শুনক' গোত্রের নাম পাইলাম না। যাহা হউক, একখানি তাম্রলিপি হইতেও দেখা যাইতেছে যে, ভট্টনারায়ণ-বংশীয় আদির্গাই ওঝা, গৌড় পালবংশের স্থাপক দেবপাল রাজার পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন,—

"রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ প্রথম [illegible] বিধাতুঃ
[illegible] ভট্টনারায়ণাঙ্ক।" ইত্যাদি। (বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য।)

এ বাক্যের সম্পূর্ণ শ্লোকখানি আমার কাছে নাই। সম্ভবতঃ তখনও গৌড় শূরবংশই প্রবল এক পাল-

২। সেন বংশের আদি বীরসেনই, আদিশূর নাম লইয়া, বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভাল! এদিকে কিন্তু বল্লালের বাপ বিজয়সেনের নিজ খোদিত লিপি দ্বারা জানা যায় যে, বীরসেন হইতে অধঃস্তন তিন পুরুষ, বাঙ্গালার মুখও কখনও দেখেন নাই; (২) তাঁহারা আজীবন স্বচ্ছন্দচিত্তে দাক্ষিণাত্য কর্ণাটভূমিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বীরসেনই যদি আদিশূর নাম লইয়া বাঙ্গালায় পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ আনাইয়া থাকেন, তবে বীরসেন হইতে পঞ্চম পুরুষ বল্লালের সময়, ব্রাহ্মণ-বংশের ১৩।১৪ পুরুষ(৩) পৌঁছিয়াছিল কি করিয়া? বংশ-গণনায়, অতি ন্যূন সংখ্যায়ও, ২৫ বৎসরের কমে পুরুষ গণিত হইতে পারে না। এ হিসাবে ব্রাহ্মণদের ১৪ পুরুষ পর্যন্ত হইতে অন্ততঃ পক্ষে ৩৫০ বৎসর লাগিয়াছে। আর ওদিকে বীরসেন হইতে বল্লাল পর্য্যন্ত পুরুষ-গণনায় বৎসর যদি দুনা করিয়াও ধরা যায়, তাহা হইলেও পাঁচ পুরুষে মোট ২৫০ বৎসর হয়। সুতরাং এই পঞ্চব্রাহ্মণ যে বীরসেন ব্যতীত, অন্য কোন প্রাচীন আদিশূরের দ্বারা বল্লালের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে আনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।(৪)

৩। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন যে, মুসলমান সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালায় আসিয়া, লক্ষ্মণিয়া নামক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, গৌড় অধিকার করেন। এখন এই লক্ষ্মণিয়া কে? আমাদের ঐতিহাসিকদের সাধারণতঃ লক্ষ্মণসেনের প্রতি যেন অতীব কৃপা। লক্ষ্মণসেন বয়সকালে [illegible] প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন বলিয়া হউক, আর যে কারণেই হউক, এই লক্ষ্মণসেনের উপর তাঁহারা বাঙ্গালায় যবনাধিকারের কলঙ্কটা চাপাইতে একেবারেই নারাজ। লক্ষ্মণের পর তাঁহার দুই পুত্র মাধবসেন ও কেশবসেনের নাম পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহারাও লক্ষ্মণিয়া হইতে পারেন না। অথচ একটা লক্ষ্মণিয়া খাড়া না করিতে পারিলেও চলে না। এখন পুস্তক বিশেষে মাধবের নাম কিছু অস্পষ্ট, সুতরাং সেইই তবে মুসলমান

বাপ তখন বাঙ্গালার কোন প্রাদেশিক ভূঁইঞা বা সামন্তরাজ স্বরূপ ছিলেন। তখনও প্রবল হইয়া গৌড় অধিকার করিবার সময় তাঁহাদের আসে নাই।

(২) দাক্ষিণাত্য কর্ণাটরাজ্যে বীরসেনের পুত্র সামন্তসেন, সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন, হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন, বিজয়ের পুত্র বল্লালসেন। সেনরাজগণের অনেক তাম্রশাসন দৃষ্টেই এই সকল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৩) পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ বংশে উৎপন্ন উৎসাহ মুখটি বল্লালের নিকট কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন, ইনি শ্রীহর্ষ হইতে ১৪ পুরুষ অন্তর। অন্য চারি গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা এই সময়ে কেহ ১১, ১২, বা ১৩ পুরুষে গণিত হইয়া থাকেন।

(৪) আদিশূরের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রকার লিখিয়াছেন, যথা, কায়স্থ কৌস্তুভ অনুসারে ৮১০ শক, সম্বন্ধমালা অনুসারে ৮০৮ শক, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের নির্ণয় অনুসারে ৮৮৪ এবং ক্ষিতীশবংশা-

আঙ্গুল কাটিয়া অঙ্গুলিবৎ যে কিছু নূতনত্ব সম্পাদন করিয়া থাকি মাত্র। নতুবা যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহাতে এখনও বলিতে হয় যে, বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিষয়ে স্বাধীন অনুসন্ধান কার্য্য, এখনও তাহার শৈশব সীমা অতিক্রম করে নাই। এখনও অনেকে, ইংরেজপ্রণীত পুস্তক সকলের টীকা টিপ্পনী হইতে বহুগ্রন্থের নামাদি নকল করিয়া, স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশপূর্ব্বক স্বীয় অসীম বিদ্যাবত্তা ও বহুব্যাপী অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন*। দেশে একজন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত থাকিলেই রক্ষা থাকে না; কিন্তু আমাদের সমীপস্থ বাঙ্গালা পুস্তক সকল পড়িলে, অবশ্যই বলিতে হয় যে, তেমন পণ্ডিত আমাদের দেশে অসংখ্য। অসংখ্য বটে, তথাপি কিন্তু আমাদের যে সাহিত্য ইতিহাসাদি বিষয়ক অভাব ও দুর্দশা ঘুচে না, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই।

উহারই মধ্যে যাহারা যা কিছু স্বাধীন ভাবে বিষয়ানুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহাও প্রায় ছাপার পুঁথি ঘুটে। আমাদের প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথি সকল প্রায়ই স্পর্শাতীত

হয় নাসির ভাস্কাভরি পুরাণে মোট ৩০ বৎসরই পাওয়া যায়। অতএব আইন-ই-অকবরী ও অপরাপর গ্রন্থে, বল্লালের রাজত্বকাল ৫০ বর্ষ বলিয়া যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহা যে সত্য, সে কথা উপরোক্ত হিসাবের দ্বারাও অতি উত্তমরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

আর একটা কথা, লক্ষ্মণসেন প্রবর্ত্তিত অব্দ সন, যাহা এখনও মিথিলায় প্রচলিত, তাহা বর্ত্তমান ১৮৯৭ খৃঃ ৭৮৯ বর্ষ পরিমিত, সুতরাং ১১০৮ খৃষ্টাব্দে উহার আরম্ভ। এই ১১০৮ খৃঃ হইতে লক্ষ্মণের ৩৭ বৎসর রাজত্ব শেষ ১২০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত, ৯৭ বর্ষ পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা এই দুইটী বিষয় সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে; প্রথমতঃ অব্দ সন লক্ষ্মণসেনের জন্ম বৎসর ধরিয়া আরম্ভ; দ্বিতীয়তঃ বখ্তিয়ার খিলিজীর বাঙ্গালা আক্রমণ কালে লক্ষ্মণসেন যথার্থই অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। এরূপ বৃদ্ধ রাজ্য ছাড়িয়া বিনাযুদ্ধে পলাইলে, দোষ তাঁহাকে দেওয়া যায় না; দোষ লক্ষ্মণের পাত্র মিত্রাদির এবং দোষ সমস্ত বাঙ্গালী জাতির। তাই বলি, সে পলায়ন লক্ষ্মণসেনের নহে; সে পলায়ন সমস্ত বাঙ্গালী জাতির, লক্ষ্মণসেন কেবল তাহাতে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি প্রতিনিধি পলাতক, এই মাত্র তাঁহার দোষ।

লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিক একটা কথা লিখিয়াছেন যে, তিনি জাতক রাজা এবং তাঁহার মাতা জননের প্রতীকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্মণকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেন নাই। এ অদ্ভুত উপন্যাসের প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। যাহাহউক, যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে না দিলে, সন্তান এবং প্রসূতি উভয়েই বাঁচে কি? শরীর-তত্ত্ববিদেরাই বলিতে পারেন। তবে আমরা মোটা বুদ্ধিতে যতটা দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় যেন বাঁচে না।

যাহাহউক, এখন বোধ হয় অনেকেরই মনে থাকিবে যে, মহম্মদ বখ্তিয়ার খিলিজী বিতাড়িত অভাগা, আর কোন লক্ষ্মণ বা লাক্ষ্মণের নয়, মিথিলা ও কাশী পর্য্যন্ত অধিকারী এবং মিথিলার লক্ষ্মণ নামক সন্প্রবর্ত্তক বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনেরই কথা। তাঁহার যৌবনে বীরপুরুষ থাকিলেও, বার্দ্ধক্য ও জরাগ্রস্ত অবস্থায় তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ও শত্রু সম্মুখে পলায়ন না হইতে পারে, এমন কোন কথা নাই বা অনন্তরও তাহাতে কিছু দোষা যায় না।

(৩) যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত ও যাঁহারা এরূপ পাণ্ডিত্যশালীদের অতীত, এমনও দেশে অনেক আছেন। অবশ্যই তাঁহার এ বিক্রমোক্তি যে তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী মুখটী সম্বন্ধে, ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত মহাবংশে, এই কারিকা দৃষ্ট হয়——

"ফুলিয়া মুখটী মুরারিজ বনমালী।——

শ্রীমঙ্গলাই মুখজস্য ব্রহ্মাদ্যোর্গৌ
পাদঃ পুত্রো মুখরপণ্ডিতযোগহেতুঃ।
কন্যাঃ সদা সুমতি মিশ্রো দিবাকরোগৌ
ক্ষেমো। বৃহস্পতিক আর্ত্তি বিশোপি চট্টঃ॥

কিঞ্চ। বনমালিনা কৃতাচাত্তি পাং পুত্রো বংশত্রে যশা।
মিশ্রে দিবাকরে পিক্কিবার্কা দোষাবিমুক্তবান্॥
চট্টৌবৃহস্পতিক্ষেমাঃ তৎসুতা জজিরেপি সন্।
কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সৌম্যঃ শান্তিজনপ্রিয়ঃ॥
মাধবঃ মাধুরেবাসীৎ মৃত্যুঞ্জয়ো মহাশয়ঃ।
বলঃ শ্রীকণ্ঠকঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজ ইমে সুতাঃ॥"

এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, বনমালীর ৭ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসকে ধ্রুবানন্দ মিশ্র "কবি ও ধীমান্" এই কয়টী বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের অপর ছয় ভ্রাতার নাম, জ্যেষ্ঠাদিক্রমে শান্তি, মাধব, মৃত্যুঞ্জয়, বলভদ্র, শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ।

পুনশ্চ, ধ্রুবানন্দের বনমালী বিষয়ক উক্ত কুলকারিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাসের ভগ্নী বা বনমালীর কন্যা চারিটি। তাহার মধ্যে বনমালী মুখোপাধ্যায় পুরন্দর গাঙ্গুলীর সঙ্গে প্রথমা কন্যার বিবাহ দেওয়ায় কুলে কিছু খাট হইয়া যান। তাহার পর আবার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ দিবাকর মিশ্রকে প্রদান করায় সে দোষ কাটিয়া যায়। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ কন্যা ক্রমান্বয়ে বৃহস্পতি চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে সম্প্রদান করেন।

অতএব উপরোক্ত বংশতালিকা ও কুলকারিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, আদিশূরের আনীত ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত ২২ পুরুষ। তিনি মুরারি ওঝার পৌত্র, বনমালী মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই ছয়টি, নাম—শান্তি, মাধব, মৃত্যুঞ্জয়, বলভদ্র, শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ। ভগ্নী ৪টীর নাম প্রকাশ নাই, তবে ভগ্নীপতি চারিজনের নাম এই—পুরন্দর গাঙ্গুলী, দিবাকর মিশ্র, বৃহস্পতি চট্ট এবং বিশ্বেশ্বর চট্ট।

জগদীশ ।২৫। গোপাল ।২৬। রামনারায়ণ ২৭। রামকান্ত ।২৮। ভুরশিটের ভূম্যধিকারী রাজা নরেন্দ্র রায় ।২৯। নরেন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্র রায় ।৩০। ভারতচন্দ্রের বহুপূর্ব্বেই মুরারি ওঝার বংশাবলীর এই শাখা কৌলীন্যচ্যুত হইয়াছিল।

এখন কৃত্তিবাস কতদিনের লোক, তাহা দেখা যাউক। উপরে নিরূপিত হইয়াছে যে, ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃঃ অব্দে পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্তৃক বাঙ্গালায় আনীত হয়েন। সেই সময় হইতে কৃত্তিবাস ২২ পুরুষ। এখন প্রতিপুরুষে ৩০ বৎসর ধরিলে, ২২ পুরুষ হইতে ৬৬০ বৎসর অতীত হয়। সুতরাং মোটামুটি কৃত্তিবাসের সময় ১৩১৪ শক বা ১৩৯২ খৃঃ অব্দ হইতেছে। অবশ্য, অন্যবিধ উপায়ে গণনা করিলে ইহা হইতে অনেকটা তফাত বাদ হইতে পারে এবং ইহাও জানিয়া যে, যেখানে অন্ত কোন ভাল উপায়ের অভাব, সেখানে কাজে কাজে পুরুষ গণনার দ্বারা কাল নিরূপণ করিতে হয়। পুনশ্চ, এও দেখিতে হইবে, অন্য চারি গোত্রের তুলনায়, সমসময়ে মুখটীবংশে অনেক বেশী পুরুষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ বংশে পুরুষ হইতে পুরুষান্তর উৎপাদনে অনেক অল্প সময় লাগিয়াছে। অতএব এ বংশগণনায় ৩০ অপেক্ষা আরও কিছু কম বৎসরে পুরুষ গণনা করিলে, বোধ হয় কৃত্তিবাসের স্থান আরও সঙ্গত হইতে পারে।

এ ছাড়া আরও একটী বিষয় দ্রষ্টব্য। দেবীবর ঘটক যে সভায় কুলীনদের মেলবন্ধন করেন, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃত্তিবাসের জ্যেঠতুত ভাই নন্দীধরের পৌত্র সুধানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং ঐ গঙ্গানন্দ ভট্টকে ধরিয়াই ফুলিয়া মেলবন্ধ হয়। তাহা হইলেই জানা যাইতেছে, দেবীবর কর্তৃক মেলবন্ধন হওয়ার অনেক আগে কৃত্তিবাস। তবে উপরোক্ত বংশ-তালিকায় ইহাও দৃষ্ট হইবে যে, ঐ একই বংশের মহাদেব শাখায় আর একজন, অর্থাৎ যোগেশ্বর পণ্ডিতও সেই মেলবন্ধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাকে ধরিয়াই খড়দহ মেলের সৃষ্টি।(১) এখন কথা হইতেছে যে, যোগেশ্বর পণ্ডিত সে সময় জীবিত ছিলেন বলিয়া, কৃত্তিবাসকেও যে সেই সময়ের লোক হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; যেহেতু, বংশ এবং বংশের শাখা বিশেষে কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ অল্পজীবিহেতু, সময়গণনায় পুরুষেও সময়ের অনেক অন্তর হইতে পারে। অথবা ধরিলাম যে, কৃত্তিবাস পণ্ডিত ও যোগেশ্বর পণ্ডিত মূল শ্রীহর্ষ হইতে সমপুরুষ সংখ্যা হেতু উভয়েই সমসময়ের সমান বয়সের লোক; কিন্তু তাহা হইলেও ত তাঁহারা মেলবন্ধনের সময়ের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু, গঙ্গানন্দ ভট্ট তখন বৃদ্ধ পুরুষ; কিন্তু যোগেশ্বর পণ্ডিত অতিশয় বৃদ্ধ, কারণ দেখা যায় যে, মেলবন্ধনের পূর্ব্বেই একে একে তাঁহাকে এগারটী কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছিল এবং শেষ কন্যার বিবাহে

(১) আদিত্য শাখায় কৃত্তিবাসের উৎপত্তি, আর মহাদেব শাখায় যোগেশ্বরের উৎপত্তি। সুতরাং উভয়ে ৮ পুরুষের ছাড়াছাড়ি। যেখানে ৮ পুরুষে ছাড়াছাড়ি, সেখানে কোন্ শাখায় কে কম সময়ে মরে, কে বেশী বাঁচে তাহার ঠিক না থাকায়, কেবলতঃ সমসংখ্যক পুরুষগণনায়, সময়ের অনেক ছাড়াছাড়ি হওয়া যাইতে পারে। তাই বলি, মূল প্রবন্ধভাগে যোগেশ্বরের কথা না পাড়িলেও চলিত। তবে উহা এই স্থলে বলার উদ্দেশ্য বিষয় এই যে, যোগেশ্বরের কথা আমার বক্তব্যের সংরক্ষণ করিতেছে বই বিপরীতে যায় নাই।

মধুচট্টের সঙ্গে দেওয়াতেই তিনি যে দোষলিপ্ত হন, তাহা হইতে তাঁহাকে লইয়া খড়দহ-মেলের সৃষ্টি হয়।——

"ক্ষেমাশ্চট্টমধুবিবাহ সময়ে যোগেশ্বরকাত্তুকং,
কার্য্যৈকাদশতঃ——"　　　　মহাবংশ।

কেবল তাহাই নহে। আরও দেখ, একদিকে যেমন এই সময়ে গঙ্গানন্দ ভট্টের কেবল রাম ও রাঘু নামে দুইটী মাত্র পুত্র হইয়াছে; অন্যদিকে যোগেশ্বরের তখন ১১ কন্যা ও ১১ জামাই এবং মুকুন্দ, শঙ্কর, ত্রিবিক্রম, কমলাপতি, শক্রয়, জানকীনাথ ও রুক্মিণী এই সাত পুত্র। আবার পৌত্রও তাঁহার তখন এক এক সন্তানে কতকগুলি করিয়া হইয়াছিলেন; প্রথম পুত্র মুকুন্দের ৪ পুত্র, দ্বিতীয় পুত্র শঙ্করের ৫ পুত্র এবং ষষ্ঠ পুত্র জানকীনাথের ৪ পুত্র। এখন যে লোকের এতগুলি বংশাবলী, তাহার বয়স কত হইতে পারে বল দেখি? অন্ততঃ আশি বা পঁচাশি, ইহারত কম নহে। অতএব কৃত্তিবাস, যোগেশ্বরের সঙ্গে সমকালে ও সমান বয়স হইলেও, মেলবন্ধনের সময়ের অন্ততঃ ৮০ বৎসর আগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ কৃত্তিবাস যোগেশ্বরের অনেক আগের লোক; যেহেতু কৃত্তিবাস এবং তাঁহার জেঠতুত ভাই গঙ্গানন্দ ভট্টের পিতা লক্ষ্মীধর, অথবা লক্ষ্মীধরের পুত্র ও গঙ্গানন্দের পিতা মনোহর, ইহারা জীবিত থাকিলে ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গানন্দকে ভট্টকে লইয়া কুলবিচার হইত না অথবা দেবীবরের কুলবিচারের মধ্যে অবশ্যই ইহাদের উল্লেখ থাকিত; কিন্তু তাহা না থাকাতে ইহাই নিঃসন্দেহ অবধারিত হইতেছে যে, মেলবন্ধনের বহুপূর্ব্বেই ভাই ও ভাইপো সমেত কৃত্তিবাস গতায়ু হইয়াছেন।

আর এক কথা, উপরের মেলবন্ধনের সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিখিলাম, তাহার অধিকাংশ ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত মহাবংশ দৃষ্টে। মেলবন্ধনের সময় ধ্রুবানন্দের যুবা বয়স। তাহার পর বৃদ্ধাবস্থায় তিনি দেবীবরের অনুরোধে এবং মেলবন্ধন হওয়ার কিছুকাল পরে, কুলীনদিগের বংশ এবং বিবরণ সম্বলিত মহাবংশ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ হইতে, ধ্রুবানন্দের সমসাময়িক বিবরণ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। উহা হইতেই যোগেশ্বরের আদৃশ বংশবিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাবংশে কৃত্তিবাসের খুড়তুত ও জেঠতুত ভাইদের অনেকেরই উত্তরোত্তর কাহারও তিন, কাহারও বা চারি পুরুষের পর্য্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায়;—যেমন গঙ্গানন্দ ভট্টের দুই পুত্র লইয়া ৫ পুরুষ হয়; কিন্তু কৃত্তিবাস ও তাঁহার সহোদর ভাইদের বংশাবলী সম্বন্ধে একেবারে কোনই বিবরণ পাওয়া যায় না। ইহাতে এই কয় প্রকার সিদ্ধান্ত হইতে পারে অর্থাৎ কৃত্তিবাস ও তাঁহার ভাইদের মধ্যে, কেহ হয়ত নিকুল হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বা পুত্রকন্যা উৎপাদনের দ্বারা কুল করিবার পূর্ব্বেই গতায়ু হইয়াছিলেন, অথবা কেহ নিঃসন্তান অবস্থায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস সম্বন্ধে ফুলিয়া

ও চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের বৃদ্ধ লোকের মুখে একরূপ জনপ্রবাদ শুনিয়াছি যে, তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

যাহা হউক, উপরে যাহা লেখা হইল, তদ্দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহ জানা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাস পণ্ডিত দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক মেলবন্ধন হওয়ার অনেক আগেকার লোক। যোগেশ্বর পণ্ডিতের সমকালিক ও সমবয়স্ক হইলেও, মেলবন্ধনের সময়ের অন্ততঃ ৭০ কি ৮০ বর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে হয়। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে যোগেশ্বরেরও অনেক পূর্ব্বে অতি বৃদ্ধ বয়সেই গতাসু হইয়াছেন, তখন উহার উপর ন্যূনকল্পে আর ২০ বৎসর চড়াইয়া, মেলবন্ধনের শতবর্ষ পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের জন্ম ধরিলে অযৌক্তিক হইতে পারে না। এখন মোটের উপর বলিতে গেলে, উপরে যত কিছু বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়-বিষয়ক কেবল এই একটী মাত্র সত্য একরূপ নিঃসন্দেহ ভাবেই অবধারিত হইতেছে যে, দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবন্ধন কার্য্যের ন্যূনাধিক শতবৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখন দেখিতে হইবে যে, মেলবন্ধন হইয়াছিল কখন। অনেকের বিশ্বাস যে, দেবীবর চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক লোক, সুতরাং তাঁহারই সমকালে মেলবন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। কিন্তু এ বিশ্বাসের মূল সূত্র কি? যতদূর দেখিতে পাই ও বুঝিতে পারি, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, ঘটক ধ্রুবা পঞ্চাননের একটা কারিকাই তদ্রূপ বিশ্বাসের মূল সূত্র[১০]। ঐ কারিকায় যে কয়টি ঘটনার উল্লেখ আছে, লেখকের লিখন ভঙ্গীতে পাঠকেরা বুঝিয়া থাকেন, যেন সে কয়টি ঘটনাই এক সময়ে ঘটিয়াছিল।

---

(১০) ধ্রুবা পঞ্চাননের সে কারিকাটি এই—

"চরে ছোড়া বড় ছত্র নিলে তার নাম। কথো বেটা খোটা বুঝি যটে করে ধাম॥
কাণা খোঁড়া বুঝে মত নাম রঘুনাথ। মিথিলার পক্ষ ধরে যে করেছে মাথ॥
তিনমতে তিনপথে কাঁটা দিয়া গেল। আর স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার শিষ্যাদের আর যৌক্তিকাদি যত। প্রাচীন স্মৃতির মত নাশা হাতে হাত॥
শচী ছেলে নিমে বেটা মহামতি বড়। মাতা পত্নী দুই ত্যাগি সন্ন্যাসেতে দড়॥
এই কালে বাড়ে বড় পাড়ু মেল-ধুম। যত বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥
সেই কালে [illegible] নামে এক ছেলে। [illegible] দেবীবর লোক ধারে [illegible]॥
কেহ কেহ [illegible] করে যুক্ত করে ভাগ। তদবধি কুলে আছে কারিগর দাগ॥
দোষ দেখে কুল কাড়ি করি চমৎকার। অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় বার।"

দেবীবরের মেলবন্ধন; নিমাই সন্ন্যাস; রঘুনাথ শিরোমণির চিন্তামণি-দীধিতি এবং রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের [illegible] তত্ত্ব প্রভৃতি এই দুই গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার; এই কয়টি ঘটনা, ধ্রুবা পঞ্চাননের উক্ত কারিকা পাঠে, ঠিক এক সময়ে ঘটিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, সিদ্ধান্তকারককে বিশেষ দোষী করিতে পারা যায় না। ফলতঃ কারিকাটির বাক্যবিন্যাসই এরূপ যে, তাহাতে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু প্রকৃত কথা, ঘটনাগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য নিতান্ত দুর্গম্য ও উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। নিমাইয়ের

বস্তুতঃ দেবীবর কর্ত্তৃক কুলীনদের মেলবন্ধনের কার্য্য, চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাদুর্ভাব হইবার খুব অনেক আগে না হউক, কতক পরিমাণ আগে যে হইয়া গিয়াছে, সে কথা নিঃসংশয়ে বুঝাইবার জন্য, আর একটি বংশাবলীর তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ বংশে, এই কয়জন বল্লালসেন কর্ত্তৃক কুলীন বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন—ভট্টনারায়ণ হইতে ৯ম পুরুষে উৎসাহ ও মহেশ্বর এবং ১১শ পুরুষে কেবল, বামন ও মকরন্দ[১১]। মকরন্দের বংশে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের উৎপত্তি। যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা দেশ হইতে ন্যায়শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যিনি প্রথমকালে চৈতন্যের ন্যায় গুরু ও শেষকালে চৈতন্যের ভক্ত এবং শিষ্য, কেবলের বংশে, সেই বাসুদেবের উৎপত্তি। কিন্তু এখানে আমাদের উল্লেখ প্রয়োজন, মহেশ্বরের বংশাবলী। এই বংশাবলী, মহেশ-মিশ্রের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।—

সন্ন্যাসিকে মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়া, তাঁহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবীবর তাঁহার প্রায় ১০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে এবং রঘুনাথের স্মৃতি ও রঘুনন্দনের স্মৃতি তাঁহার ১৫।২০ বৎসর পরে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং এই কয়টি ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যে প্রায় ১০০।১২০ বৎসরকাল অতীত হইয়াছে এবং তাহা উল্লিখিত প্রবন্ধের আর বিষয় হিসাবে নিতান্ত দেখিবার জিনিষ নহে। কুলাচার্য্যগণের নিজের লেখাতেই জানা যাইতেছে এবং প্রকৃত ঘটনাও ইহা বটে যে, কুলপঞ্জিকাদিগের নিজের উৎপত্তি, বর্ণিত ঘটনাগুলির অনেক পরে এবং শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার কারিকা সকল রচিত।

১১। এ পর্য্যন্ত কৌলীন্য ও বংশাবলী সম্বন্ধে যিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তেই প্রতীত হয় যে,
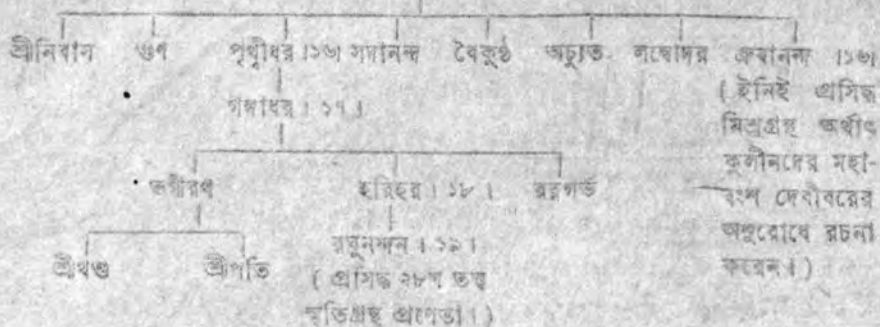
এক্ষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাদুর্ভাবকাল বা জন্ম-সময় রূপ অতি বৃহৎ ও পরিচিত ঘটনার মধ্যস্থল মানদণ্ডরূপে স্থাপন করিয়া, কৃত্তিবাসের সময়ের শেষ মীমাংসা যথাসম্ভব সম্পন্ন করা যাইতেছে।

১৪০৭ শকে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম। উপরে দেখান গিয়াছে যে দেবীবর কর্তৃক মেল বন্ধনের সময় হইতে ন্যূনাধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব। এখন চৈতন্যদেবের জন্ম-শকের কত বৎসর পূর্ব্বে মেলবন্ধন হইয়াছিল, তাহা যদি নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মোটামুটি অথচ নিঃসংশয়রূপে কৃত্তিবাসের কাল নিরূপিত হইতে আর কোনই প্রতিবন্ধক থাকে না। অবশ্য তদ্দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সন তারিখ পর্য্যন্ত যে একেবারে নির্ভুল ও ঠিক হইবে, ইহা বলিতে যাওয়া এবং বিশ্বাস করা, উভয়ই বাতুলের কার্য্য। ইহা সকল সময়ে ও সকল স্থানেই মোটামুটি রকমে হইয়া থাকে। মনে কর যেমন বিদ্যাপতির কাল নির্ণয় করিতে হইবে; অন্যলে বিদ্যাপতির কি জন্ম কি মৃত্যু, কোনটাই ঠিক পাইবার যো নাই। এরূপ স্থলে একটি মাত্র এই ঘটনা

মূল পুস্তক দৃষ্টে প্রায়ই নহে, ঘটকদিগের নিকট কথা সংগ্রহ করিয়া। এই জন্যই দোষ হয় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের প্রদত্ত বংশ তালিকার কোথাও একজন পুরুষ পড়িয়া গিয়াছে; আবার কোথাও বা নিজের এক পুরুষ উর্দ্ধে উঠিয়া,—উপরের পুরুষ বাড়াইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, কোন পুস্তকবিশেষ হইতে উঠাইয়া সে ভুল দেখাইতে ইচ্ছা করি না। এই বংশ তালিকায় আর একটা কথা লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত, অর্থাৎ মুখোপাধ্যায় বংশে, যিনি বল্লালের নিকটে কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন, তিনি মূল পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে ১৪শ পুরুষ। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে যাঁহারা সেই কৌলীন্য পান, তাঁহারা মূল পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে কেহ ৯ম এবং কেহ বা ১১শ পুরুষ, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অবশ্য ইহা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না যে, মুখোপাধ্যায় বংশ হইতে বন্দ্যোবংশের লোকেরা অধিক দীর্ঘজীবি থাকাতেই, উভয়ের মধ্যে এইরূপ পুরুষঘটিত অন্তরতা ঘটিয়াছে। কৌলীন্য প্রাপ্তির পরবর্ত্তী কালেও, মুখো বংশে এইরূপ পুরুষাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে যাঁহারা বন্দ্যোবংশোদ্ভব তাঁহারা মূল পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে কেহ ৩০, কেহ ৩১।৩২ বা ৩৩ পুরুষ; কিন্তু মুখোবংশীয়দের যে স্থলে ৩৭।৩৮।৩৯ পুরুষ পর্য্যন্ত গণনা হইতে দেখা যায়।

পাওয়া যায় যে, ১৩২৩ শকে মিথিলার রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। এখন এই শক চৈতন্যের জন্ম শক ১৪০৭ হইতে বাদ দিলে ৮৪ পাওয়া যায়; সুতরাং উহারই অবলম্বনে সাধারণতঃ ঘোষিত হইয়া থাকে যে, বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৩২৩ শকে বিদ্যাপতি বৃদ্ধ ছিলেন কি যুবা ছিলেন; অথবা তাহার কত বৎসর আগে তাঁহার জন্ম ও কত বর্ষ পরে মৃত্যু হয়, তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। তথাপি যে ঐ শক, বিদ্যাপতির জীবনের কোন এক সময়কে স্পর্শ করিয়াছে, ইহাই মোটের উপর যথেষ্ট ধরিয়া, ঐ ১৩২৩ শককে বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল বলিয়া গণনা করা যায়। যেখানে আদি অন্ত সকলই অনিশ্চিত এবং যেখানে সেই আদি বা অন্ত এতদুভয়ের যে কোন দিক্ উদ্ধার করিবার কোনই উপায় কোন কালে হইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে জীবনকালস্পর্শী কোন একটা সময়ের সন্ধান পাইলেই তাহাকে যথেষ্ট বলিয়া ধরা যায়। সর্ব্বত্র ইহাই রীতি। এখানেও তদ্রূপ। কৃত্তিবাসের যে সময় আমি নির্ণয় করিতে যাইতেছি, তাহা কৃত্তিবাসের কোন এক বা কতক সময়কে স্পর্শ করিলেই যথেষ্ট। এখানে যে প্রকারে ও যে যে উপাদানে কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় করা যাইতেছে, তাহাতে এই প্রবন্ধের পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই কাল কৃত্তিবাসের জীবনকালের কোন এক অংশকে বহুলাংশে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে।

উপরে যে বংশ-তালিকা প্রদান করিয়াছি, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে বন্ধ্যঘটীয় কুলীন বন্দ্যঘটীয় মহেশ্বরবংশ হইতে ১৯ সংখ্যায় উৎপন্ন ২৮শতত্ত্ব স্মৃতিপ্রণেতা রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য, চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী, সুতরাং ২৫ বৎসরের তফাত বাদ হইলেও রঘুনন্দন এবং চৈতন্য এ উভয়ের বয়স প্রায় একই ছিল; যেহেতু আবহমানকাল সহাধ্যায়ীদের মধ্যে সেই নিয়মই দেখা যায়। অতএব এখন রঘুনন্দনের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ধ্রুবানন্দ মিশ্র, রঘুনন্দনের কত আগে উদয় হইয়া মহাবংশ রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই একই বংশের অপর শাখায় দেবীবর ঘটক উৎপন্ন হইয়াই বা রঘুনন্দনের কত আগে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন, ইহা নিরূপণ করিতে পারিলে, সহাধ্যায়ী সম্বন্ধক্রমে চৈতন্যদেবেরও তাহা তত আগে বলিয়া ধরিয়া লইতে আপত্তি হইতে পারে না। তাহার পর চৈতন্যের জন্মরূপ বৃহৎ ও সন্দেহরহিত ঘটনা লক্ষ্য করিয়া আলোচ্য অবশিষ্ট অংশ সহজেই মীমাংসিত হইতে পারিবে।

উপরে প্রদত্ত বংশ-তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, মূল একই বংশের দুই বিভিন্ন শাখায় রঘুনন্দন ও দেবীবরের জন্ম। পুরুষ গণনায়, রঘুনন্দন ১৯ ও দেবীবর ১৮। ইহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, তবে বুঝি দেবীবর ও রঘুনন্দন এক সময়ের লোক, অন্ততঃ দেবীবর এক পুরুষ আগে বলিয়া দেবীবরের বার্দ্ধক্য ও রঘুনন্দনের যৌবনাবস্থা, উভয়ের দেখা শুনা হইয়া থাকিবে। কিন্তু এটা বড়ই ভুল। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি

যে, কোন দুই বংশে, অথবা একই বংশের কোন দুই শাখায়, পুরুষ গণনাতে সংখ্যা সমতা দেখিলেই তাহাদের সমসাময়িকত্ব অবধারণ করা অতি ভ্রমের কার্য্য। বিভিন্ন বংশে বা একই বংশের বিভিন্ন শাখাভেদে, বংশীয়গণের দীর্ঘজীবিত্ব বা অল্পজীবিত্ব হেতু, পুরুষ গণনার সংখ্যা সমতা স্থলে কাল ব্যবধান অতি বিপুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এখানেও দেবীবর পুরুষ সংখ্যায় ১৮ ও রঘুনন্দনে ১৯ হইলেও দেবীবর রঘুনন্দন অপেক্ষা অনেক আগের লোক এবং একথা নিম্নোক্ত বিবরণ দ্বারাও বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতে পারিবে।

উপরে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে, মেলবন্ধনের কিছু কাল পরে, দেবীবর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধ্রুবানন্দ কুলীনদিগের মহাবংশ রচনা করেন। ধ্রুবানন্দ ঐ পুস্তকে উর্দ্ধতন ১০ পুরুষ হইতে নিজের সময়ের, এমন কি, শিশু এবং বালক কুলীন পুরুষদেরও নাম সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ধ্রুবানন্দের নিজের বংশ কুলীনবংশ; তিনি যখন অন্যবংশের বালকের নাম পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই, তখন নিজের বংশের আবাল শিশু পর্য্যন্ত ছাড়িবার কথা নহে। ফলতঃ হইয়াছেও তাহাই। আট ভায়ের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, ধ্রুবানন্দের তৃতীয় ভ্রাতা পৃথ্বীধরের প্রপৌত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের বাপেরা তিন ভাই। ভগীরথ, হরিহর, রত্নগর্ভ। ইহার মধ্যে ভগীরথের দুইটি পুত্রের পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে; কিন্তু রঘুনন্দনের বাপ হরিহর ও খুড়ো রত্নগর্ভ ইহাদের কোন পুত্র সন্তান অ[illegible] কোন প্রকার কুলক্রিয়ার উল্লেখ একেবারেই নাই। সুতরাং এই কারণ হইতে নিঃসন্দেহ জানা যাইতেছে যে, যখন মহাবংশ রচিত হয়; তখন রঘুনন্দনের জন্ম হয় নাই। এদিকে রঘুনন্দনের যখন জেঠার সন্তানের উল্লেখ আছে, তখন রঘুনন্দনের জন্মের যে অনেক আগে মহাবংশ রচিত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহা হইলে কত আগে?— এ প্রশ্নের অনেকটা ঠিক করিতে পারা যাইত, যদি হরিহরের কত সন্তান এবং তাহার মধ্যে রঘুনন্দন আগের কি পরের এটা জানিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা যখন জানিতে পারা যাইতেছে না, তখন মোটের উপর রঘুনন্দনের জন্ম হইবার দশ বৎসর আগে মহাবংশ রচিত বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে না। ধ্রুবানন্দ নিজে অতি বৃদ্ধবয়সে যে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন, সে পক্ষের প্রমাণ—এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি সহোদর জ্যেষ্ঠের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত (অর্থাৎ উপরোক্ত ভগীরথের পুত্রদ্বয়) দেখিতে পান, সে ব্যক্তি কখনও অতিবৃদ্ধ না হইয়া যায় না।

ভাল, মহাবংশ এদিকে হইল যেন রঘুনন্দনের জন্মের দশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এখন কথা হইতেছে যে মেলবন্ধনের কত পরে রচিত।

দেবীবর কুলীনদিগের দোষের সমীকরণ করিয়া ৩৬ মেল বন্ধ করেন। যাহারা মেলী, অর্থাৎ যাঁহাদের লইয়া মেলবন্ধন হয়, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় জীবনকালে নিজ নিজ মেল অনবদ্যায় রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে আর কোন নূতন দোষ

স্পর্শ হইতে দেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের পরে বহু স্থলেই আর সেরূপ রহিল না; তাঁহাদের পুত্র পৌত্রদের মধ্যে অনেকই ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। কেহ নিজের, কেহ পুত্র-কন্যার বিবাহে, মেলের বিপরীত কার্য্য করিতে থাকায়, মেলের মধ্যে নাধবয়াড়ী, দাঁড়ারগ-দামী প্রভৃতি 'যুথ'[22] এবং যজ্ঞেশ্বরী, খড়দিদ্ধান্তি, খড়ুরলী প্রভৃতি 'থাক'[23] সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এখন বুঝ দেখি, ইহাতে কত সময় যায়? একটা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলি। মেল বন্ধনের সময় সুন্দর বাড়ুয্যে যুবাপুরুষ মাত্র; তিনি খড়দহ মেল-ভুক্ত হইয়াছিলেন। মেলভুক্ত হওয়ার পর তাঁহার পুত্র হয় রঘুনন্দন। এই রঘু-নন্দনের কন্যা হইলে, সেই কন্যা লইয়া যজ্ঞেশ্বর মুখটীর সঙ্গে কুল করায়, সেই দোষে খড়দহ মেলে একটা থাক হইল যজ্ঞেশ্বরী। মেলবন্ধনের পর রঘুনন্দনের নাম, তাহার পর তাহার কন্যা হওয়া ও সেই কন্যা বয়স্থা হইলে তবে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে কুল করা, ইহাতে কত বর্ষ গত হইতে পারে? ৩০।৩৫ বৎসরের ত কম নহে। অথচ এই যজ্ঞেশ্বরী থাক এবং তাহার পরে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য থাকেরও উল্লেখ মহাবংশ মধ্যে দেখা যায়। ফলতঃ মহাবংশ মধ্যে ঐরূপ অনেক যুথ ও থাকের উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার দ্বারা অবশ্য এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন আর কি হইতে পারে যে, মেলবন্ধনের প্রায় ৫০ বৎসর পরে ধ্রুবানন্দ মিশ্র কর্ত্তৃক মহাবংশ রচিত হয়।

অতএব মেলবন্ধনের যদি ৫০ বৎসরের পরে এবং রঘুনন্দনের জন্মের যদি ১০ বৎসর আগে মহাবংশ রচিত হয়; তাহা হইলে এবং রঘুনন্দনের জন্মকাল যদি রঘুনন্দনের মহাধামী চৈতন্যদেবের জন্মকালের সঙ্গে এক বলিয়া ধরা যায়, তবে অবশ্যই বলিতে

---

(২২) মেলে মেলে, অর্থাৎ এক মেলের সঙ্গে প্রতিবাদী অপর মেলের সঙ্গে কুলক্রিয়া হইলে, তাহাকে যুথ বলে।

(২৩) মেলী ও অমেল এ উভয়ে কুলক্রিয়া হইলে তাহাকে থাক বলে। ফলতঃ থাক, যে কোন দোষ সংস্পৃষ্ট হইলে, তাহাতেই এক একটা থাক উপস্থিত হইয়া থাকে। যুথের আর ব্যবহার নাই, থাকই প্রবল। অনেক প্রাচীন যুথ এখন থাক বলিয়াই গণিত হয়। কুলীনের সর্ব্বনাশের গোড়াটা কেমন একবার দেখ! একেত মেলবন্ধনের সময় হইতে নিয়ম হয় যে, স্বীয় মেলের বাহিরে বিবাহের আদান প্রদান হইবে না; তাহার পর এই সকল থাক ও যুথ হওয়ায় আরও সঙ্কীর্ণতা হইল যে, স্বীয় স্বীয় থাক বা যুথের ভিতরে ভিন্ন আদান প্রদান চলিবে না; এখন এক এক থাকে ঘর হইল ৫।১০টি, কোথাও বা এমন ঘটিয়া গিয়াছে যে, ২।৩টি। সুতরাং ইহার মধ্যে পাত্রই বা মিলে কৈ এবং কন্যার বিবাহই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং স্বভাব কুলীনদের মধ্যে, বিশেষ এই পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে কএক ঘর কুলীনের বাস আছে, সেইখানেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, বিবাহের অভাবে ৮।১০টা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কুমারী অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র, এরূপ অবস্থায় যেরূপ অনর্থপাত করা উচিত, তাহাও সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি এই নরাধম নরপিশাচ কুলীনদিগের না লজ্জা না ধিক্কার, কিছুই ইহাদের অনুভূতির মধ্যে আইসে না। যে কেহ ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গীয় স্থানের অবস্থা অবলোকন করিবে, সেইই আমার এ কথার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবে।

হইবে যে, চৈতন্তদেবের জন্মের ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক কুলীনদিগের মেলবন্ধন হইয়াছিল।[১৮] পুনশ্চ, পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, মেলবন্ধনের ন্যূনাধিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের জন্ম। তাহা হইলে এই ৫০ এবং ১০০ একত্র করিয়া বলিতে হইতেছে যে, চৈতন্তদেবের জন্মের ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ আনুমানিক ১২৫৭ শকে বা ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুষ গণনাতেও তাহাই পাওয়া যায়। যথা—
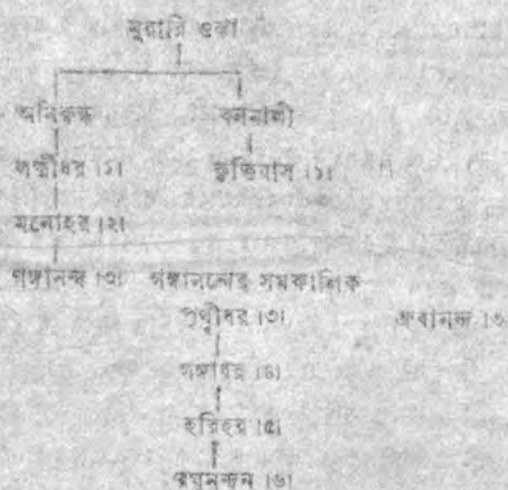
(১৮) পূর্ব্বে একস্থানে ধ্রুবানন্দের কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ঐ কারিকা দৃষ্টে সাধারণে এখন এইরূপ বিশ্বাস প্রায় স্থির দাঁড়াইয়াছে যে, দেবীবর ঘটক চৈতন্তদেবের সমকালে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন। ইহার উপরেও আবার, "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক কৌলীন্তবিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা, কোথাকার একটা ঘটকের নিম্নোক্ত বচন উঠাইয়া, দেবীবরের কাল সম্বন্ধে কি প্রমাণ করিতে চাহেন, তাহা দেখ,—

"নিত্যানন্দের দুই পুত্র গঙ্গা আর বীর। নীধর গঙ্গার স্বামী সর্ব্বশাস্ত্রে স্থির॥
যে কালে বীরের কন্যা পাত্রপিনা যায়। সেই কালে লোকে দেখে দেবীর উদয়॥
সন্ধ্যাবংশে অংশে তার হৈল আবির্ভাব। অক্ষেত বাড়ুরি নাম অতি প্রাদুর্ভাব॥
সঙ্কেত মূর্দ্ধণী পুত্র লোকে পরিচয়। আহারি পঙক্তে দেখ দেবী মহাশয়॥"

ইহার অর্থ, চৈতন্য মহাপ্রভুর সহচর নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী যৎকালে ফুলিয়ার মুখটী পার্ব্বতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে কন্যা দান করেন, সেই সময়ে দেবীবরের উদয় হয়। ইহা ঠিক হইলে দেবীবর চৈতন্যেরও সমকালিক হইলেন না, চৈতন্যের দুই তিন পুরুষ পরে। যে হেতু, নিত্যানন্দ, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক পরে, উপনয়ন ও বিবাহ সংস্কার গ্রহণ করিয়া গৃহী হয়েন এবং চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পরেও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিয়া গৃহধর্ম পালন করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রথম সন্তান নষ্ট হওয়ার পর, বীরভদ্রের জন্ম হয় এবং নিত্যানন্দের পরলোক গমনকালীন বীরভদ্র বালক মাত্র। তাহার পর তিনি বড় হইয়াছেন, তাহার কন্যা হইয়া বয়স্থা হইয়াছে, এবং তবে ত পার্ব্বতী মুখুয্যের সঙ্গে বিবাহ; সুতরাং সে চৈতন্যের ২।৩ পুরুষ পরে নয় ত কি?

ইহার মধ্যে এক পুরুষ ছাড়িয়া দিয়া, ৫ পুরুষে ন্যূনকল্পে প্রতি পুরুষ ৩০ বৎসর ধরিয়া ধরিলেও, ১৫০ বৎসর পাওয়া যায়। সাধারণতঃ তিন পুরুষে একশত বৎসর ধরিয়া ধরার নিয়মই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত সকলেরই বিশ্বাস বিদ্যাপতি ও তাঁহার সমসাময়িক চণ্ডীদাস, এই দুইজন বাঙ্গালার আদিকবি। কিন্তু এখন এই সকল প্রকৃষ্ট স্থির প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাস উঁহাদেরও কত আগের লোক। যদি বলা যায় যে, বিদ্যাপতির যে কাল ধরা যায় অর্থাৎ ১৩২৩ শক, তখন তাঁহার কবি খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, আর কৃত্তিবাসের যে কাল ধরা হইল, অর্থাৎ ১২৫৭ শক, তাহা তাঁহার জন্ম সময়, ভাল তাহাই হউক, এটাও সেই সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতির কবিখ্যাতি হইতে কৃত্তিবাসের জন্ম ৬৬ বৎসর আগে। সুতরাং এস্থলে, অল্প পরিমাণেই হউক, বা অধিক পরিমাণেই হউক, কৃত্তিবাস যে বিদ্যাপতির অপেক্ষা আগের ও প্রাচীন, এ কথায় সন্দেহ থাকে না।

ওদিকে ত ঐ, এদিকে আবার তামাসা দেখ। আর আর মেলের সঙ্গে যুঝিয়া মেলও দেবীবর বাঁধিয়া গেলেন। মেলবন্ধন হওয়ার কতকাল পরে, ফুলিয়া মেলে বিভিন্ন বিভিন্ন দোষ সংস্পর্শ হেতু তাহাতে হইল দুইটী দলের সৃষ্টি,—আধরাগী ও নারায়ণদাসী। তাহাতেও ক্ষান্ত নাই; আরও কতকাল পরে, আরও কত কত দোষ সংস্পর্শে কুলের মধ্যে হইল বিবিধ থাক। সেই সকল থাকের একটার নাম খড়দহী। এ থাকের কারণ কেহ জান কি?—নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র গোস্বামী অসিদ্ধ বটিশাল হেতু, তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া পার্ব্বতী মুখুয্যে দোষগ্রস্ত হওয়ায়, আর কেহ তাঁহার কন্যা বিবাহ করে না। পার্ব্বতী তখন নিরুপায় হইয়া, গঙ্গাতট হরি বন্দ্যকে বলপূর্ব্বক আটকাইয়া, তাঁহাকে কন্যা দান করিল। হরি বন্দ্য কিন্তু জোরে উঠি-য়াই পলাইলেন। এখন সেখানে দৈবগতিকে উপস্থিত ছিল হরি বন্দ্যের পুত্র রামদাস। পার্ব্বতী তখন রাম-দাসকে ধরিয়াই বলিল, "বিবাহ তোমার বাপ করে নাই, তুমিই করিয়াছ, অতএব বাসি বিবাহ কুশণ্ডিকাদি তোমাকে করিতে হইবে;" ইহা বলিয়া বলপূর্ব্বক রামদাসকে দিয়া তাহাই করাইল। ওদিকে পার্ব্বতীর অপর স্ত্রী ও প্রোক্ত কন্যার মাতা এবং হরি বন্দ্যের স্ত্রী ও রামদাসের মাতা, ইঁহারা পরস্পর সহোদরা ভগ্নী। সুতরাং রামদাসকে যাহাকে লইয়া বাসি বিয়া ও কুশণ্ডিকা করিতে হইল, তিনি সম্পর্কে হইলেন রামদাসের আগে ভগ্নী, পরে বিমাতা, শেষে পত্নী। এতদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত বচন কারিকায় আছে—

"আদৌ পিত্রে ততঃ পুত্রে প্রাদাৎ তৎ কন্যকাং দ্বয়োঃ। [illegible]"

"হরিস্তুত রামদাস বিমাতার পতি। সুতারে কন্যা দিয়া হরি গেল তার জাতি॥

কন্যার মাতা রামের মাতা দুই সহোদরা। বিমাতা ভগিনীপতি [illegible]॥" (কুলকারিকা, [illegible])

ইহাকে লইয়া খড়দহী থাক হইল।

দেবীবরের উত্তরকাল সম্বন্ধে লোকে কি বলুক, আমার মতে উদ্ভব ও [illegible]। এ সুধা এই উক্ত অংশেও, [illegible]। প্রাচীন ঘটকেরা যেরূপ বিচার [illegible] ও [illegible] সহিত ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অপেক্ষাকৃত আধুনিক, অবচীন, [illegible] ঘটক তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাদের লেখা সর্ব্বদাই অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হয়।

অতএব বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পৌর্ব্বাপর্য্য এখন এইরূপ দাঁড়াইতেছে। কৃত্তিবাস পণ্ডিত বাঙ্গালার আদিকবি ও লেখক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্যের পিতৃস্থানীয়। দ্বিতীয় স্থানীয় চৈতন্যদেবের ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। তৃতীয় স্থানীয়, চৈতন্যদেবের জন্ম সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা বসুবংশীয় গুণরাজ খাঁ বা মালাধর বসু। চতুর্থ, চৈতন্যদেবের শেষ বয়সের সময় রচিত চৈতন্যভাগবতপ্রণেতা বৃন্দাবন দাস। পঞ্চম, চৈতন্যের অন্তর্দ্ধান হওয়ার কিছু পরে রচিত চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ষষ্ঠ, চণ্ডীমঙ্গল প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী অকবর বাদশাহের সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সপ্তম, পূর্ব্বগত সকল অপেক্ষা অতি মহাকবি ও অতিশয় প্রতিষ্ঠা-শালী, কাশীরাম দাস, বাঙ্গালা মহাভারতের কর্ত্তা। ইনি তিনশত বৎসর হইল, কাটোয়া ও দাঁইহাটের কাছে এবং অধুনা গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত সিদ্ধিগ্রাম নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টম, অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচ ...। কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্দ্রের মধ্যে এই ব্যবধানকালে, বাঙ্গালায় আরও ... ক পুঁথিলেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখের জন্য এখানে স্থানা ... ব।

কৃত্তিবাস সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কবি বলিয়া, কৃত্তিবাসে গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার এবং ছন্দে মাত্রা ও ওজনের ব্যভিচার সর্ব্বত্রই অতিশয় বেশী বেশী এবং ছন্দও এক পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। পয়ারই প্রায় সর্ব্বত্র, ত্রিপদী কখনও সামান্য দুই চারিপদ মাত্র। পয়ারের কোথাও ১৪, কোথাও কোথাও ১৫, ১৬, ১৮ অক্ষর, অথবা তদধিকও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আসল কৃত্তিবাস আপাততঃ পাঠককে দেখাইবার কোনই উপায় নাই।[১৪] যেহেতু, এখন বাজারে যাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া প্রচলিত, তাহাতে কৃত্তিবাসের নামমাত্র আছে, তাঁহার রচনা ভাগ তাহাতে কিছুই নাই বলিলে হয়। তাঁহার নামে যে রামায়ণ বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ জয়গোপালী কাণ্ড। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামে একজন পণ্ডিত, তাঁহার নিকট কৃত্তিবাসের আসল রচনা ভাল না লাগায়, তাহা সংশোধন বা অন্য কথায় খুন খারাপী করিয়া, আসলের পরিবর্ত্তে নিজের রচিত ১৪ অক্ষর পরিমিত পয়ারাদি ছন্দে পুস্তক পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাই এখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ নামে মুদ্রিত ও

(১৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অধুনা কৃত্তিবাসের মূল রচনা যাহা, তাহা উদ্ধার করিবার ভার লইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা যদি এ কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন এবং একটু শীঘ্র শীঘ্র পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সভ্যগণের মধ্যে যিনি যিনি যথার্থ কৃতি হইয়া তাহা সাধন করিয়া তুলিবেন, তাহাতে তাঁহাদের পয়ার মই দেওয়ার বল করিবে নিশ্চয়। আমার নিকট আসল কৃত্তিবাসের যে একখণ্ড হাতের লেখা পুঁথি ছিল, তাহা প্রোক্ত সংস্কারের সাহায্যার্থ সাহিত্য পরিষদে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাহা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তথাপি যাহা কিছু লিখিলাম ও উদ্ধৃত করিলাম, তাহা কেবল স্মৃতি হইতে।

বিক্রীত হইয়া থাকে। কৃত্তিবাসের এমন কোন দুই পংক্তি বোধ হয় নাই, যাহা জয়গোপালের হাতে রূপান্তরিত হইয়া নূতন না হইয়াছে। তবে উহারই মধ্যে অঙ্গদ রায়বারে অঙ্গদ ও ইন্দ্রজিৎ এবং তাহার পর রাবণ ও অঙ্গদে যে কথোপকথন, তাহা এতই সুন্দর ও রসপ্রদ যে, এমন যে জয়গোপাল তিনিও তাহার মধ্যে দেবকৃপায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়াতে, সে অংশের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অতএব বর্ত্তমান মুদ্রিত রামায়ণে, কৃত্তিবাসের আসল রচনার কেবল ঐ অংশ টুকুই দেখিতে পাওয়া যায়। যে রচনার নমুনা ঐ অংশ টুকুতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ধরণে প্রায় সমগ্র রামায়ণই রচিত হইয়াছিল।

প্রকৃত গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার এবং ছন্দের যথেষ্ট ব্যভিচার, এ সকল সত্ত্বেও, যে চিত্তমোহকরী রচনা অঙ্গদ রায়বারে ইন্দ্রজিৎ ও রাবণের সহ অঙ্গদের বাক্‌যুদ্ধে এবং যে রস সেই রচনার সীমা ছাপাইয়া উথলিয়া পড়িতেছে, রামায়ণের সমগ্র রচনাতেই কৃত্তিবাস সেই মোহকরী শক্তির সন্নিবেশ এবং সেই রসমাধুরীর পূর্ণমাত্রায় প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সকল ভাবুক পাঠককে লোহকে চুম্বকবৎ নিরবচ্ছিন্ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। কৃত্তিবাসের এই রামায়ণ, গত পাঁচশত বৎসর হইতে, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলকেই কাব্যাংশে সমান সুমোহিত; ইতিকর্ত্তব্যতাবিষয়ে সমান শিক্ষিত এবং ধর্ম্ম বিষয়ে সমান অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে। কৃত্তিবাসের নামেই এমন একটা মোহকরী আকর্ষণ শক্তি জন্মিয়া গিয়াছে যে, জয়গোপালের হাতে মূল রামায়ণ এতাদৃশ বিকলাঙ্গতা প্রাপ্ত হইলেও, কেবল কৃত্তিবাসের নামের গুণেই তাহা সর্ব্বসাধারণে সমান আদরের সহিত চলিয়া যাইতেছে, এবং যদি কৃত্তিবাসের ভাগ্যে সংস্কার ও মূল উদ্ধার না ঘটে, তাহা হইলেও চিরকাল এইরূপ চলিয়া যাইতে থাকিবে। এই সামান্য ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে কি নিরুপম অমৃতধারাই প্রবাহিত করিয়া গিয়াছে!

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কৃত্তিবাস অনেক নবাব সুবোর কাছে বেড়াইয়াছিলেন এবং শেষে নাকি কোন রাজার অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়াই, রামায়ণ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না; কৃত্তিবাসের জীবনীতে তদ্রূপ বা আর কোন বিশেষ ঘটনা পরিজ্ঞাত হইবার আর কোনই উপায় নাই বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। যাহাহউক, কৃত্তিবাসের রচনা পাঠ করিলে, তিনি যে কখনও কোন নবাব বা রাজা, রাজবাড়ী বা রাজসভা এবং তাহাদের চালচলন দেখিয়াছিলেন, অথবা খড় বা খর-পরিবেষ্টিত, কথঞ্চিৎ বিনপাতক্ষম মধ্যবিত্ত গৃহস্থপূর্ণ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণপল্লী স্বীয় বাসস্থান ফুলিয়া গ্রামের চতুঃসীমার বাহিরে কখনও গিয়াছিলেন, এমনটা যেন মনে আইসে না। যেহেতু তদ্রূপ ক্ষুদ্রপল্লীতে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা এবং তাহারই পরিচয়ের বা উহার অভাবে শুধু ধারণা যাহা কিছু, সেই সকলের দ্বারাই তাঁহার

কাব্য আগাগোড়া চিহ্নিত ও চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। মুড়িমুড়কীপ্রিয় বাঙ্গালীর রাজ-বিভূতির ধারণা যেমন, চাষাভূষার মধ্যে প্রচলিত সামান্য একটা গীত অনুসারে——

"এবার মরে রাজা হব,
খাটে বসে মুড়ি মুড়কীর ধামা খাব।"

কৃত্তিবাসেরও সোণার লঙ্কা এবং রাবণের ত্রিলোকজিৎ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির ধারণাও তদ্রূপ। তদানীন্তন গ্রাম্যমণ্ডল এবং তাহার বাড়ী ঘর ও আসবাব আয়োজনাদির দৃষ্টে তাহা উদ্ভূত। মানুষের মন পার্শ্বস্থ পদার্থনিচয়জাত ভাবরাশিতেই গঠিত হইয়া থাকে এবং যেরূপ গঠিত হয়, মানুষ সেই মানসিক গণ্ডির বাহিরে, কি চিন্তা কি কাজে, কোন প্রকারেই যাইতে সমর্থ হয় না।

হনুমান্ সোণার লঙ্কায় অগ্নি দিতে উঠিয়াই, আগে লাফ দিয়া বড় ঘরের চালের উপর পড়িল। ফলতঃ কি রাবণ, কি বিভীষণ, কি অন্য কেহ, সোণার লঙ্কার চৌরী—খড়ুয়া ঘর সকলেরই, কুম্ভকর্ণের ঘরখানাও একখান অতি বড় বাঙ্গলা চৌচালা। অথবা, এখনও যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, কাহারও বংশে নারিকেল গাছ পুঁতিতে নাই, কাহারও বা চণ্ডীমণ্ডপ করিলে বংশ নষ্ট হয়, সেইরূপ, কে জানে এদের, এ রাবণের বংশেও, পাকা ঘর করিতে বুঝি পূর্ব্বপুরুষের মানা ছিল, অথবা পাকাঘর করিলে বুঝি সহিত না কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না।—নতুবা এমন একটা সোণার লঙ্কাখানও এত বড় ত্রিলোকজিৎ ঐশ্বর্য্যটা, তাহার মধ্যেও, বলিব কি রাবণেরও, বলি—কেবল খড়ুয়া ঘর। আবার দেখ, অঙ্গদ রায়বারে লাফ ঝাঁপ দিয়া ত অঙ্গদ হঠাৎ বেধড়ক রাজসভায় উপস্থিত; তাহার পর লাঙ্গুলের কুণ্ডলী করিয়া অঙ্গদের উচ্চাসন করার কথাটাও থাকুক; অঙ্গদ রাবণে ঠোকাঠুকিও যাউক; শেষে অঙ্গদ রাবণে জড়াজড়ী ও যুদ্ধ। শেষে অঙ্গদ রাবণকে ফেলিয়া দিয়া ও তাহার গায়ে মুতিয়া,—মুকুট লইয়া পলাইয়ে পার। তখন রাবণের দশা কি হইল?—রাবণ অধোমুখে গায়ের ধুলা ঝাড়িতেছেন ও পাত্রমিত্র সভাসদ্গণ কেহ যে তাঁহাকে সাহায্য করে নাই, তাই বলিয়া সকলকে গালি পাড়িতেছেন। এত বড় ত্রিলোকজিৎ সোণার লঙ্কাপুরীর রাজসভাটা, তাহাতে এতও ধূলা! সেকালে আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে, এখনকার মত শতরঞ্চি কম্বল বা গদির অভাবে (তাহা কিনিতেও না সতরঞ্চও কেনার সামর্থ্য ছিল না অনেকের), চৌলঘরে বা চণ্ডীমণ্ডপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাসন বিছাইয়া গ্রাম্যলোকের জমায়েত বা সভাধিবেশন হইত; তাহাতে অবশ্য ধুলার অভাব কিছুমাত্রই থাকিত না। তাহাই কি কৃত্তিবাসের আদর্শ এবং রাবণের সভাও কি সেইরূপ ছিল?

আবার দেখ,—কালনেমি বধে, কালনেমির মুণ্ডটা বধে ছিঁড়িয়া, হনুমানের মনে হইল যে, উহা মেজে জড়াইয়া ও ছুড়িয়া দিয়া রাবণের সম্মুখে লইয়া ফেলেন। এদিকে সন্ধ্যারাত্র, ঘুট ঘুট অন্ধকার, দিব্য মোলায়েম ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে, এমন

সময়ে আয়েসবিলাসী রাবণরাজা কেন না পাত্র মিত্র লইয়া সভা করিয়া বসিবেন। সভার কার্য্যও চলিতেছে পুরা দরবারে; এমন সময়ে কি একটা হঠাৎ আসিয়া সভাস্থলে ঝুপ করিয়া পড়িল। কি এটা, দেখ দেখ,—কিন্তু দেখে কে? রাজসভায় আলো নাই; সভায় ত নাই, নিকটেও বোধ হয় ছিল না, নতুবা তাহার অপেক্ষা না করিয়াই সকলে জিনিসটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে যাইবেন কে? যাহা হউক, তখন নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া স্থির হইল, মুণ্ডটা কালনেমিরই বটে। বাড়ীর বাহির প্রাঙ্গণের পার্শ্বে দূর্ব্বা আস্তরণের উপর, দাঁকাটা তামাকের হুঁকা হাতে ও সান্ধ্যসমীরে ঘুট ঘুট অন্ধকারে গা ঢাকিয়া পাড়াগাঁয়ের পাড়াগেঁয়ে গৃহপালিত লোকদের আড্ডা কখনও কি পাঠকদিগের লক্ষ্যভূত হইয়াছিল? সেকালে উহা সাধারণ ছিল, একালেও এখন না আছে এমন নহে। রাবণের রাজ্যসভাতে ও তাহাতে বিশেষ কি?

কৃত্তিবাসের উপমাও তাঁহার পাড়াগাঁ ফুলিয়ার দৃশ্য দৃষ্টেই গৃহীত। কুম্ভকর্ণের নাকের ছিদ্র কত বড়?—না যেন এক এক খান পঁচিশের বন্দ ঘর। এখানে একটু বলার দরকার যে, আমাদের এই নদীয়াজেলায় যে-সকল গৃহস্থের খড়ুয়া ঘরে বাস; তাহাদের ঘরের মধ্যে পঁচিশের বন্দ ঘরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাই বলি, যে যত বলুক এবং কৃত্তিবাসের রাজারাজড়া ও নবাবস্থবোর সভায় যাতায়াতের যতই প্রমাণ দিউক; আমি কিন্তু কেবল তাঁহার কাব্যপাঠ করিয়াই বলিতে পারি যে, কৃত্তিবাস তাঁহার বাসস্থান সেই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণপল্লি ফুলিয়ার চতুঃসীমার বাহিরে কখনও যান নাই; এবং যদিই বা কোথাও গিয়া থাকেন, তাহাও সেই ফুলিয়ার ন্যায় সমান অবস্থাপন্ন স্থান।

উপরে বলিয়াছি যে, কৃত্তিবাসের বিষয় ধারণা, গ্রাম্যধারণার কেবল সম্প্রসারণ নহে; অধিকাংশ স্থলে তাহা উন্মাদগ্রস্তবৎ স্ফীত। অনেক দিনের পর কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গে উত্থিত, সুতরাং অতি ক্ষুধার্ত্ত; অনেক আহার করিলেন। আহারীয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কুম্ভকর্ণ যে খাড়া চৌরী খড়ুয়া ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, তেমন দশটা চৌরীতেও তাহার স্থান সঙ্কুলান হয় না। এত আহারের পর মুখশুদ্ধির জন্য কাজেই একটা পাণ খাওয়া উচিত। কাজেই কৃত্তিবাসও কুম্ভকর্ণকে পাণ খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন। সে পাণ খাওয়া কিরূপ?

"পাঁচ সাত ভারা গুয়া খাইল আটি দশ খোবা পাণ।
তবু না পুরিল বীরের বাম চোয়াল খান॥
কত মণ খয়ের খাইল যেন খুটের রাশি।
মুখেতে ঢালিল চূণ শতেক কলসী॥"

কি সর্ব্বনেশে পাণ খাওয়া! এতদ্ব্যতীত কৃত্তিবাসের পয়ার ও তাহার অক্ষর সংখ্যার প্রতিও দৃষ্টি করা উচিত। তাহার যুদ্ধের বাদ্যোদ্যম হইতেছে, বিশ লক্ষ ঢাক, দশ লক্ষ মাদল, ত্রিশ লক্ষ সানাই ইত্যাদি সরঞ্জাম ত আছেই। আমাদের দেশী বাজনায়, সকলের

অপেক্ষা) কাঁসির আদরটা বড়ই কম, আর একটা বা জোর দুইটা হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু এখানে কাঁসিরই কত, তাহা একবার দেখ ;—

"আট লক্ষ ঢোল বাজে নয় লক্ষ কাঁসি।
দগড়ে ডগড় দিছে তিন লক্ষ ছাঁসি।"

আর দগড়ে যত কাজ নাই, এই পর্য্যন্তই থাকুক। এই ত ব্যাপার, কিন্তু তথাপি কৃত্তিবাসের প্রতি অক্ষর কবিত্বময়ী এবং সমস্ত কবিতার রস গড়াইয়া পড়িতেছে। ফলতঃ কৃত্তিবাসের আদিম রচনা পড়িয়া যে অসীম আমোদ ও আনন্দ পাওয়া যায় ও তাহাতে মনের যে এক অতি সুন্দর তৃপ্তির উদয় হয়, তাহা বাঙ্গালার আর কোন কাব্য পড়িয়া হয় না। বাঙ্গালার আদিলেখক এবং আদিকবির পক্ষে তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। কৃত্তিবাসের কাব্য সমালোচনা আমার এখানে উদ্দেশ্য নহে, তবে প্রসঙ্গক্রমে যা-দুই একটা কথা বলা গেল এই মাত্র। তাহাই আপাততঃ যথেষ্ট হউক।

উপরেই বলিয়াছি যে, কৃত্তিবাসের জীবনী সম্বন্ধে এখন, এই সুদূর সময়ে কোন বিশেষ ঘটনাই উদ্ধার হইবার উপায় নাই। তাহা সর্ব্বগ্রাসকারী অনন্ত কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কৃত্তিবাস হইতে ঊর্দ্ধে পঞ্চম পুরুষে নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়(১৩) প্রথম ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি করেন এবং সেই হইতে ইহাদের ফুলিয়া গ্রামে বাস। নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের বাসস্থান হইতে চারিক্রোশ দূরে এবং রাণাঘাট হইতে একক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমকোণে ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত। কৃত্তিবাসের সময়ে এবং তাঁহারও অনেক দিন পর পর্য্যন্ত, ফুলিয়া গ্রামের নীচে দিয়া ভাগীরথী গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন, এখনও সুস্পষ্টরূপে গঙ্গার প্রাচীনগর্ভ বা খাত বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানে গঙ্গা ফুলিয়ার দুই ক্রোশ পশ্চিমে বয়ড়া গ্রামের নীচে প্রবাহিত। এই বয়ড়ায় একটী ডাকঘর আছে, তাহা পূর্ব্বে ফুলিয়ার সীমানায় ছিল। কিন্তু তথায় ডাকঘরের প্রতি স্থানীয় লোকের অসদ্ব্যবহার হেতু, তাহা উঠিয়া বয়ড়াগ্রামে আসিয়াছে

---

(১৩) এই মুখোপাধ্যায় শব্দ যদিও ব্যবহার করিলাম বটে, কিন্তু মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় আদি "উপাধ্যায়" শব্দযুক্ত পদবী দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবন্ধনের পূর্ব্বে ছিল না। তখনকার পদবী মুখটী, বন্দ্যঘটী, চট্ট ইত্যাদি। মেলবন্ধনের সময় সর্ব্বানন্দ মুখো, যোগেশ্বর মুখো এবং এই প্রবন্ধ লেখকের পূর্ব্ব পুরুষ সর্ব্বানন্দ (সবাই) বন্দ্য প্রভৃতি পাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি হেতু, আপন আপন উপাধিতে "উপাধ্যায়" যোগ করিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হয়েন। ক্রমে ইহা মুখ, বন্দ্য, চট্ট ও গাঙ্গুলী বংশপরম্পরায় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তখনকার হিসাবে থাকিতে গেলে, নৃসিংহ মুখটী বলাই উচিত ছিল।

এবং ফুলিয়ার যে সুত্র সম্বন্ধ, তাহার চিহ্নস্বরূপ ফুলিয়ার নাম যোগ করিয়া, ডাকঘরটির এখন নামকরণ হইয়াছে "ফুলিয়া বয়ড়া" ডাকঘর।

যে ফুলিয়া অতিশয় ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান এবং যেখানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতি কদাচিৎ স্থান পাইত; যেখানে এত ঘনভাবে, যে চালে চালে কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল এবং যে গ্রামের নামে, কুলীনদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মেল দুইটীর মধ্যে একতরের নামকরণ হইয়াছিল "ফুলিয়া মেল"; সেই ফুলিয়া এখন কালের কুটিল গতিতে জনশূন্য ও জঙ্গলময় হইয়াছে। যেমন তেমন জঙ্গল নহে, তথায় ব্যাঘ্রাদি বন্যপশু সকল নির্ব্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দ মনে বসবাস করিয়া থাকে। দিবাভাগেও তথায় একক কেহ যাইতে সাহস করে কি না সন্দেহ।

গ্রামের (গ্রাম আর তথায় এখন কোথায়?) এত দুর্দ্দশার মধ্যে একটা সুখের কথা এই যে, যে স্থানে কৃত্তিবাসের বাসগৃহ ছিল; সর্ব্বসাধারণে এখনও তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও লোকে সেই জঙ্গল পতিত ভূখণ্ডকে কৃত্তিবাসের ভিটা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। জঙ্গলও সাধারণ নহে।—এ ভিটায় এমন জঙ্গল যে এখন লোকের কোন গাছ গাছড়ার দরকার হইলে, যদি কোথাও খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তবে শেষ অনুসন্ধান স্থান কৃত্তিবাসের ভিটা;—"কোথাও না পাইয়া থাক, কৃত্তিবাসের ভিটায় খোঁজ করিয়া দেখ, অবশ্য পাইবে।" ফলতঃ কৃত্তিবাসের পুণ্য প্রভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, যে সকল গাছ গাছড়া গ্রাম্যলোকের গ্রাম্যঔষধে সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে; তাহা প্রায় সমস্তই কৃত্তিবাসের ভিটায় খুঁজিলে পাওয়া যায়।

ভক্তশিরোমণি বৈষ্ণবপ্রধান হরিদাস ঠাকুরও বহুদিন ফুলিয়া গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। যেখানে কৃত্তিবাস ঠাকুরের ভিটা, সর্ব্বসাধারণে তাহারই সংলগ্ন এক ভূমি খণ্ডকে হরিদাসের পাট বা আশ্রমস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। হরিভক্ত হরিদাস বোধ হয়, যেন সেই অসাধারণ ব্যক্তি রামচরিতপ্রণেতাকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়াই তাহার বসতস্থানের সান্নিধ্যকে পরম পুণ্যপ্রদ ভাবিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তথায় আপনার আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। যেমন কৃত্তিবাস, তেমনি হরিদাস; সুতরাং তদুভয়ের বাসস্থানের একত্র সন্নিবেশ অতি উপযুক্তই হইয়াছে বলিতে হইবে। রতনেই রতন মিলিয়া থাকে, একথার সম্পূর্ণ সার্থকতা যে এইখানে, তাহা বলাই বাহুল্য।

মধ্যে একবার কৃত্তিবাসের ভিটায় একটা কীর্ত্তিস্থাপনের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য কতকটা চাঁদাও স্বাক্ষরিত এবং আদায় হইয়াছিল। তাহার পর জানিনা, কেমন করিয়া তাহা আস্তে আস্তে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। যাহা হউক, নির্ব্বাণ হওয়াতে আমি দুঃখিত নহি, বরং প্রভূত সুখী, যেহেতু তাহাতে আমাদের জাতীয় চরিত্র রক্ষিত হইয়াছে। আন্দোলন সময়ে, আমার বড়ই আশঙ্কা হইয়াছিল যে,

পাছে এইবার বুঝি তাঁহার গুণ প্রতিষ্ঠায়, আমাদের চিরপ্রচলিত জাতীয় চরিত্রে কলঙ্কচিহ্ন লাগিয়া যায়। তা হইবে কেন?

কয়েক বৎসর হইল, বঙ্গবাসীতে কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় করিয়া যে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধ তাহারই সম্প্রসারণ মাত্র। ইতি।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

এই প্রবন্ধ লেখা শেষ হওয়ার কিছুকাল পর, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামে একখানি পুস্তক আমার হাতে পৌঁছে। তাহাতে ১৪২০ শকের হাতের লেখা রামায়ণ পুঁথি হইতে কৃত্তিবাসের নিজ কৃত আত্মবিবরণ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন মনে হইতেছে, ইহা বুঝি সেই সাপের পা ও ডুমুরের ফুল স্বরূপ শ্রীযুক্ত হারাধনদত্ত ভক্তিনিধির প্রাচীন রামায়ণের পুথি, যাহার অস্তিত্ব আছে, অথচ লোকের চর্ম্মচক্ষে ভিড়ে না! যাহা হউক, পরিচয়টার উৎপত্তি যেমন করিয়াই হউক ও যেখান হইতেই তাহা উদ্ধৃত করা হউক, উহা পড়িলে কিন্তু যেন খাটি বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। উহার মধ্যে অনেক কথা আছে, যাহা এই প্রবন্ধোক্ত অনেক কথার সহ মিলে এবং উক্ত সময়টাও, এই প্রবন্ধ নিরূপিত সময়ের সহ কতকাংশ একতাযুক্ত দৃষ্ট হয়। এই সকল কারণে, পরিচয়টা এখানে উদ্ধৃত করার বিশেষ আবশ্যকতা বিবেচনা করি।

> পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ[1] মহারাজা।
> তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
> দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
> বঙ্গভাগে[2] ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
> বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
> বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥

---

(১) ইনি সেই দনৌজা-মাধব, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রপৌত্র। এদিকে নৃসিংহ মুখটী ওঝাও, লক্ষ্মণসেন কর্তৃক পূজিত কুলীন আদিত মুখটীর প্রপৌত্র। সুতরাং দনৌজামাধব ও নৃসিংহ মুখটী, এ উভয়েরই সময়ের সমতা হইতেছে।

(২) পূর্ব্ববাঙ্গালায়।

সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিগে চায়।
রাত্রিকাল হৈল ওঝা শুতিল তথায়॥
পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুক্কুরের ধ্বনি॥
কুক্কুরের ধ্বনি শুনি চারিদিগে চায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
মালি জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এ থানা।[৩]
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥[৪]
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য়ে সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাঁহার তনয়॥[৫]
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাতপুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥[৬]

৩। ফুলিয়ার সংলগ্ন গ্রাম মালিপোতা; এ দুয়ে এক গ্রামে যেন দুই বিভিন্ন পাড়া। জানিনা, কথিত মালিজাতির বাসস্থানের সঙ্গে, এই "মালিপোতা" অর্থাৎ মালির ভিটা যুক্ত গ্রামের কোন সম্বন্ধ আছে কি না।

৪। দক্ষিণ পশ্চিমে এখনও গঙ্গার সাবেক খাদের চিহ্ন আছে। অন্য সময়ে এই খাদ শুকনা থাকে। বর্ষার যে বৎসর বেশী জল বাড়ে, সে বৎসর গঙ্গা প্লাবিত হইয়া এই খাদে প্রবেশ করিলে, সে জলকে এখনও গঙ্গাজল বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

৫। মুং মুং নৃসিংহস্যো গাথো।—

"————তৎসুতাশ্চাতিমানসাঃ।
মুরারিশ্চাপ গোবিন্দঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যসমা ইমে॥"

এখানে মিল হইল। ধ্রুবানন্দ। মহাবংশ।

৬। মুং মুং গর্ভেশ্বরস্যো মুরারিঃ।—

"————————অষ্টৌ তত সুতাবরাঃ।
ভৈরবঃ গৌরিমদনোঽনিরুদ্ধো বনমালিকঃ।
মার্কণ্ডেয়ো নিত্যানন্দ বাসনংশতি মাহ্যোত্তমঃ॥" ধ্রুবানন্দ। মহাবংশ।

এখানে মিলিল না। মহাবংশ মতে ৮ পুত্রের নাম ভৈরব, গৌরী, মদন, অনিরুদ্ধ, বনমালী, মার্কণ্ডেয়,

রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥
গোবিন্দ [illegible]আদিত্য ঠাকুর বহুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর॥ ৯
ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল। ১০
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাহার॥
মুখটী বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জন শিখে যাহার আচার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্যবারে শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলেন কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ। ১১
হেন কালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারে উষা পোহালে [illegible]
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গা[illegible]
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্[illegible]
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে॥

৯। গোবিন্দের পুত্রাদির পরিচয়ও পাইলাম না।

১০। 'গজপতাবপতিষ্ঠ তেমন্থোবিনমন্তথা।' ভৈরবতনয় এতে——"প্রবন্দ। মহাবল। প্রধানে নিলিল।

১১। বার বৎসরের ছেলে বড়গঙ্গা অর্থাৎ পদ্মা পার হইয়া উত্তরদেশে পড়িতে যাওয়া, বিশেষতঃ তখনকার কালে, কিছু যেন আশ্চর্য্য বোধ হয়। হয়ত অপর কোন আত্মীয় ব্যক্তিও উত্তরদেশে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, সেই সূত্রে কৃত্তিবাসও তথায় গমন করিয়া থাকিবে। তখনও কি নবদ্বীপের বিদ্যা-বিষয়ক খ্যাতি প্রবল হয় নাই? বোধ হয় না হওয়ার কথা, নতুবা দুয়ারে নবদ্বীপ ফেলিয়া, কতক্রোশ দূরে সেই দুর্গম উত্তরদেশে অল্পবয়স্ক বালক পড়িতে যাইবে কেন?

বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যা সমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উগ্রাচার।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরুস্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥[১২]
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্ত ঘটি বেলা যখন দেওয়ালে পড়ে কাঠি।
শীঘ্র ধায়ি আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি॥

১২। এ কোন্ হিন্দু গৌড়েশ্বর? মুসলমান অধিকার হওয়ার পর একজন মাত্র হিন্দু গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তিনি রাজা গণেশ। তাঁহার প্রকৃত নাম কংসনারায়ণ। "কান" মুসলমান ও ইংরাজ ঐতিহাসিকের হাতে পড়িয়া, "কানিস" "গানিস" ও অবশেষে "গণেশ" পরিণত হইয়াছে। ইহার রাজত্বকাল ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ খৃঃ পর্য্যন্ত। প্রবন্ধে কৃত্তিবাসের আনুমানিক জন্মকাল ১৩৩৫ খৃঃ ধরা হইল, সুতরাং এখন তিনি যদি সত্য সত্যই [illegible] রায়ণের কাছে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বয়স তখন ৫০ পঞ্চাশ বা তাহারই একটু এ[illegible] হইবে। উদ্ধৃত পদ্যে দেখা যাইতেছে যে, তিনি পাঠ সমাপন করিয়া আগে 'ঘরকে' আসেন ও তাহার পরে গৌড়েশ্বরের সহিত দেখা করেন। সুতরাং আগে ঘরে বসিয়া গৌড়ে হিন্দুরাজার খবর পাইলে তবে গৌড়ে যান। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান রাজত্বপ্রবাহের মধ্যে, কংসনারায়ণের অতি বিরল সাত বৎসরের রাজত্বের খবর কি, সে কালের ন্যায় সেই খবরাখবরশূন্য সময়ে, সুদূর আঁধিয়ারা পল্লী ফুলিয়া পর্য্যন্ত যথাসময়ে পৌঁছিয়াছিল? কে জানে,—কেমন যেন বিশ্বাস হয় না। তাহার পর গৌড়েশ্বরের রাজসভা-বর্ণনে দেখা যায় যে, তথা হইতে মুসলমান যেন একেবারে নির্ব্বাসিত। কিন্তু বস্তুতঃ তখনও মুসলমানের সংঘট্ট এত বেশী যে, কংসনারায়ণের মৃত্যুর পরেই, তাঁহার পুত্র আর হিন্দুয়ানী রাখিতে না পারিয়া অবিলম্বে মুসলমান হইয়াছিলেন। এদিকে আর এক কথা, সেন রাজবংশ গৌড়চ্যুত হইলেও, অনেকদিন পর্য্যন্ত আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলিয়া ঘোষিত করিতেন। এমন কি, তাঁহারা বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে উঠিয়া আসার পরেও, আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলাইতে ত্রুটি করিতেন না, যেহেতু গৌড় অর্থে তখন কেবল গৌড় নগর নহে; বাঙ্গালা দেশও গৌড় আখ্যায় আখ্যাত ছিল। কৃত্তিবাসের এ রাজাভেট বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের গৌড়েশ্বর নহে কি? আমার বোধ হয় যেন তাই। যে পুস্তক হইতে পদ্যাংশ উঠাইলাম, তাহার প্রবন্ধকার কিন্তু বলেন যে, এ গৌড়েশ্বর কংসনারায়ণ। হয়, ভালই। তাহা হইলেও, আমা কর্ত্তৃক লিখিত কৃত্তিবাসের জন্মাব্দের সঙ্গে গরমিল হইতেছে না।

কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্বরায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুমার॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্য গীত সর্ব্বলোকে হাসে।
চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আবাসে॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে॥
রাজা আদেশ হৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥

পঞ্চ দেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে স্ফুরে ॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥
যত যত মহা পণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥
সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী বরে ॥

যাহা হউক, এ পত্রের অনেক কথাই যখন কুলাচার্য্যের গ্রন্থের সহিত মিলিতেছে, তখন উদ্ধৃত পত্রটাকে কৃত্তিবাসের নিজ হস্ত পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করার পক্ষে বড় একটা প্রতিবন্ধকতা দেখা যাইতেছে না। তবে বংশাবলী সম্বন্ধে যে দুই চারি কথায় অমিল হইল, তাহা এরূপেও মীমাংসিত হইতে পারে। একালের ন্যায় সেকালেও কুলীন-ঠাকুরদের দূর দূর স্থানে অনেক বিবাহ হইত এবং এখনকার এক মায়ের সন্তান অন্য মায়ের সন্তানদের খোঁজ না রাখার ন্যায় তখনও সম্ভবতঃ সকলে সকলের খোঁজ রাখিত না। এক বাপের বিবিধ স্ত্রীর সন্তান পরস্পর খোঁজ না রাখিলেও, ঘটক ঠাকুরদের কাছে কিন্তু কোনটাই এড়াইয়া যাইতে পারিত না; যেহেতু তাহাদের ব্যবসায়ই ছিল তাহার সন্ধান রাখা। সুতরাং বংশাবলী সম্বন্ধে কৃত্তিবাসের সহিত কুলাচার্য্যের দুই চারি কথা তফাতবাদ হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব পত্রটা যেখানেই পাওয়া যাউক ও যেখান হইতেই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" গ্রন্থকার উহার উদ্ধার করুন, উহাকে খাঁটি জিনিষ বলিয়াই যেন আমার বিশ্বাস হইতেছে।

পত্রটীর মধ্যে কৃত্তিবাসের জীবনী সম্বন্ধে যে যে ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা পাঠকেরা পত্রটী পাঠ করিয়াই জানিতে পারিবেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমার আর বেশী কিছু বলিতে যাওয়ার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।

কৃত্তিবাস তবে সত্যসত্যই রাজা ও রাজদরবার দেখিয়াছিলেন। দেখিলেও তাহা নিক, বিশেষতঃ কৃত্তিবাসের এ রাজাও মাঘ মাসের শীত নিবারণের জন্য রৌদ্র পোহাইয়া থাকেন। অতএব এখনও বলি যে এ সকল সত্ত্বেও, গোঁড়ে কবির গোঁয়ে বুদ্ধি ও ধারণার ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মন্তব্য।

আমাদের পরম সুহৃদ শ্রদ্ধাস্পদ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর গবেষণা, প্রভূত অনুসন্ধান ও যথেষ্ট পরিশ্রমের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ পরিষদের প্রথমাবস্থা হইতে যে মহাকবির লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধার করিবার জন্য আমরা যত্নবান্ হইয়াছি, সেই কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যিনি এতাদৃশ পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক সুবৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের উপকৃত করিয়াছেন, তিনি যে সাহিত্য পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিনি কৃত্তিবাস পণ্ডিত সম্বন্ধে যেরূপ সুবিস্তৃত আলোচনার অবতারণ করিয়াছেন, তাহা সকলই যে অভ্রান্ত সত্য ও সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে, তাহা মনে করাও ভুল। কিন্তু এরূপ প্রবন্ধ যতদূর সম্ভব, নির্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? এই কারণে আমরা সাহিত্যানুরাগী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রবন্ধের স্থানবিশেষে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু কার্য্যগতিকে তাঁহার সময়াভাব ঘটায় তিনি প্রবন্ধ তদবস্থায় প্রকাশ এবং যেরূপ পরিবর্ত্তন বা সংশোধন আবশ্যক, তাহাই স্বতন্ত্রভাবে আমাদের মন্তব্য সহ প্রকাশ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে বর্ত্তমান প্রস্তাব লিখিত হইল। এই মন্তব্য পাঠ করিয়া এরূপ কেহ না মনে করেন যে আমরা প্রফুল্লবাবুর প্রবন্ধের সমালোচনা বা প্রতিবাদ করিতেছি। আমরা স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যতদূর প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই প্রফুল্লবাবু তাঁহার প্রবন্ধে উপস্থিত করিয়াছেন। যে যে বিষয় তিনি উল্লেখ করেন নাই অথচ যেগুলি আমরা উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিয়াছি, সেই সেই বিষয়ই বর্ত্তমান প্রস্তাবে আলোচিত হইল।

প্রফুল্লবাবু প্রথমে আদিশূর ও সেনবংশীয় রাজগণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা কৃত্তিবাস প্রবন্ধের প্রকৃত বিষয়ীভূত না হইলেও ঐতিহাসিকগণের বিশেষ প্রীতিকর হইতে পারে ভাবিয়া এ সম্বন্ধে আমরাও দুই এক কথা বলিতেছি—

পালবংশের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে আদিশূর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, একথা লইয়া বহুদিন হইতেই আমরা আলোচনা করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাসেও আদিশূর সম্বন্ধে একটী বিশেষ ভ্রম চলিতেছিল। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয়, গতবর্ষের সংস্করণে তাঁহার ইতিহাসে ঐ ভ্রম সংশোধন করা হইয়াছে। তবে আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়নের প্রকৃতকাল নির্ণয় সম্বন্ধে বড়ই মতভেদ চলিতেছিল, প্রফুল্লবাবু তাহার সমালোচনা করিয়া যে সুন্দর মত প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গের ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ দিবেন।

অপরাপর বিশেষ প্রমাণাভাবে তাহাই প্রকৃত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, অর্থাৎ আদিশূর ৬৫৪ শকে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। আদিশূরের বংশ বহুদিন গৌড়দেশে রাজত্ব করেন, তৎপরে পালবংশ, তৎপরে সেনবংশের অভ্যুদয়। এই সেনবংশীয় তৃতীয় রাজা লক্ষ্মণসেনকে লইয়াই কথা।

প্রফুল্লবাবুর মতে,—মহারাজ লক্ষ্মণসেন ১১৬৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৭ বর্ষ রাজত্ব করেন। আমরাও এক সময় ইহাই প্রকৃত বলিয়া জানিতাম। একথা বহুদিন হইল, আমরা লিখিয়াছি। এরূপ স্থির করিবার কারণ এই—

লক্ষ্মণসেনের মহামাণ্ডলিক বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস সূক্তিকর্ণামৃত নামক একখানি কবিতাসংগ্রহ সঙ্কলন করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রকাশ করেন যে এই গ্রন্থ ১১২৭ শকে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণসেনের 'রসৈকবিংশে' প্রকাশিত হয়। সুতরাং সেই সময়ের লোক যখন লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল উল্লেখ করিতেছেন, তখন অবশ্যই যেন মনে হয়, লক্ষ্মণসেন ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীধরদাসের সেই বচনটী এই—

> "শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেত দশশতে শরদাম্
> শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশে। *
> শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে॥"[1]

কোন পণ্ডিত আমাদের নিকট সূক্তিকর্ণামৃতের বচন পাঠাইয়া দেন, তাহা এই—

> "শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশশতে শরদাম্।
> শ্রীমল্লক্ষ্মণক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে॥"[2]

আবার 'সেনরাজগণ' প্রণেতা বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ এই বচনটী এইরূপ উদ্ধার করিয়াছেন—

> "শা[illegible] সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশশতে শরদাং।
> শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনাক্ষিতিপস্য হি রসরসে চাব্দে॥"[3]

দেখুন, উপরে এক পুস্তকের তিনটী পাঠ উদ্ধৃত করিলাম। ইহাদের মধ্যে কোন্ পাঠ আমরা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? আমাদের বিবেচনায় প্রথম চরণ ব্যতীত অপর চরণ কোনটীরই ঠিক নহে। উক্ত বচনদ্বারা এইমাত্র জানা যাইতেছে যে ১১২৭ শকে অর্থাৎ ১২০৫ খৃষ্টাব্দে সূক্তিকর্ণামৃত রচিত হয়। 'শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈক-বিংশে' এই টুকু দ্বারা এখন জানা যায় না যে উহা লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-পরিচায়ক। উহা

---

(১) Dr. Rajendra Lala's Notices of Sanskrit MSS. Vol. III. p. 14.

(২) বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ ৬০২ পৃষ্ঠা।

(৩) সেনরাজগণ ৪৭ পৃঃ।

দ্বারা কবি 'লসং' নামক কোন অব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, এইমাত্র বোধ হয়। লসং লক্ষ্মণসেনের জন্মাব্দে অর্থাৎ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। আমরা স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি।[৩] এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ অব্দেই লসং আরম্ভ স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে ৮৬ লসং হয়। কিন্তু আমরা উক্ত বচনের কোনটী হইতে ৮৬ সংখ্যা পাইতেছি না। সংস্কৃতবিৎ উয়েষ্ট-সাহেব জর্ম্মণ প্রাচ্যসভার পত্রিকায়[৪] সুক্তিকর্ণামৃত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও ঐ শ্লোকটী একস্থানেই উদ্ধৃত করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার সংগৃহীত পুঁথিতে ঐ শ্লোকটী ছিল না। ইত্যাদি নানা কারণে ঐ শ্লোকটীর উপর আমাদের আস্থা নাই।

বিশেষতঃ মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের[৫] সমসাময়িক মিনাজের লেখায় স্পষ্ট জানা যায়, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ছাড়িয়া 'সকনাত্'[৬] পলায়ন করেন। এরূপস্থলে, ১২০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কল্পনা করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহার ৬ বর্ষ পূর্ব্বে তিনি গৌড়রাজ্য হারাইয়াছেন। তৎপরে তাঁহার বংশধরগণ অনেক দিন বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নবদ্বীপ হারাইবার পর লক্ষ্মণসেন আর কোথাও যে রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের গ্রন্থ পাঠে স্পষ্ট জানা যায়, যখন যবনেরা গৌড় আক্রমণ করে, তখন লক্ষ্মণসেনের পুত্র রাজা কেশব যবনের ভয়ে গৌড় ছাড়িয়া পলায়ন করেন। আবার কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র লিখিয়াছেন, রাজা কেশব স্বজন ও কুলীন ব্রাহ্মণগণ সহ (বঙ্গে) এক রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই রাজা তাঁহার ও ব্রাহ্মণগণের জীবিকা বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং কেশবের নিকট আপন পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত কুলবিধি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে কেশবের সহচর কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র তাঁহার নিকট কুলবিধি কীর্ত্তন করেন। এই রাজার নাম কি, তাহা আমরা অসম্পূর্ণ এড়ুমিশ্রের কারিকা হইতে জানিতে পারি নাই; এড়ুমিশ্রের সম্পূর্ণ কারিকা বাহির হইলে বোধ হয় তাঁহার নাম পাওয়া যাইতে পারে। তবে আমরা যেটুকু পাইয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিয়াছি ঐ রাজাও সেন-বংশীয় কুলবিধাতা মহারাজ বল্লালসেনের এক পৌত্র।

---

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXV, pt. I, p. 27.

(৪) Deutsches Morgelandes Gesellschaft.

(৫) বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ কেবল 'বখ্‌তিয়ার' নাম করিয়া থাকেন, কিন্তু এটী মহাভুল। বখ্‌তিয়ার কোনকালে এদেশে আগমন করেন নাই। যিনি নবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, তিনি বখ্‌তিয়ারের পুত্র মহম্মদ, এই জন্য তাঁহার নাম পারসী ভাষায় 'মুহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার'।

(৬) 'সকনাৎ' নাম লইয়াও গোল। অনেকের মতে সকনাৎ 'সপ্তগ্রাম' শব্দের রূপান্তর। কিন্তু আমাদের মতে বিবেচনায় 'সকনাৎ' 'জগনাথ' বা প্রাকৃত 'জগন্নাথ' শব্দের রূপান্তর বা অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

এদিকে আবার হিমালয়ের গোপেশ্বর মন্দির হইতে আবিষ্কৃত খোদিতলিপি দ্বারা জানা যাইতেছে—যে ভট্টনারায়ণবংশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধবসেন কেদারনাথে গিয়াছিলেন। মিনহাজের তবকাৎ-ই-নাসিরি পাঠে জানা যায়, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের নদীয়া আক্রমণের পূর্ব্ব হইতেই রাজা লক্ষণের অমাত্য, কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। আমাদের বোধ হয়, সেই সময় মাধবসেনও তীর্থযাত্রাচ্ছলে কেদারনাথে পলায়ন করেন।* অনেক ঐতিহাসিকই লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেনের পর তৎপুত্র মাধবসেন এবং মাধবসেনের পর তাঁহার ভ্রাতা কেশবসেন রাজত্ব করেন। দেড়বর্ষের উপর হইল, আমরা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি, লক্ষ্মণসেনের পর তৎপুত্র মাধবসেন ও কেশবসেন রাজা হন নাই। হরিমিশ্র ও এড়ুমিশ্রের কারিকা দ্বারা বোধ হইবে যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জীবদ্দশাতেই কেশব গৌড়ে "রাজা" বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং যখন তিনি বিক্রমপুরে পলাইয়া যান, তখন তথায় বল্লালের আর এক পৌত্র রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার নাম কি? বিশ্বরূপ। আজ পাঁচ বৎসর হইল, আমরা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের একখানি তাম্রশাসন পাইয়াছি। এই তাম্রশাসনে 'গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রঃ নৃপঃ' বলিয়া বিশ্বরূপকে সম্বোধন করা হইয়াছে। যখন রাজা কেশব বিক্রমপুরে পলাইয়া যান, তখন যে যবনেরা তাঁহার অনুসরণ করেন নাই, তাই বা কে বলিবে? বোধ হয়, লক্ষ্মণপুত্র বিশ্বরূপসেন যবনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কেশবকে উদ্ধার করেন, এই জন্যই তিনি 'যবনকুলের কালরুদ্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বিশ্বরূপের পর ঠিক কে রাজা হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। আইন্-ই-আক্বরীতে রাজা নোজা (দনোজার) [illegible] সদাসেন নামে এক রাজার উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্ত বিশ্বরূপ বা সদাসেন কুলা[illegible]র নিকট তেমন আদৃত হন নাই। সকল প্রাচীন কুলাচার্য্যই সগৌরবে দনৌজামাধবের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দনৌজামাধবের সভায় কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ নৃসিংহ বা নরসিংহ ওঝা সম্মানিত হন। দনৌজামাধব সকল প্রধান প্রধান পণ্ডিত কুলীনদিগকে আহ্বান করিয়া এক সমীকরণ করেন। তৎপরে সম্রাট্ বুলবনের অভিযান ও তুগ্রিলখাঁর বিদ্রোহ ঘটে। এই অশান্তির সময়েই নরসিংহ ওঝা দেশত্যাগ করিয়া ফুলিয়ায় আগমন করেন। দনৌজামাধবও বিক্রমপুর ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে গিয়া রাজধানী স্থাপন করেন।

আজ পাঁচ বৎসর হইল, আমরা সর্ব্বপ্রথম বিশ্বকোষে কুলীন শব্দে সাহিত্য সমাজের দৃগোচরার্থ কৃত্তিবাস ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের যে বংশাবলী† প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে

(*) এসিয়াটিক সোসাইটী পত্রিকায় এ সমস্ত প্রমাণ তুলিয়া দিয়াছি।

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXV. pt. I. p. 28.

(†) যখন এই বংশাবলী প্রকাশ হয়, তৎপূর্ব্বে বোধ হয় অনেকেই জানিতেন না যে, কৃত্তিবাস আমাদের একজন অতি প্রাচীন কবি। বিশ্বকোষে উক্ত বংশাবলী ও কৃত্তিবাস শব্দ প্রকাশিত হইবার দেড়বর্ষ পরে

নৃসিংহ ও তাঁহার সহোদর প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ কুলীনগণ যে যে স্থানে গিয়া বাস করেন, তাহা লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রতাপ প্রায় বিলুপ্ত হইলেও বঙ্গীয় কুলীন সমাজে চন্দ্রদ্বীপের সেনরাজগণ 'গৌড়াধিপ' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।[১০] নৃসিংহবংশীয় মুরারি ওঝার পৌত্র আমাদের কবি কৃত্তিবাসও সম্ভবতঃ ঐরূপ নাম মাত্র 'গৌড়েশ্বর' উপাধিধারী কোন চন্দ্রদ্বীপরাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে প্রফুল্ল বাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, কৃত্তিবাস গৌড়াধিপ কংসনারায়ণের সভায় গিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা কংসনারায়ণের রাজত্ব কাল, তাঁহার সময়ে গৌড়ে যবনসমৃদ্ধি, গৌড়ের রাজসভার যেরূপ সর্ব্ববিষয়ের আড়ম্বরপ্রিয়তা ও আদবকায়দা তৎকালীন দেশীয় মুসলমানদিগের ইতিহাস-পাঠে আমরা জানিতে পারি, কৃত্তিবাসের বর্ণনায় তাহার কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। তখনকার সেই যবন-প্রভাবের গুণেই আমরা অল্পদিন মধ্যেই কংসনারায়ণের পুত্রকে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত দেখি। কিন্তু সেই চিত্র অস্ফুটভাবেও কৃত্তিবাসের কোথাও দেখিতে পাই নাই। বিশেষতঃ তাঁহার বর্ণনীয় গৌড়েশ্বর মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন না, তাঁহার গৌড়েশ্বরের—

"আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি। তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর। মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥

উক্ত বর্ণনাটী পাঠ করিয়া যিনি যতই উচ্চভাব মনে করুন, কিন্তু আমাদের যেন চন্দ্রদ্বীপের সেনবংশের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া দেয়। পূর্ব্ববৎ সে আড়ম্বর নাই, অথচ সেই প্রাচীন নম্র মেউড়ী শোভা পাইতেছে। হিন্দু রাজা এখনও সে পূরা ব্রাহ্মণ্যভাব বজায় রাখিয়াছেন ...র বড় অমাত্যগণের উপাধিতে যবন সংস্পর্শ ঘটিয়াছে, কিন্তু রীতিনীতি চাল চলন এখনও ম্লেচ্ছভাবাক্রান্ত হয় নাই। যতদিন

বঙ্গবাসী পত্রিকায় এবং তৎপরে জন্মভূমিসম্পাদক জন্মভূমি পত্রিকায় কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহারা যে সকল বিষয় উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বহুপূর্ব্বেই বিশ্বকোষে ঐ সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। জন্মভূমি-সম্পাদক মহাশয় বিশ্বকোষ দৃষ্টে ঐ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিলেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন নাই। এখানে একটী বিশেষ কথা বলিয়া রাখি, শ্রীহর্ষের বংশাবলী মধ্যে বিশ্বকোষে এইরূপ ছাপা হয়—শ্রীহর্ষ, তৎপুত্র শ্রীগর্ভ, তৎপুত্র শ্রীনিবাস, তৎপুত্র মেধাতিথি, তৎপুত্র অরব ইত্যাদি। (বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ ৩০৯ পৃষ্ঠা।) কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কোন কুলাচার্য্য গ্রন্থে শ্রীনিবাসপুত্র মেধাতিথির নাম নাই। বিশ্বকোষে মুদ্রাকরের দোষে ঐ ভ্রমটী ঘটিয়া ছিল। এই ভ্রমটী বহুদিন হইতেই সংশোধন করিব মনে করিয়া আসিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় জন্মভূমি-সম্পাদক এবং এখন দেখিতেছি প্রফুল্লবাবুও অবিকল ঐ ভ্রমটী গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে আমরা সেই ভ্রমটী এইরূপে সংশোধন করিয়া লইলাম,—মেধাতিথি, তৎপুত্র শ্রীহর্ষ, তৎপুত্র শ্রীগর্ভ, তৎপুত্র শ্রীনিবাস, তৎপুত্র অরব ইত্যাদি।

(১০) চন্দ্রদ্বীপরাজবংশাবলীর একখানি প্রাচীন পুথি পাইয়াছি। পুথিখানির নাম 'গৌড়রাজবংশাবলী'।

চন্দ্রদ্বীপে স্বাধীন রাজত্ব ছিল, ততদিন আমরা এই ভাব দেখিয়াছি। এই সকল আলোচনা করিয়া যেন প্রফুল্ল বাবুর অনুমানই কতকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, আমরা লিখিয়াছি, "কুলপঞ্জিকা অনুসারে মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের প্রতিষ্ঠিত আদিত্যের অধস্তন ৮ম পুরুষে এবং গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের ঊর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষে কৃত্তিবাস আবির্ভূত হন। এরূপ স্থলে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ন্যূনাধিক ২৫০ শত বর্ষ পরে এবং চৈতন্যের সমসাময়িক গঙ্গানন্দের ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে কৃত্তিবাস ১৪১৫ হইতে ১৪১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।"[১১]

তৎপরে দীনেশ বাবু স্থির করিয়াছেন—কৃত্তিবাসের কাব্যরচনার কাল ১৩৮০ হইতে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।[১২]

এখন প্রফুল্ল বাবু প্রকাশ করিতেছেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ১৫০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৫৭ শকে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল।

এখন দেখিতে হইবে, তিনটী মতের মধ্যে কোনটীকে আমরা অধিক প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি?

প্রফুল্ল বাবুর মতে—চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণেরা দেবীবর কর্তৃক মেলবদ্ধ হন। কিন্তু আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি এবং বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ঘটকের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে চৈতন্যদেবের বিদ্যমান কালেই মেলের সৃষ্টি হয়। এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে কটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই বো[ধ হ]য় যথেষ্ট হইবে।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বন্দ্যঘটীয় কুলীন জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। এই চৈ[তন্য]মঙ্গলে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থের নাম আছে। তন্মধ্যে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে এইটুকু পরিচয় পাওয়া যায়—

"রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি। পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥"

প্রফুল্ল বাবু লিখিয়াছেন, কৃত্তিবাসের ভিটার পার্শ্বেই হরিদাস ঠাকুরের পাট। কবি জয়ানন্দ ফুলিয়ার সেই হরিদাস সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। যখন চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে হরিদাস ঠাকুরকে একবার দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তখন হরিদাস সেই সংবাদ পাইয়া যখন ফুলিয়া ছাড়িয়া চৈতন্যকে দেখিবার জন্য ছুটিলেন, সেই সময় উপলক্ষ করিয়া জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

"শুনিঞা শ্রীহরিদাস চলিলা উৎকল। ফুলিয়ার স্ত্রী পুরুষ সব কান্দিয়া বিকল॥
হরিদাস প্রিয় বড় প্রসেন পণ্ডিত। মুরারি-জগদানন্দ সংসারে বিদিত॥

---

(১১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১২৮ পৃষ্ঠা।

(১২) বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ, কৃত্তিবাস শব্দ ৪০২ পৃষ্ঠা।

গর্ভের মনোহর সুত সে কুলীন। তাঁহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ॥
ফুলিয়ার দেবতা শ্রীহরিদাস ঠাকুর। অনুরক্তি তারে সতে সেবা করে দূর॥"

(১৭ পত্র। ২য় পৃষ্ঠা)

ধ্রুবানন্দের উক্ত কবিতা কয়টি হইতে আমরা দুইটি বিষয় জানিতে পারিতেছি—১ম, যে মুরারির বংশে কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন, সেই মুরারির বংশে বংশাবতংসস্বরূপ (মনোহরের পুত্র) সুষেণ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন; ২য়, পণ্ডিতবর সুষেণ ফুলিয়ার গৌরব হরিদাসকে অতিশয় ভালবাসিতেন। যখন হরিদাস উৎকলাভিমুখে যাত্রা করেন, অপরাপর লোকের সহিত সুষেণ পণ্ডিতও কিছু দূর হরিদাসের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

এই সুষেণ পণ্ডিতের পরিচয় বেশী করিয়া দিতে হইবে না। মহাবংশাবলী প্রভৃতি সকল কুলাচার্য্যগ্রন্থেই ফুলিয়ার মহাকুলীন সুষেণ পণ্ডিতের পরিচয় আছে। যাঁহাকে লইয়া ফুলিয়া-মেল হয়, সেই গঙ্গানন্দের ইনি জ্যেষ্ঠ সহোদর। কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই সুষেণ পণ্ডিতের বৃদ্ধপিতামহ। যখন গঙ্গানন্দকে লইয়া ফুলিয়া মেল হয়, তখন সুষেণের মৃত্যু হইয়াছিল।

হরিদাস ঠাকুর যখন নীলাচলে মহাপ্রভুকে দেখিতে যান, তখন গৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম প্রায় ৩৪।৩৫ বর্ষ অর্থাৎ ১৪৪২-৪৩ শক (=১৫২০-২১ খৃষ্টাব্দ) হইবে, কিন্তু তখন হরিদাসের বয়ঃক্রম প্রায় ৭৫ বর্ষ। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, চৈতন্যের জীবদ্দশাতেই সুষেণ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর গঙ্গানন্দকে লইয়া ফুলিয়া মেল হয়। এই মেলের সময় গঙ্গানন্দের দুইটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল। তাহাতে গঙ্গানন্দকেও বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া বোধ [illegible] এরূপ স্থলে হরিদাসের বন্ধু গঙ্গানন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর সুষেণ পণ্ডিতেরও বয়স অন্ততঃ প্রা[illegible] হরিদাস ঠাকুরের সমান হইয়াছিল, তাহা মোটামুটি স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এরূপ স্থলে আনুমানিক ১৩৭০ হইতে ১৩৭৫ শকের মধ্যে সুষেণ পণ্ডিতের জন্মকাল ধরিয়া লইলাম। তাহার অন্ততঃ ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার বৃদ্ধপিতামহ কৃত্তিবাস পণ্ডিত জীবিত ছিলেন ধরিয়া লইতে বোধ হয় অনেকের আপত্তি হইবে না। এরূপ স্থলে সুষেণ পণ্ডিতের পিতামহ-স্থানীয় কৃত্তিবাস সুষেণের ৪০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১৩৩০ হইতে ১৩৩৫ শকের (১৪০৮ হইতে ১৪১৩ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। এরূপ মোটামুটি কালনির্ণয় স্থলে দুই চারি বর্ষের এদিক ওদিক ধর্ত্তব্য নহে। অতএব প্রায় পাঁচ বর্ষ পূর্ব্বে আমরা কৃত্তিবাসের যে কালনির্ণয় করিয়াছি, এখনও তাহাই যেন সত্যের অনেকটা কাছাকাছি বলিয়া বোধ হয়। যে পর্য্যন্ত আরও বিশিষ্ট প্রমাণ বাহির না হইবে, ততদিন আমরা কৃত্তিবাসকে [illegible] ১৪২০ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি।

[illegible] রামায়ণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

প্রায় পাঁচ শত বর্ষ হইতে চলিল, কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ-কাল পাঁচালী গায়ক ও শত শত লেখকের হাতে পড়িয়া কৃত্তিবাসের মূলগ্রন্থ যে কিরূপ বিকৃত হইয়াছে, তাহা মনে করিলেও বড় কষ্ট হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বঙ্গবাসী মাত্রেরই আদরের জিনিস্। পূর্ব্বে বঙ্গের প্রতি ঘরে নিত্য এই গ্রন্থ পঠিত হইত। তৎকালীন প্রাচীন লেখকগণ যেখানে প্রাচীনতম রচনার ভাব বা অর্থ সহজে বুঝিতে পারেন নাই, অথবা বঙ্গভাষার সেই শৈশবকালের পদ বা শব্দবিন্যাস তৎপরবর্ত্তী কালের জনসাধারণের প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়াছিলেন, সেই সেই স্থলেই তাঁহারা মাজিয়া ঘষিয়া নূতন রঙ্ ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা কেবল জয়গোপালকে দোষ দিই কেন? এখন আমরা দেখিতেছি, এরূপ শত শত জয়গোপাল কৃত্তিবাসের সেই প্রাচীনতম রচনার মুণ্ডপাত করিতে কত চেষ্টা কত যত্নই না করিয়াছিল! তাহারা ভাল ভাবিয়া যে কার্য্য করিয়া গিয়াছে, এখন আমাদের নিকট তাহা অমৃতে গরলবৎ বোধ হইতেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের দুইখানি প্রাচীন হস্তলিপি মিলাইয়া দেখুন, কেবল পাঠান্তর নয়, অনেক স্থলেই ভাবান্তর, অর্থান্তর, এমন কি ছন্দের ও বিষয়েরও রূপান্তর দেখিতে পাইবেন। সাহিত্য-[illegible]ষদ্ নানা স্থান হইতে ১৪।১৫ খানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি পাইয়াছেন। তন্মধ্যে [illegible]রা দুই শ্রেণীর পুথি বাহির করিয়াছি। এক শ্রেণীর পুথি 'রত্নাকর দস্যুর উপাখ্যান' [illegible]তে আরম্ভ এবং অপর শ্রেণীর পুথি 'দশরথের বিবাহ' হইতে আরম্ভ। এত গেল শ্রেণী-[illegible]। তার পর একশ্রেণীর দুইখানি পুথি লইয়া দেখিতেছি, অনেক স্থলেই এত অধিক [illegible]ান্তর যে দুইখানিকেই ভিন্ন পুথি বলিয়া ধরিলেও দোষ হয় না। এক শ্রেণীর একখানি [illegible]থিতে যে বিষয় লইয়া ১০।১২টী কবিতা লিখিত হইয়াছে, আবার সেই শ্রেণীর আর একখানি [illegible]থিতে দেখি সেই বিষয় লইয়া ৫০।৬০টী কবিতা আছে। এখন ভাবুন দেখি, আমরা [illegible]রূপ সমস্যায় পড়িয়াছি। কৃত্তিবাসের মূল গ্রন্থ উদ্ধার করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা বোধ হয় এখন অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। এই কারণেই পরিষদ্ হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটিতেছে। পরিষদে ১৪।১৫ খানি পুথি সংগৃহীত হইলেও ১২৫ বর্ষের অধিক পুরাতন পুথি আসে নাই। একেত রামায়ণের এইরূপ পুথিবিভ্রাট! তাহার উপর প্রায় পাঁচশত বর্ষের রচনা ১২৫ বর্ষের পুথি হইতে উদ্ধার করিতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল গ্রন্থ উদ্ধার করিতে হইলে অন্ততঃ দুইশত কি আড়াই শত বর্ষের প্রাচীন পুথি চাই। যত দিন না এরূপ প্রাচীন পুথি সংগ্রহ হইতেছে, ততদিন কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ করা উচিত নহে। যিনি আমাদের এই পুথি-বিভ্রাট মিটাইতে পারিবেন, যিনি কৃত্তিবাসের মূল গ্রন্থ উদ্ধার করিতে কৃতকার্য্য হইবেন, তিনি বঙ্গ সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করিবেন; বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট চিরঋণী হইবেন।

৪র্থ ভাগ।] [৩য় সংখ্যা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব*।

আমি নিজে ব্যবসায়ী ভূতত্ত্ববিদ্ নহি অথবা ভূতত্ত্ববিদ্যায় সাধারণ দৃষ্টি ব্যতীত, তাহাতে পাণ্ডিত্যও আমার কিছুই নাই। সুতরাং অদ্য আমার এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্যার পরিভাষা বা দাঁড়াদস্তুরের যে কোন ধার ধারি না, তাহা বলাই বাহুল্য এবং তজ্জন্য যদি কোন দোষের কথা হয়, তবে তাহা ক্ষমার যোগ্য। আমি আমার বিষয় কার্য্য উপলক্ষে এই বঙ্গভূমির প্রায় সমস্ত স্থানই তন্ন তন্ন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। সেই ভ্রমণকালে, বাঙ্গালাদেশের ভূমি-ভাগের প্রতি কিঞ্চিৎ যত্ন ও মনোযোগের সহিত অবলোকন করায়, তাহাতে যেখানে যেখানে যেমন দেখিয়াছি ও যেখানে যেখানে যেমন বুঝিয়াছি এবং সেই সকলের ফলস্বরূপ মনের মধ্যে যে একটা ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাই এখন, পুনর্ব্বিবেচনায় কিছু কিছু বা ছাটিয়া ছুটিয়া, কিছু কিছু বা জোড়া গাঁথা দিয়া, অদ্যকার এই প্রবন্ধ আকারে অবতারণা করিলাম। জানি না, ইহা কাহারও প্রীতিকর হইবে কি না। এ কথায় কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, তবে এমন অপূর্ব্ববিদ্যা-খরচে লোক সকলকে এ অদ্ভুত বিদ্যায় বিদ্বান্ করিবার চেষ্টা প্রয়োজন?—নষ্টস্য কান্যা গতিঃ। অথবা তোমরা বলিতে পার, এ অস্থানে কণ্ডূয়নরোগের ঔষধ কি?

বাইবেল গ্রন্থে আছে, "মানুষ যতই উঠা পড়া করিতে থাকে, ততই তাহার জ্ঞানলাভ হয়।"—(Man will run to and fro and the knowledge will gather.) এও না হয়, সেই বহু উঠা পড়ার মধ্যে একটা বলিয়া ধরায় ক্ষতি কি? উঠিয়াছ ত অনেকবার; একবার না হয় পড়িয়াই দেখ না, কেমন লাগে।

---

* বাঙ্গালার ভূতত্ত্ব প্রবন্ধে বর্তমান প্রবন্ধের বরাত আছে। ([illegible] পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

মূল মহাভারতের বনপর্ব্বে ১১৩ অধ্যায়ে, পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা বিবরণে এরূপ লিখিত আছে যে, যেখানে কৌশিকী তীর্থ, অর্থাৎ যে স্থানে বর্ত্তমান নাম কুশী ও সাবেক নাম কৌশিকী নদী গঙ্গায় আসিয়া সংমিলিত হইয়াছে; রাজা যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহারই কিঞ্চিৎ দূরে পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গম এবং তথা হইতে সাগরতীরে কলিঙ্গনামে দেশ দেখিয়াছিলেন। অনেকেরই সম্ভবতঃ এ সংবাদে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবার কথা, কারণ—কোথায় কুশীসঙ্গম আর কোথায় গঙ্গার সহ সাগর-সংমিলন! এখনকার হিসাবে এ দুয়ের মধ্যে ৩৫৫ মাইল ব্যবধান, অথচ ইহারই নাম কুশীসঙ্গমের "কিঞ্চিৎ পরে!" এ আবার কোন দেশী "কিঞ্চিৎ পরে" তা কে জানে। আমাদের দেশে ত "সেকান্দরী" গজ, "সেকান্দরী" হাত; এক কথায় "সেকান্দরী" বিশেষণ সংযোগে সকল জিনিসই অতি বড় বড় বুঝায় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। কিন্তু এখানে সে "সেকান্দরী কিঞ্চিৎ" বলিলেও পারা যায় না। কুশীর সহ গঙ্গার সঙ্গম এখন ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত কাহালগাঁ নামক গ্রামের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে অবস্থিত। এই কাহালগাঁ কলিকাতা হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের দূরত্ব অনুসারে ২৫৫ মাইল এবং কলিকাতা হইতে বর্ত্তমান সাগরসঙ্গম ন্যূনাধিক একশত মাইল হইবে। এস্থানে কেহ হয়ত মহাভারতোক্তির সঙ্গতি নিরূপণ প্রয়াসে বলিতে পারেন যে, কুশীসঙ্গম সে কালে—সে মহাভারতের কালে, হয় ত আরও দক্ষিণে ছিল। কিন্তু কুশীসঙ্গমকে "কিঞ্চিৎ পরের" সহিত সঙ্গত করিতে তাহাকে কতই দক্ষিণে আর লইয়া যাইতে পারিবে? বিশেষতঃ এই প্রদেশ যাঁহারা বিশেষরূপে দেখিয়াছেন এবং কুশীনদীর অববাহিকা সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু মাত্র দর্শন আছে, তাঁহারা আর—এরূপ কথা—বলিবেন না; তাৎকালিক কুশীসঙ্গমকে যদি একান্তই স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বর্ত্তমান সঙ্গমস্থল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উত্তরে ভিন্ন দক্ষিণে কখনই তাহার অবস্থান নির্দ্দেশ করিবেন না। বস্তুতঃ অতি পুরাতনকাল হইতে কুশীর স্থান পরিবর্ত্তনের চিহ্ন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

অথবা যোকা মহাভারতকারের এরূপ অসম্ভব,—উপস্থিত ব্যাপারের সহ এমন অমিল,—সুতরাং বোকা উক্তি উড়াইবার আরও এক উপায় আছে; যাহা অতি সহজ, সুশ্রাব্য, নিজেরও কিছু কিছু বিদ্যাবত্তাপ্রকাশক, অথচ তাহার জন্ত কাহার কাছে বিশেষ জবাবদিহি করিতেও হয় না। এ উপায় টা?—'কোথায় হিমালয়ের কোলে বদরিকাশ্রমে বসিয়া গাছের ছাল আঁচড়াইয়া মহাভারত লেখা,—আর কোথায় গঙ্গাসাগর-সঙ্গম! 'পেটের জ্বালায় অস্থির ভিক্ষাজীবী ব্যাসঠাকুরের পক্ষে তাহা যতটা জানা সম্ভব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, অনুমান ও জনশ্রুতি যাহার মূল, সেই প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, বিশেষতঃ ঋষিপ্রণীত পুরাণাদিতে যাহা কিছু লেখা, তাহা সকলই অলীক খেয়াল এবং কল্পনায় পরিপূর্ণ।' আমাদেরই কিছু পুর্ব্বগত সেই সর্ব্বদর্শী

ইংরেজীনবিশগণ, যাঁহারা স্বজাতীয় হিন্দুর ঘরে গোহাড় ফেলিয়া আপনাকে বীরপুরুষ ভাবিতেন; যাঁহারা "বাঙ্গালা জানি না" বলিয়া আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন এবং যাঁহাদিগকে "ক খ" র দাগা বুলাইতে দিলে আপনাকে সম্মানিত মনে করিলা— আহ্লাদিত হইতেন; তাঁহাদের বিশ্বাস এবং উপায়টা ঐরূপই ছিল। এ শ্রেণীর জীব এখনও খুঁজিলে, দুই একটী পাওয়া যায় কি না জানি না। পাওয়া গেলেও, সৌভাগ্যক্রমে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প; এবং এখনকার ইংরেজীনবিশ যাঁহারা, তাঁহারা তত্টা অবিশ্বাসী নহেন এবং বিদ্যার গৌরবও তাঁহাদের সে প্রকারের নাই, বাদ কেবল ইংরেজীতে চিঠী পত্রটা লেখা। তা—সেটা—পূর্ব্বকার ইংরেজীনবিশদের তুলনায় অতি সামান্য রোগ বলিয়াই ধরিতে হয়।

যাহাহউক, বোকা বাপ্‌ঠাকুরের বোকা কথা যে একেবারে ফেলিবার জিনিষ নহে, তাহা অপরবিধ কয়েকটা প্রামাণিক উপায় দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে। খৃষ্ট জন্মিবার তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বা প্রায় বাইশশত বৎসর আগড়ে, মগধেশ্বর সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় একজন গ্রীক রাজদূত থাকিতেন, তাঁহার নাম মিগাস্থিনিস্।[১] মিগাস্থিনিস্ তাঁহার ভারতীয় বিবরণে লিখিয়াছেন যে, পাটলিপুত্র—অর্থাৎ পাটনা হইতে গঙ্গাসাগর সঙ্গম ন্যূনাধিক তিনশত মাইল হইবে। তাহা হইলে এই সাগরসঙ্গম, কলিকাতার কত উত্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান হিসাবে, গঙ্গাসাগরসঙ্গম পাটনা হইতে, রেলপথের মাপ লইয়া ধরিলে, প্রায় ৪৫০ মাইল এবং প্রচলিত স্রোত জাহাজের পথ অনুসারে ৫০০ মাইলের কম হইবে না। পুনশ্চ, কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর পঞ্চম তরঙ্গে, রাজা ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, রাজা ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে আইসেন, তখন গৌড় নগরের অত্যল্প দেশ পরেই সাগর-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। এখনকার ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও বলিয়া থাকেন যে, গঙ্গাসাগর এক সময়ে, রাজমহল বা তাহার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের একথা আরও আশ্চর্য্য নহে কি?

কাশ্মীরপতি রাজা ললিতাদিত্য, যিনি গৌড়নগরের অত্যল্প দেশ পরেই পূর্ব্বসমুদ্র প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছিলেন, তিনি বড় বেশী দিনের লোক নহেন। রাজতরঙ্গিণী অনুসারে, ইনি ৬১৯ শকে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৬৫৫ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ১৮১৯ শক হইতে তাঁহার রাজ্যাভিষেকের ৬১৯ শক বাদ দিলে ১২০০ বৎসর অন্তর হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, ন্যূনাধিক বারশত বৎসর পূর্ব্বে, গৌড়ের অতি নিকট পর্য্যন্ত, পূর্ণ প্রবাহে না হউক, অন্ততঃ এখন যেমন খুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণে সুন্দরবন বিভাগে এবং মেঘনা নদীর মুখে, সেইরূপ ভাবে মাঝে মাঝে দ্বীপ, চরভূমি ও জলাভূমিসমন্বিত পূর্ব্বসমুদ্র প্রবাহিত ছিল। সর্ব্বত্র জল দুনানীর ন্যায় নদীর মত, মধ্যে মধ্যে কোন কোনটা আবার এত বিস্তৃত যে কূল কিনারা নজর

১। Megasthenes Frag. VI.

হয় না, কোথাও বা নদীর মুখের নিকট সমুদ্রখাড়ী ভূমধ্যে প্রবেশ করিয়া তরঙ্গখেলা খেলিতেছে, কোথায় বা চরভূমি ভাটার সময় জাগিয়া উঠে, জোয়ারের কালে ডুবিয়া যায় এবং কোথাও বা ভূমিভাগ জলরেখা উত্তীর্ণ হইয়া সুন্দরী প্রভৃতি বাদাবন-মূলক বিবিধ জঙ্গলে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে। এই যে চিত্র এখনকার, তখনও বোধ হয়, গৌড়ের অতি সন্নিকটে ইহার বিদ্যমানতা ছিল। সুতরাং বলিতে হয় যে, তখনকার কালে এখনকার এই নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশপরগণা এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ এই কয়টি জেলার অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমে দ্বীপ ও চরভূমি সকল প্রবল ও প্রশস্ত হইতে থাকায়, যত ও যেমন সমুদ্র সরিয়া গিয়াছে, ততই দেশ সকল ক্রমাধিবেশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই রূপেই কালে উক্ত কয়েকটী জেলা-সমন্বিত গাঙ্গেয় দ্বীপের উদয় হইয়াছে। ইত্যাকার ক্রমোদ্ভব দ্বীপাধিবাস হইতেই, অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপান্তক নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

উক্ত দ্বীপান্তক, নাম ভিন্ন, এই গাঙ্গেয় দ্বীপের মধ্যে আরও অসংখ্য স্থান আছে, যাহাদের অন্তভাগে "দীয়া" শব্দ সংযোজিত; যেমন কাটালীয়া, সাগরদীয়া, আলোকদীয়া, কালাদীয়া, জয়দীয়া, মহেশ্বরদীয়া ইত্যাদি। এখানে বলিয়া দেওয়া বাহুল্য যে, এই "দীয়া" দ্বীপ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। পুনশ্চ বাদা কাটিয়া বসত হওয়ায়, অনেক স্থানের নাম কাটী হইয়াছে, যথা বিজ্ঞানন্দকাটী রায়েরকাটী, স্বরূপকাটী, আদিলকাটী, বিষ্ণুকাটী, কালীকাটী ইত্যাদি। এখনও এই বর্ত্তমান কালেও বরিশাল জেলায় বৃহৎ বৃহৎ নদী ও সমুদ্র খাড়ী সকল সরিয়া যাওয়ায় ভূমিভাগের উদয়ে যেমন তাহা অধিবেশিত হইতেছে; চরভূমিতে অধিবাস হেতু, সেই সকল স্থানের চরান্তক নাম হইতেছে, যেমন শিবচর, গোপালচর, মধুচর, ঘোষের চর, প..., চরভদ্রাসন ইত্যাদি। কয়েকটা পরগণাও হইয়াছে, তাহাদের নাম চরান্তক, যেমন চর বাখিরা ইত্যাদি।

উপরে বলা হইয়াছে যে, বারশত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া প্রভৃতি জেলার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ঐ সময়েরই ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাগীরথীতটে নবদ্বীপ নগরে গৌড়পতি বল্লাল এবং লক্ষ্মণসেনের সাময়িক বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যেখানে মরা সমুদ্র বা বাদা ছিল, সেখানে এমন পরিবর্ত্তন কিরূপে ঘটিল, ইহা ভাবিয়া হয়ত অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় বিন্দুমাত্র নাই; যেহেতু যে পরিবর্ত্তন বার শত পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, এখনও তাহার অভিনয় চলিতেছে, এবং বর্ত্তমান সময়ের সে অভিনয় নিষ্পন্ন হইতে কি পরিমাণে সময় লইতেছে তাহা দেখিলেই তদ্দ্বারা সে কালের সেই পরিবর্ত্তনে কত সময় লাগিয়াছিল, তাহা অনায়াসে অবধারিত হইতে পারিবে। তখনকার ও এখনকার এ উভয় কালের যে অভিনয়, তাহা উভয়তঃ একই প্রকার, একই কারণ হইতে উৎপন্ন এবং পরিশেষে একবিধ ফলে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে।

মেঘনা নদীর সাগরসঙ্গমস্থলে হাতিয়া, মানপুরা প্রভৃতি দ্বীপ, যাহা ৭০।৮০ বর্ষ পূর্ব্বে কেবল ভাঁটার সময় জাগিয়া উঠিত ও জোয়ারের সময় ডুবিয়া যাইত; যাহা তখন সম্পূর্ণ বাসের অবস্থায় পরিণত হয় নাই, সুতরাং বাদা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থাপন্ন ছিল; এখন তাহাই উচ্চভূমি এবং বহুজনাকীর্ণ গ্রামসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এ দুইটী দ্বীপ সম্বন্ধে যে কিছু খবর, তাহা পাঠকগণ নিরস বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু এই প্রবন্ধ-লেখকের নিকট তাহা বড়ই সরস। ফলতঃ আমাদের এ দুইটী দ্বীপের খবর বড়ই বেশী বেশী রকম রাখিতে হয়, যেহেতু এখান হইতেই আমার আহারীয়ের জন্য খাঁটি ভয়সা ঘৃত আনীত হইয়া থাকে। যাহা হউক, তাহার পর নাজীরচর, জাল্কলচর নামে আরও দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, যথায় খৃষ্টীয় ১৮৬০ সালেও জঙ্গলপূর্ণ জলাজমি ছিল, এখন তথায় বহুলোকের বাসস্থান হইয়াছে। ঐরূপ আরও দক্ষিণে এবং সমুদ্র মধ্যে রাবণাবাদ নামক কয়েকটী দ্বীপ, কুকুড়ি-মুকুড়ি চর, ধোপাচর প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি দ্বীপ গত ৩০ হইতে ৪০ বৎসর মধ্যে জল হইতে জাগিয়াছে ও তাহাতে লোকাবাস হইয়াছে। তাহার পর ২৪ পরগণা, খুলনা ও বরিশালের অত্যন্ত দক্ষিণভাগে, যেখানে শতবর্ষ পূর্ব্বে সমুদ্রতরঙ্গ বহিত, এখন সে সকল স্থানে অসংখ্য গ্রাম নগর বসিয়াছে। এখনও নিত্য নূতন উত্থিত ভূমি ভিন্ন ভিন্ন লাটে বিভক্ত হইয়া কালেক্টরী হইতে বিলি হইতেছে এবং নিত্য নূতন জঙ্গল কাটাইয়া সেই সকল স্থানে আবাদ ও গ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল উদ্গম-ক্রম-পরিণতি দেখিলে, নবদ্বীপাদি স্থানের উদয় ও বসতি স্থাপন অন্ততঃ অনেক বেশী সময় বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকিবে।

ফলতঃ সুন্দরবনের দক্ষিণে এবং গঙ্গাসাগরের মুখে এখনও নিত্যই সমুদ্র ভরাট হইয়া নূতন জমির উদয় হইতেছে, এবং সেজন্য গঙ্গাসাগরসঙ্গম ক্রমেই দূরে যাইয়া পড়িতেছে। যেহেতু, কেবল পঞ্চশত নহে, এখন দ্বিপঞ্চশত নদী সর্ব্বদাই গঙ্গার সহচারিণী থাকিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে অপার মৃত্তিকারাশি আনিয়া নিকটবর্ত্তী সাগরকে শুষ্ক করিবার পক্ষে সহায়তা করিতেছে। প্রায় ৫০।৬০ বৎসর হইল, অভিজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিতেরা গাজীপুরে একবার নানা উপায় প্রয়োগে নিরূপণ করিয়াছিলেন যে, গঙ্গা প্রতি বৎসরে সাগরসঙ্গম স্থলে ১৭৩৮২৪০০০০০ মণ মাটি আনিয়া উপস্থিত করিয়া থাকে। এই হিসাব হইয়াছিল, গাজিপুরে বসিয়া। কিন্তু গাজিপুরের দক্ষিণে স্বয়ং গঙ্গা ও তাহার শোণ, অজয় প্রভৃতি শাখা নদী, সুন্দরবনের মধ্যস্থিত দ্বিপঞ্চশত নদী, তাহার পর উত্তরপূর্ব্বকোণ হইতে আগত ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী প্রভৃতি, এ সকলের দ্বারা আরও কত মাটি বাহিত ও আনীত হইয়া থাকে, তাহার আর হিসাব হয় নাই। এখন ঐ গাজিপুরের হিসাবের সাহায্যে এ সকলের বাহিত মাটির পরিমাণ কত, তাহা যদি অনুমান করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, কি প্রভূত মাটিই প্রতি বৎসর সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে এবং ইহাতে

যে এত শীঘ্র সমুদ্র ভরাট হইয়া নূতন জমী উত্থিত হইবে ও সেই সকল স্থানে নূতন দেশ বসিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কোথায়?

অতঃপর আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের মাটির অবস্থা পরীক্ষা করিলে স্থানভেদে তাহার এই চারি প্রকার প্রধান বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম বিভাগ।—রাজমহলের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান ছাপঘাটী পর্য্যন্ত বড়গঙ্গার দক্ষিণে এবং ছাপঘাটী হইতে ভাগীরথীর পশ্চিমধার বাহিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূভাগের সর্ব্বত্রই, প্রায় এক প্রকৃতির মাটি। অবশ্য ভূতত্ত্ববিদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহার মধ্যে বিভাগ দুই হইতে পারে; কিন্তু আমাদের এই আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য যতটুকু, তাহার মধ্যে তাদৃশ সূক্ষ্ম বিভাগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। স্থূলতঃ এবং মোটা দৃষ্টিতে যতটুকু দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলেই এখানে যথেষ্ট হইবে। সেই মোটা দৃষ্টিতে এক প্রকৃতির মাটি বলিতেছি। ইহা সর্ব্বত্রই কাঁকর পাথর পূর্ণ অথবা পাহাড়িয়া কঠিন মাটি। এ বিষয়ে আরও একটু বলার প্রয়োজন যে, যদিও রাজমহলের দিকে এবং মেদিনীপুরের দিকে, বিন্ধ্য ও পূর্ব্বঘাট শ্রেণীর প্রকৃতি ভেদে, মাটির প্রকৃতিরও দুই উপবিভাগ হইতে পারে বটে, কিন্তু উপস্থিত শ্রেণীবিভাগে এবং আমাদের প্রয়োজনে যতটুকু আবশ্যক, তাহাতে তদুভয়কে একশ্রেণীর মাটি বলিয়া ধরায় কিছুমাত্র অন্যায় হইবে না। আমাদের প্রয়োজনানুরূপ, উভয়ই সমান কাঁকর পাথর পূর্ণ ও পাহাড়িয়া মাটি। যেখানে বা কাঁকর পাথর দেখিতে পাওয়া যায় না, যেমন বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ এবং হুগলির পশ্চিমাংশ, সেখানেও মাটি এত কঠিন ও তাহার প্রকৃতি এরূপ যে, বাঙ্গালার আর কোন স্থানে তাহার অনুরূপ মাটি দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তাহাও যে এই বিভাগের অপরাপর মাটির সঙ্গে সমশ্রেণীর ও সমধর্ম্মাক্রান্ত সে পক্ষেও কোন সন্দেহ থাকে না। এই সমস্ত ভূভাগের মাটি বহু যুগযুগান্তর হইতে নির্ম্মিত; সুতরাং ইহাকে সোজা কথায় পাকা-মাটি বলিয়া ধরা যাইতে। উহা পাকা মাটিই বটে। ইহা নিশ্চয় যে, এক সময়ে সমুদ্র গৌড়ের নিকট পর্য্যন্ত ছিল অথবা আরও পূর্ব্বে, গঙ্গাসাগর সঙ্গম যখন ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্দ্দেশ অনুসারে রাজমহলের সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল, সেই সময়ের সেই সমুদ্রের জল কখনই এই মাটিকে অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয় নাই। যেহেতু অল্পকাল সমুদ্র সরিয়া গেলে, যে সকল চিহ্ন পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং যে সকল জলজীবের পঞ্জরাদি মৃত্তিকায় অন্তর্ভূত হইয়া যায়, এ ভূভাগের কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই। সুতরাং ঐ মাটিই যে আগে সমুদ্র এবং পরে সমুদ্র-বাহার পশ্চিম সীমা ছিল, তাহাতে সন্দেহ অতি অল্পই।

দ্বিতীয় বিভাগ। পদ্মা বা বড়-গঙ্গার উত্তর তীর হইতে হিমালয়ের পাদদেশ তরাই পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ, হিমালয়ের ঢালু ভূমি। ইহা হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশ হইতে

পদ্মার উত্তর তট পর্য্যন্ত, ক্রমাগত ঢালু হইয়া আসিয়াছে। এই ভূভাগের সর্ব্বত্রই জমির প্রকৃতি এক প্রকার। সর্ব্বত্রই হিমালয়ের গাত্র-ধৌত বালুকারাশি বিস্তৃত হইয়া আছে এবং তাহার উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণে বালুকা-মিশ্রিত দো-আঁশ মাটি জমিয়াছে, যদ্দ্বারা মৃত্তিকা-সাধ্য চাষ আবাদাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই ঢালু বালুকাময় জমিতে, সর্ব্বত্রই হিমালয়ের গাত্র-ধৌত জলরাশি অন্তঃসলিলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকায়, সমস্ত দেশের ভূমিই জলসিক্ত ও আর্দ্র। ফলতঃ জমির জলসিক্ত ভাব এতই অধিক যে, এখানে আলু, ইক্ষু প্রভৃতির চাষে কখনও জলসেচন করিতে হয় না। আমি রঙ্গপুর ও অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান করিয়া চাষাদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, এখানে আলু প্রভৃতিতে জলসেচন করিলে, তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বালীর ভাগ এ সকল প্রদেশে এত অধিক যে, কূপ ব্যতীত, পুষ্করিণী খনন করিতে পারা যায় না। পুষ্করিণী খনন করিতে গেলেই, বালী ভাঙ্গিয়া বুজিয়া যায়। ফলতঃ অতি দীর্ঘায়তন দীঘি ভিন্ন, সঙ্কীর্ণ আয়তন পুষ্করিণী খনন, বালীর দৌরাত্ম্যে একরূপ অসাধ্য ব্যাপার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে এ কার্য্যে কাহারই সম্পূর্ণ সফলকাম হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এত বালুকা আসিল কোথা হইতে? ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট শুনিতে পাই যে, পৃথিবীর ভূপঞ্জর নির্ম্মিত হওয়ার "ইওসিন্" যুগে, হিমালয়ের তটদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র-তরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। হিমালয়ের কেবল তটভাগ নহে, তাহার বর্ত্তমান উচ্চতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত তখনও জলময় ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য যে, এ দেশের এই যে স্তূপাকার অসীম বালুকা ভিত্তি, ইহা কি সেই প্রাচীন ইওসিন্-সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার ফল? কিন্তু তাই বা বলি কি করিয়া, যেহেতু ইওসিন্ যুগ যে, সেত অনেকদিনের কথা! ইওসিনের পরও কয়েকটী স্তর হইয়াছে যথা, মিওসিন্, প্লিওসিন্ এবং ইহার পরে ভূপঞ্জরের চতুর্থযুগের স্তর নির্ম্মাণ ক্রিয়া চলিতেছে। ইহার মধ্যে মিওসিন্ স্তরেই প্রথম মনুষ্য সৃষ্টির চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার মধ্যেও আবার নিম্ন মিওসিনে প্রাপ্ত চিহ্নগুলি অতি অস্পষ্ট ও সন্দেহ-সংযুক্ত। উপর মিওসিন্ হইতেই কেবল মানবীয় অস্তিত্বের স্পষ্ট চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়ার আরম্ভ বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই সকল স্তরের এক একটা নির্ম্মিত হইতে কত লক্ষ লক্ষ বর্ষ গত হইয়া যায়। সুতরাং তত কালের সমুদ্র-পরিত্যক্ত বালী কি আজিও প্রস্তরাবস্থায় পরিণত না হইয়া নিম্নাবস্থায় থাকিতে পারে?—ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। তাই বলিয়াছি যে, উহা হিমালয়ের গাত্র-ধৌত বালুকা। এই প্রদেশ একে হিমালয়ের ঢালু, তার প্রস্তর-প্রবণ অববাহিকা, সুতরাং বালী জমা এইবার পক্ষে কারণের অভাব কোথায়? অবশ্য, এ বালীও এ সকল ভূভাগ জাগিবার বহুকাল পূর্ব্বে জমিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিভাগের উপর অর্থাৎ উত্তরাংশের জমি, প্রথম বিভাগের সহ সম সুরাতন ও নিম্নাংশের জমি

তদপেক্ষা কিছু আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক হইলেও অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা যে পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিভাগের জমি মোটের উপর এতটা পুরাতন হইলেও, যে দৃঢ়তা তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে পর্য্যন্ত দেখা যায়, তাহাও ইহার কোন অংশে যে দৃষ্ট হয় না তাহার কারণ, ইহার ঢালু ভূমিতে অন্তঃসলিলের প্রবল ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

তৃতীয় বিভাগ। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতট হইতে নওয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশ এবং এদিকে তমোলুকের নিকটবর্তী স্থান। নৈসর্গিক কারণ বশতঃ সমুদ্র সরিয়া গেলে, যেরূপ প্রকৃতির ভূমিভাগ উত্থিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত স্থানের প্রকৃতি অবিকল তদ্রূপ। ফলতঃ কালে সমুদ্র সরিয়া যাওয়াই, এই সকল ভূভাগের উদ্ভব হইয়াছে এবং সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার সময় যে সকল বালির স্তূপ রাখিয়া গিয়াছে, (যাহাকে চলিত কথায় বালিয়াড়ী বলিয়া থাকে,) তাহাই, তাহাদের প্রাচীনত্বের ইতর বিশেষ হেতু, কোথাও খণ্ড খণ্ড ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনতি উচ্চ পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে এবং কোথাও বা এখনও অবিকল বালিয়াড়ী আকারেই রহিয়া গিয়াছে। তমোলুকের নিকটস্থ বালিয়াড়ী সকল এখন অবিকল বালুকাস্তূপ মাত্র। কিন্তু চট্টগ্রামাদি অঞ্চলে, তাহা পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের বহিরাবরণ ভেদ করিলে অভ্যন্তরে এখনও সেই বালুকাস্তূপের পরিচয় পাওয়া যায়; তবে কোথাও কোথাও কিয়ৎপরিমাণে বালুকাস্তর পাথরের স্তরে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সকল পর্ব্বতের অভ্যন্তর ভাগের সর্ব্বত্রই সামুদ্রিক জলজ জীবের পঞ্জর পরিব্যাপ্ত। এ সকল পর্ব্বতগুলি এত খণ্ড খণ্ড ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে, এক চট্টগ্রাম সহরের ভিতর ও পার্শ্বেই গণনায় ১৪।১৫টা হইবে। চট্টগ্রাম প্রদেশের সীতাকুণ্ড তীর্থে যে সকল পর্ব্বতমালা আছে, তাহারা যদিও কিয়ৎপরিমাণে আগ্নেয় স্বভাববিশিষ্ট, তথাপি তাহাদেরও উৎপত্তি ও পরিণতি ঐ বিস্তৃত প্রান্তরের সামুদ্রিক বালিয়াড়ী হইতে। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব সীমায়, দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে যে পর্ব্বতমালা প্রবাহিত হইয়া হিমালয়ে সংলগ্ন হইয়াছে, সে সকল হইতে এই বালিয়াড়ীনির্ম্মিত পর্ব্বতমালার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে সকল পর্ব্বতমালা বহুযুগ পূর্ব্বে সৃষ্ট এবং সমুদ্র যে এক সময়ে তাহারই পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল ও কালে তথা হইতে সরিয়া গিয়া যে এই তৃতীয় বিভাগের ভূমি সকলের উদয় করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এ ভূভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু আধুনিক হইলেও, দ্বিতীয় বিভাগ হইতে বহুপরিমাণে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যদিও অবশ্য সে দৃঢ়তা মোটের উপর ধরিলে, কখনই প্রথম বিভাগের সমকক্ষতায় আসিতে পারে না।

চতুর্থ বিভাগ। এই বিভাগের মৃত্তিকা যাহা, তাহা সর্ব্বত্র পঙ্কময়, কোথাও কদাচ কোন বিশেষ কারণে কিছু কিছু দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার পরিমাণ এত অল্প এবং দৃঢ়তাও এত সামান্য যে, তাহা গণনায় মধ্যেই আসিতে পারে না। প্রথম

ও চতুর্থ বিভাগের মধ্যে উভয় উভয়ের তুলনে, মাটি যে কতই পৃথক্ ধর্ম্মাক্রান্ত, তাহা অতি স্পষ্টরূপে গঙ্গার দক্ষিণে রাজমহলের পার ও উত্তরে মালদহের পার, এ দুইয়ের মাটি তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজমহলের পারে গঙ্গার জলের ধার পর্য্যন্ত, এবং পাথর ও কাঁকরযুক্ত কঠিন রাস্তা, মেটেল মাটি; আর ঠিক তাহার ওপারের সমস্ত জমি, অথবা সমস্ত মালদহ জেলাই দো-আঁস পলী মাটিযুক্ত অথবা কেবল রাজমহল ও মালদহের পার লইয়াই বা বলি কেন, সমস্ত ভাগীরথী ব্যাপিয়া দুই পারের মাটির তুলনা করিলেও, তদুভয়ের মধ্যে বিপুল যে প্রকৃতি ভেদ তাহা সামান্য দৃষ্টিতেও অতিক্রম করিয়া যাইবে না। অবশ্য ভাগিরথীর পশ্চিম পারের নিতান্ত ধারের মাটি লইয়া তুলনা করিও না, তাহা হইলে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইবে না। যে পর্য্যন্ত নদীর ক্রিয়ায় মাটির ভাঙ্গা গড়া হইতেছে বা পূর্ব্বকালে হইয়া গিয়াছে, তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া তবে, মাটির সঙ্গে তুলনা করিলেই, আমার কথার সার্থকতা অনুভব করিতে পারিবে।

এই চতুর্থ বিভাগের আয়তন, পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা ও তাহার শাখা প্রশাখা, পূর্ব্বে ধলেশ্বরী ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র। এই চতুঃসীমাবর্ত্তী ভূভাগকেই গাঙ্গের বদ্বীপ কহে। বদ্বীপের সমস্ত ভূমিভাগই, পদ্মা এবং তাহার অসংখ্য শাখা নদী সমূহের প্রবাহ দ্বারা আনীত মৃত্তিকার সমুদ্র ভরাট হইয়া ক্রমে ক্রমে চর পড়িতে থাকায় নির্ম্মিত হইয়াছে। একজন্ত ইহার সমস্ত ভূভাগই পলী মাটি জাত এবং এখন পর্য্যন্ত, মধ্যে মধ্যে সামান্য টুকরা ভূখণ্ড ব্যতীত, প্রায় সর্ব্বত্রই পলী মাটির চিহ্ন সকল অতি সুস্পষ্ট এবং কোথাও কোথাও একেবারেই অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফলতঃ পলী মাটি জাত বলিয়া, এ ভূভাগের প্রায় সমস্ত জমির উর্ব্বরতা-শক্তিও এত অধিক যে, তাহার সঙ্গে অপর কোন বিভাগের মৃত্তিকা তুলনাই হইতে পারে না। এখানে বৎসরের মধ্যে একই জমিতে বহুবার ফসল হইয়া থাকে এবং জমি পতিত থাকিলেও যত শীঘ্র জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়, এত আর কোথাও হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা নিরস জমি প্রথম বিভাগীয়: তথায় জমি বহুদিন পতিত থাকিলেও, চতুর্থ বিভাগের জমির ন্যায়, ঘন জঙ্গলপূর্ণ অবস্থা কোনকালেই হইতে দেখা যায় না; অথবা তথায় উদ্ভিদাদির বৃদ্ধি ও বিকাশও তাদৃশ সতেজ বা শীঘ্রতর নহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগীয় জমির উর্ব্বরতা গুণ প্রায়ই এক সমান এবং প্রথম বিভাগীয় জমি অপেক্ষা বহুগুণে সতেজ এবং কোন কোন অংশে এমন কি চতুর্থ বিভাগের অনেকটা অনুরূপ।

চতুর্থ বিভাগের মাটি এবং তৃতীয় বিভাগের মাটি, উভয়ই যদিও সমুদ্র ক্রমে সরিয়া যাওয়ায় জাগিয়াছে বটে; কিন্তু ইহাদের নির্ম্মাণ প্রকরণে যে বিভিন্নতা অনেক, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তৃতীয় প্রকারে মাটি নির্ম্মাণে সমুদ্রের নিত্য জোয়ার ভাটার সময় জল সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভাটার সময় যে প্রকার

২২

সমুদ্রের ঢালু তীর ভূমিতে স্তবকে স্তবকে দাগ রাখিয়া জল নীচে গিয়া সরিয়া পড়ে; এখানেও সেইরূপ কোন নৈসর্গিক কারণবশে কালক্রমে যেমন সমুদ্র জল স্তবকে স্তবকে সরিয়া গিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি জমির উদয় হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়ুর প্রবল আঘাতে বালুকারাশি স্তূপীকৃত হইয়া ও তথাবিধ কারণে ক্রমোত্তর পুষ্টিলাভ করিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বালিয়াড়ী সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ প্রকারের মৃত্তিকা নির্ম্মাণ করিবার প্রকরণ অন্যবিধ।

যিনি বাঙ্গালার দক্ষিণস্থ চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণভাগ এবং সুন্দরবনের অবস্থা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়াছেন, তিনি এই চতুর্থ প্রকার ভূমি-নির্ম্মাণের কৌশল অতি সহজেই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। নদীপ্রবাহে আনীত মৃত্তিকার ক্রিয়াযোগে যখন নদীর সঙ্গম স্থলে সমুদ্রে চর পড়িতে থাকে, তখন তাহা একেবারে খানিকটা পরিমাণ স্থান লইয়া ও তাহার চারিচৌকা সমান ভরাট হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঁচু হইয়া উঠিতে দেখা যায় না। নদীপ্রবাহ দ্বারা আনীত মৃত্তিকা সমুদ্র-গর্ভে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে লম্বা ত্রিকোণ ক্ষেত্রের আকারে সমুদ্রকে ভরাট করিবার চেষ্টা করে এবং ঐ ত্রিকোণক্ষেত্রের ভূমিদেশ নদীর মুখে এবং অগ্রবর্ত্তী কোণ সমুদ্রের দিকে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের প্রবল স্রোত-বেগ, যে যে স্থান পরিসরে অতি অল্প, তাহা কাটিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, এতন্নিমিত্ত যখন ভরাট স্থান ক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া উঠে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক অবিচ্ছিন্ন ত্রিকোণ ভূখণ্ড নির্ম্মিত হওয়ার পরিবর্ত্তে কতক অংশ মূল ভূভাগে সংলগ্ন এবং অবশিষ্ট বহুখণ্ড দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে এবং সে গুলির প্রায়ই, বিশেষতঃ যেটি ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত নিশ্চয়ই, নদীমুখ হইতে সমুদ্রাভিমুখে অল্পবিস্তর যেমন হউক লম্বা আকার প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ, ভরাট ভূখণ্ড যখন ক্রমে জমাট বাঁধিয়া যায়, কিন্তু জল ছাড়াইয়া জাগিয়া উঠে নাই; তখন সমুদ্র জলের স্রোত-বেগ যদিও আর তাহাদিগকে কাটিয়া বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে নিম্ন ও নরম অংশ সকল কাটিয়া তথায় গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে এবং এই সকল গভীর রেখাই, জমী জল ছাড়াইয়া উঠিলে, তখন তাহার মধ্যে অনেক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদী এবং খালের আকার ধারণ করে। উহাদের জলক্রিয়া দ্বারা নবোদিত ভূমি পুনর্ব্বার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ও ক্রমাগত জোয়ারের প্রবলতায় প্লাবিত হইয়া, পলিমাটির দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইলে, তখন তাহা একরূপ চিরদিনের মত স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। তখন অপেক্ষাকৃত পূর্বনির্ম্মিত মাটি হইতে নদীনালা বিরল হইয়া, অপূর্ণ নিম্নভাগে সরিয়া পড়ে এবং তথায় পুনরায় তথাবিধরূপে নির্ম্মাণের কার্য্য করিতে থাকে। পূর্ণনির্ম্মিত অংশে তখন যে কিছু নদী ও খাল থাকে, তাহা গণনায় ও আয়তনে সামান্য এবং তদ্বারা ভাঙ্গা গড়ার কার্য্যও এত মৃদু হইয়া উঠে যে, তদ্দ্বারা বহুকালেও দেশমধ্যস্থ মৃত্তিকাতে বিশেষ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। গাঙ্গেয় বদ্বীপ এইরূপেই

গঠিত হইয়াছে এবং এখনও উহার দক্ষিণভাগের গঠন ক্রিয়া উক্ত প্রকারে পূর্ণপ্রতাপে চলিতে থাকায়, নিত্য নিত্য মনুষ্যের বাস ও ব্যবহার উপযোগী নূতন নূতন ভূমিখণ্ড সমুদ্রজল ছাড়াইয়া উদয় হইতেছে। উপরে যে প্রকারের ভূগঠনপ্রক্রিয়া বলিলাম, এখনও তাহার অভিনয়ে, সমুদ্রগর্ভের অনেক দূর লইয়া নদী সকলের আনীত মৃত্তিকায় নির্ম্মিত এমন অসংখ্য চর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা এখনও জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু ভাটার সময় জাগিয়া উঠে, তখন স্রোতবেগে তাহাদের উপর নদী ও খালের যে খাতরেখা পড়িয়াছে, তাহা অতি সুন্দর ভাবে জাগা জমির পৃষ্ঠে নদী ও খালের আকারে প্রকাশ হইতে থাকে। উহারই মধ্যে আবার যে সকল ভূখণ্ড সমুদ্র জল ছাড়াইয়া মনুষ্যের ব্যবহার উপযোগী হইয়াছে, তাহার কতকাংশ বা মূল দেশ ভূমির সহসংলগ্ন, কতক বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে পরিণত এবং এ সকলের সর্ব্বত্রই বৃহৎ বৃহৎ ও বিস্তারশীল নদী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল উভয়েরই দ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। এ সকল নদী খাল যেমন একদিকে বিপুল বেগে ভাঙ্গা গড়ার কার্য্য করিতেছে, তেমনি অন্য দিকে প্রতি জোয়ারে অতিশয় কর্দ্দমময় ঘোলা জলে সমস্ত স্থান প্লাবিত করিয়া পলি মাটির দ্বারা তাহার কলেবর বর্দ্ধন করিতেছে। কালে যে এ সকল নদীনালাও সরিয়া যাইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকল দেশভাগে সংলগ্ন হইয়া একাকার ধারণ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গৌড়ের পূর্ব্বদক্ষিণস্থ সমুদ্র যখন উক্ত প্রকারে ভরাট হওয়াতে উন্নত ভূখণ্ডের উদয়ে ক্রমেই দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছিল এবং যখন সেই উন্নত ভূখণ্ডও বর্ত্তমান সুন্দরবনের ন্যায় অসংখ্য নদী ও খাল পড়িয়াছিল, সেই সকল নদী ও খালের মধ্যে এখনকার ন্যায় তখনও সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রবল নদীধারা ছিল গঙ্গার মূল প্রবাহ।

কিন্তু এই মূলপ্রবাহ, যাহা বর্ত্তমান কালে পদ্মার আকারে এমন দুর্জ্জয় ও প্রসারণশীল দেখা যাইতেছে, তাহা তখন কোন্ বিশেষ খাদ দিয়া প্রবাহিত হইত? প্রথমতঃ নদী সকলের ধর্ম্ম প্রায়ই এরূপ যে, দুই পারের মধ্যে যে দিকে অপেক্ষাকৃত মাটির কঠিনতা হেতু পার্শ্বপ্রসারণ পক্ষে বাধা বেশী, সেইখানেই তাহার ধারা প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রাভিমুখে গমনকালীন, যে পথ অতি সোজা অথচ অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি, সেই পথ যেখানে কঠিন মাটির বাধা বা অধিকার দেশ হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও, নদীস্রোত প্রথমে সেখান দিয়াই গমন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই, নিজের নৈসর্গিক ধর্ম্ম অনুসারে, পার্শ্বের নরম মাটি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, কঠিন মাটির বাধা যেখানে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখনকার কালে, বর্ত্তমান ভাগীরথীর পূর্ব্বকূল হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তরে দ্বিতীয় বিভাগীয় ও পূর্ব্বে তৃতীয় বিভাগীয় এই ভূখণ্ডদ্বয়ের সংযোক্ত রেখা পর্য্যন্ত, চরভূমি, জলাভূমি, সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত অসংখ্যচর

ইত্যাদি বদ্বীপ বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এই সকল কারণ ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, গঙ্গার যে দুর্জ্জয় মূলপ্রবাহ এখন পদ্মার খাদ দিয়া চলিতেছে, তখন তাহা বর্ত্তমান ভাগীরথী খাদ দিয়া, পদ্মারই ন্যায় সমপ্রবল অথবা হয়ত প্রবলতর বেগেই প্রবাহিত হইত। এখনকার ন্যায় তখনও গঙ্গার অপর যে অসংখ্য শাখা প্রশাখা ছিল, তাহারা ভাগীরথীর পূর্ব্বস্থ তাৎকালিক সেই অসম্পূর্ণ বদ্বীপের বহুলাংশ ব্যাপিয়া আপনাপন জলরাশি ঢালিত। এখন যাহাকে পদ্মা বলা যায়, তখন তাহার অস্তিত্ব আদৌ ছিল কি না সন্দেহ; অথবা থাকিলেও হয় ত, সেই অসংখ্য শাখা প্রশাখার মধ্যে, কোন একটী শাখা পদ্মানামে গণিত হইত এবং এখনকার তুলনায়, তখন যে তাহার প্রবলতা অতি সামান্য ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফলতঃ সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায়, যখন বদ্বীপ সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রথম উত্থিত হয়, তখন মূলগঙ্গার প্রবাহ ভাগীরথী খাদ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল বলিয়াই লোকে উহাকে গঙ্গা ও উহারই সাগরসঙ্গমকে গঙ্গাসাগরসঙ্গম বলিত এবং তৎস্বরূপেই উহা এতকাল গণিত ও মানীত হইয়া আসিতেছে। নতুবা, এরূপ বিশিষ্ট কারণ ভিন্ন, গঙ্গার এত বড় বড় শাখা প্রশাখা এবং তাহার মূলস্রোতস্বরূপ পদ্মা, এ সকল থাকিতে তাহাদিগকে ফেলিয়া, সামান্য একটা খাদ ভাগীরথীকে যে লোকে আসল ও মূল গঙ্গা বলিয়া মানিবে, এটা প্রকৃতপক্ষে বড়ই আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় কথা হইয়া পড়ে।

বোধ হয়, যখন বদ্বীপের আর সমস্ত অপূর্ণ ও তাহার স্থানে স্থানে অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া চরভূমিসম্বলিত সমুদ্র খাড়ী সকল প্রবাহিত হইতেছিল এবং হয়ত যখন গৌড়ের অদূরে পর্য্যন্ত সে খাড়ীর শিরোদেশ বর্ত্তমান ছিল, তখনও ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলস্থ ভূমি দক্ষিণে অনেকদূর বিস্তৃত ও নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ এরূপ বিবেচনা ভিন্ন এ দুই কথায় একথা সঙ্গতি হইতে পারে না;—অর্থাৎ প্রথমতঃ রাজতরঙ্গিণী অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, বারশত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়ের অতি নিকটেই সমুদ্রের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত পেরিপ্লসে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে তেজপত্র ও অপরাপর বাণিজ্যদ্রব্য গঙ্গা বাহিয়া নৌকা ও জাহাজ যোগে গাঙ্গের বন্দর অর্থাৎ তমোলুক বা তাম্রলিপ্তিতে আনীত হইত। অবশ্যই গঙ্গার মূল প্রবাহ ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত না থাকিলে আর, বাণিজ্যতরী উত্তরবঙ্গ হইতে গঙ্গাবাহী বাহিত হইয়া তমোলুক মুখে আসিতে পারে না। কিন্তু একটা কথা, মূল গঙ্গা ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত থাকিলেও, তদ্দ্বারা এখন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই যে, গঙ্গা তখন তমোলুক পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এখন যেমন মেঘনার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট সমুদ্র খাড়ীকেও মেঘনা বলিয়া থাকে; তখনও সেইরূপ গঙ্গার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট এবং তমোলুকের তটবাহী সমুদ্রখাড়ীকেও গঙ্গা বলিয়া ডাকিত এবং সেই অর্থেই পেরিপ্লসে,

গাঙ্গের বন্দরে বাণিজ্য দ্রব্যাদির প্রসঙ্গে গঙ্গারই নির্বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত অনুমানই যে ঠিক, তাহার আনুষঙ্গিক এই দুইটী প্রমাণও পেরিপ্লস হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—১ম গঙ্গার উপর বাণিজ্যদ্রব্য বহনার্থে যে সকল নৌকা ব্যবহৃত হইত, তাহারা সমুদ্রগামী পোত ; নদীতে যে সকল নৌকা যাতায়াত করে, তাহারা সম্ভবতঃ তথায় যাইতে সাহস পাইত না বলিয়াই এই সামুদ্রিক পোতের ব্যবহার ছিল। ২য়—বন সন্নিবিষ্ট জনপদ ও বাণিজ্য বন্দরাদি সহ "খ্রুসে" নামক একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ গঙ্গার মুখে ছিল।[১] অবশ্যই গঙ্গা দক্ষিণভাগে নদীর পরিবর্ত্তে বহুবিস্তৃত সমুদ্র খাড়ী না হইলে আর পেরিপ্লসের এ দুই কথায় সঙ্গতি হয় না।

ভাগীরথী খাদে গঙ্গা বড় কম দিন প্রবাহিত ছিল না। যেহেতু গঙ্গার উক্ত খাদে প্রবাহিত হওয়ার প্রথম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে পেরিপ্লসে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় শকের প্রথম শতাব্দীতে এবং শেষ পরিচয় চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াঙের বিবরণে,[২] তাহা খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে। এই ত প্রায় ছয়শত বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে, মূলগঙ্গার ভাগীরথীখাদে গতি এবং ইহার পরেও যে কতদিন পর্য্যন্ত গঙ্গা তাহার মূল প্রবাহ ঐ খাদে ঢালিয়া ছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? আমার বোধ হয়, হিউএন্‌সিয়াঙের কিছুকাল পরেই, যখন ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলস্থ মাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং বৎকালে বদ্বীপের অপরাংশেও বহুল পরিমাণে ভূমিখণ্ড সকল নির্ম্মিত ও জলরেখা ছাড়াইয়া মস্তকোত্তলন করিয়াছে, সেই সময়েই বিবিধ নৈসর্গিক কারণের প্রবলতায়, গঙ্গার মূলস্রোত ভাগীরথী খাদ পরিত্যাগ করিয়া, পদ্মা নাম গ্রহণ ও স্বতন্ত্র খাদ অবলম্বন পূর্ব্বক, ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলের আরও উত্তর পূর্ব্বভাগে সরিয়া গিয়াছিল। এখনও পদ্মা উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছে। গত শত বৎসরের মধ্যেও পদ্মা কতটা সরিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার কাছে যে ছোট খালটি এখন পালঙের নিম্ন দিয়া বহিয়া কীর্ত্তিনাশায় গিয়া মিশিয়াছে, তাহা ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মার মূল খাদ ছিল ; কিন্তু এখন পদ্মা তাহার ১৬।১৭ ক্রোশ উত্তরে। অনূ্যন ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে, যে ক্ষুদ্র নদী কুমার নামে ফরিদপুর জেলার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তাহাও বহুদাংশেই পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ ছিল। তাহা হইতে পদ্মা এখন বড়ই সরিয়া গিয়াছে।

পেরিপ্লসে তমোলুক পর্য্যন্ত গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ার কথা লিখিত আছে ; একজ

১। Mc Crindle's Periplus of the Erythrean, p. 142-143.

২। হিউএন্‌সিয়াং যদিও ঠিক স্পষ্ট কথায় গঙ্গার পথ নির্দ্দেশ করেন নাই, তথাপি তাহার ভ্রমণ বিবরণ পাঠ করিলে, তদ্দ্বারা গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত বলিয়াই বোধ হয়। হিউএন্‌সিয়াঙের বিবরণে কালকাতা প্রভৃতি স্থানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না।

হইতে পারে. কলিকাতা প্রভৃতি স্থানও তখন সমুদ্রগর্ভ হইতে ঈষদ্ধিক উন্নত হইয়াছিল, কালে পুনর্ব্বার তাহা বসিয়া যাওয়ায় তথায় সমুদ্রপ্রবাহ প্রবাহিত হয় এবং ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বেও যে সমুদ্রপ্রবাহ সরিয়া যায় নাই। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ যে এক সময়ে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া কিছুকাল বাদাবন থাকিয়া, তাহার পর আবার সমুদ্রগর্ভে বসিয়া গিয়াছিল, তাহার অনেকই প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। কলিকাতার ভূতত্ত্বপরীক্ষা-দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের ৩০।৩৫ ফুট নিম্নে এখনও উদ্ভিজ্জের সুন্দরী ও অন্যান্য বাদাবনসুলভ বৃক্ষাদির স্কন্ধ অর্থাৎ গুড়িসকল দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন বহুদিনব্যাপী বনবৃক্ষাদির স্তর দীর্ঘকাল মাটির নীচে থাকিলে যেরূপ পাথুরে কয়লা হইয়া যায়, এই সকল স্থানের নিম্নে তদ্রূপ অপরিণত পাথুরে কয়লায় সামান্য স্তরও লক্ষিত হয়। কলিকাতা শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেসনের মধ্যে যে বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার খননকালে ভূতত্ত্বশাস্ত্রদর্শী ব্লানফোর্ড সাহেব ঐ স্থানের যে ভূতত্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় যে, ঐ স্থানের ৩০ ফুট নিম্নে, অপরিণত অবস্থায় পাথুরে কয়লার স্তর আছে এবং সেই স্তরের মধ্যেও দণ্ডায়মানভাবে কতকগুলি সুন্দরী গাছের গুঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। স্তরস্থিত কয়লা এখনও সম্পূর্ণতঃ পাথুরে কয়লায় পরিণত না হওয়ায়, উহাতে এখনও অগ্নি সংলগ্ন হয় না। এই স্তর সমস্ত কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান লইয়া বিস্তৃত। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার স্তরের যেরূপ ধর্ম্ম দেখা গিয়াছে, এখানেও সেইরূপ। ঐ অপরিণত স্তর সর্ব্বত্র সমগভীর মাটির নিম্নে নহে। শিয়ালদহে যাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০ ফুট নিম্নে, কেল্লার কাছে তাহাই ৫১ ফুট নীচে নামিয়া গিয়াছে; আবার কোম্পানির বাগানের কাছে তাহা অতি অল্প মাটির নিম্নেই দৃষ্ট হয়। মাটি এরূপ বসিয়া যাওয়ার পক্ষে, ভূকম্পনাদি নানাবিধ নৈসর্গিক কারণই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ভূকম্পন ব্যতীত, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়াতেও ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানই ধীরে ধীরে কোথাও বসিয়া যাইতেছে এবং কোথাও বা উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্যার পুস্তকে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। শুনিতে পাই নাকি, ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ঐরূপ ধীরে ধীরে বসিয়া যাইতেছে।

উপরোক্ত সামান্য এবং মোটামুটী কয়েকটী ভূতত্ত্ববিদ্যার দ্বারা এক্ষণে আমরা এই পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিতেছি যে, এই বঙ্গদেশের বর্ত্তমান আকার এবং লোকের বাসভূমি এখন যেমন দেখিতে পাই, বারশত বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা নিরূপিত হইতেছে যে, তাৎকালিক দৃশ্য সংক্ষেপতঃ এরূপ ছিল। গঙ্গার মূল স্রোত, যাহা এখন পদ্মা দিয়া যাইতেছে, তাহা তখন ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত এবং সেই প্রবাহ কলিকাতার অনেক উত্তরে সমুদ্রে সংমিলিত ছিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন, অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্বীপাকার বহুসংখ্যক চরের

আকারে বিস্তৃত ছিল। শুকসাগর, শুকচর, অর্থাৎ শুষ্কসাগর, শুষ্কচর; খড়দহ, এড়িয়াদহ, প্রভৃতি দহ; ইত্যাদি নাম সে পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শুকসাগরাদি স্থানের উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলস্থ ভূমি তখন বা তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই উদয় হইয়াছিল; যেহেতু বদ্বীপের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই স্থানের ভূমিভাগ অনেকটা শুষ্ক ও অপেক্ষাকৃত কঠিন আকারে দৃষ্ট হয়। তাহা হইলেও, তৎকালে অতিশয় নদী-বহুলতা হেতু, অনেক স্থান যে দ্বীপাকারে অবস্থিত ছিল, সে পক্ষে অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপান্তক নামই তাহার সাক্ষ্যস্থল। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সুন্দরবনের যে অবস্থা, বদ্বীপের আর সমস্ত স্থানেও সেই অবস্থা ছিল অর্থাৎ কোথাও জলাজমী, কোথাও অন্তঃপ্রবিষ্ট সমুদ্রখাড়ী, কোথাও জলমগ্ন চর, কোথাও নিবিড় বাদাবন এবং যেখানে যে ভূমী সমুদ্রগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই তাহা "পঞ্চনত" বা অসংখ্য নদনদীতে বিভক্ত ও বেষ্টিত হইয়া আছে। এ সকল অপেক্ষাকৃত বহু আধুনিক কালে স্থাপিত 'কাটি', 'দিয়া' ও 'চর' ইত্যাদি নামবিশিষ্ট গ্রাম ও জনপদ সকল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ফলতঃ তৎকালে এই বদ্বীপের যদি কোন কোন স্থানে লোকাবাস হইয়া থাকে, তবে তাহা ভাগীরথীর পূর্ব্বতটস্থ কতক স্থান লইয়া; নতুবা আর সমস্ত যে বাসের অযোগ্য ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। গাঙ্গেয় বদ্বীপ যে তখনও যথোচিত বসবাসযোগ্য হয় নাই, তাহার আর একটা বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়েশ্বর রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ও বেদবিৎ যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, কালে তাঁহাদের ও তাঁহাদের ভ্রাতৃবর্গের পুত্র পৌত্রাদিতে ১৫৯ বা তদ্বধি উচ্চ সংখ্যক পরিবার হয়।[1] পরবর্ত্তী গৌড়েশ্বরগণ, তাঁহাদের অধিকার মধ্যে সদ্ব্রাহ্মণ স্থাপনার্থে এই ১৫৯ পরিবারকে রাঢ় ও বারেন্দ্রভেদে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বসবাস করাইবার জন্য, ইহাদিগকে ১৫৯ গ্রামে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে, এই ১৫৯ গ্রামের একটীও গাঙ্গেয় বদ্বীপের মধ্যে নাই; সমস্তই উত্তর বঙ্গে, ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থ পশ্চিম বঙ্গে, বিক্রমপুরের নিকট তাৎকালিক পূর্ব্ববঙ্গে অর্থাৎ বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরভাগে। অথচ এখনকার দৃষ্ট ধরিয়া

১। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা গোড়া হইতেই ৫৬ গ্রামে স্থাপিত; সুতরাং গোড়া হইতেই তাঁহাদের ৫৬ গাঁই নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের যে ১০০ গাঁই শুনিতে পাই, বোধ হয় তাহার কতকগুলি, হিন্দু গৌড়েশ্বরগণ গত হওয়ার পরেও নিরূপিত হইয়াছিল। যাহাহউক, এস্থলে তাহার সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন নাই। গৌড়েশ্বরগণ যখন দেশমধ্যে ব্রাহ্মণ স্থাপন করেন, তখন ঠিক ১৫৯ পরিবার না হইলেও, তদ্রূপ কোন এক সংখ্যাই ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং প্রবন্ধভাগে উক্ত ১৫৯ সংখ্যার দ্বারা পাঠকগণ সেই পর্য্যন্ত বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে। কোন কোন মতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গাঁই সংখ্যা ৫৩, কিন্তু সেটা ঠিক নহে। ৫৬ সংখ্যাই ঠিক বলিয়া জানা যায়।

বলিতে গেলে, গাঙ্গের বদ্বীপের তুল্য রমণীয়, শিষ্ট নিবাসযোগ্য স্থান ঐ সপ্ত গ্রামের একটিতেও নাই ; বিশেষ তাহা আবার গঙ্গার তীর। বর্দ্ধমান জেলার চৌৎখণ্ড প্রভৃতি স্থানে পর্য্যন্ত এই ১৫৯ পরিবারের কাহাকে কাহাকে বসান হইয়াছে, অথচ নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও তৎসন্নিহিত অপরাপর স্থান উপেক্ষিত হইয়াছে ; বদ্বীপের অন্যান্য স্থানেরত কথাই নাই। এ বড়ই আশ্চর্য্য কথা বলিতে হইবে। আমি উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, এ আশ্চর্য্য ঘটনার সেইরূপ কারণ ভিন্ন আর কিছুই নির্দেশিত হইতে পারে না। বদ্বীপের কোনস্থান তখন শিষ্ট নিবাসোপযোগী থাকিলে, তাহাকে সদ্ব্রাহ্মণশূন্য রাখা কখনই গৌড়েশ্বরগণের অভিপ্রেত হইত না।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের অবস্থা যদি তখন এইরূপই ছিল, তবে তখনকার দেশ বিভাগ কিরূপ ছিল, তাহার একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং কাজিনগড়ের পরেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। কাজিনগড় ঠিক কোন স্থানে তাহা হিউএন্‌সিয়াঙের ইংরেজী অনুবাদক ঠিকরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। বর্ত্তমান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসন যথায়, তাহারই নিকটবর্ত্তী দেশকে কাজিনগড় বলিয়া অনুমান করা যায়। তথায় পর্ব্বতোপরি তেলিয়াগড় নামক প্রাচীন কেল্লা, গৃহাদির অনেক সুরম্য ও সুন্দর ভগ্নাবশেষ এবং অনেক ভগ্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক, এই কাজিনগড় ও কুশীনদীর পূর্ব্বতট হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পূর্ণিয়া, মালদহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, কোচবেহার প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পূর্ব্বে এবং ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া পূর্ব্বমুখে প্রধাবিত সমস্ত ভূভাগ, ইহা লইয়া প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্য।

এখানে হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে প্রায় ২৫০ মাইল দক্ষিণে সমতট রাজ্য। এই দূরত্ব নিরূপণে, বোধ হয়, সমতট রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাহার রাজধানীর দূরত্ব নিরূপণই হিউএন্‌সিয়াঙের অভিপ্রেত। বর্ত্তমান ঢাকা, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলা বোধ হয় সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এই রাজ্য পদ্মার বর্ত্তমান খাতের দক্ষিণেও কিছুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিবার কথা ; কালে এই দক্ষিণাংশ, পদ্মা আরও উত্তরে অর্থাৎ তাহার বর্ত্তমান স্থানে সরিয়া যাওয়ায়, গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ সেকালের সমতট রাজ্যের আয়তন এ কালে যে পদ্মার গতির দ্বারা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল সেকালের সমতট কেন ?—এ কালের বিক্রমপুরেরও পদ্মার গতির দ্বারা বহুল রূপান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সংলগ্ন ভূখণ্ড ছিল, কিন্তু এক্ষণে মধ্যস্থল দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হওয়ায়, উত্তর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, সমতটের দক্ষিণস্থ ভূভাগ যে সমুদ্রতট বাহিয়া অবস্থিত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

সমতট এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বস্থিত ভূভাগ সকল, অর্থাৎ আধুনিক ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান তৎকালে কিরাতাদি বিবিধ অনার্য্য নিবাস ছিল।

ওদিকে আবার কাজিনগড়ের দক্ষিণ হইতে এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তট বাহিয়া প্রাচীন বঙ্গরাজ্য। দক্ষিণে মেদিনীপুরের সীমা পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে যে বঙ্গ নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ এই বঙ্গ। ইহা কোন কোন সময়ে রাঢ় ও কর্ণসুবর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইত। উহার দক্ষিণ ভাগস্থিত বর্দ্ধমানাদি প্রদেশ রাঢ় এবং তাহার উত্তরস্থ ভূভাগ কর্ণসুবর্ণ বলিয়া নিরূপিত হয়। গৌড়নগর গোড়ায় প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেরই অন্তর্গত ছিল ; পরে গৌড়নগর প্রবল হইয়া উঠায়, সমস্ত বঙ্গরাজ্য এবং ক্রমে বর্ত্তমান সমস্ত বাঙ্গালা দেশই গৌড় দেশ ও গৌড়রাজ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। গৌড় নাম প্রবল হওয়ায়, কালে বাঙ্গালার সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ ও তাহাদের নাম সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থ প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণ হইতে, সম্ভবতঃ সমস্ত মেদিনীপুর জেলা এবং বালেশ্বর জেলারও কিয়দংশ লইয়া তদানীন্তন তাম্রলিপ্তি রাজ্য। বর্ত্তমান তমোলুক নগর উহার রাজধানী এবং বাণিজ্য বন্দর ছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে ১১৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে[*] যে, রাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চশত নদীসমন্বিত গঙ্গাসাগরে তীর্থস্নানাদি করিয়া, তথা হইতে ভ্রাতৃগণ সহ সমুদ্রের ধারে ধারে গমন করিয়া, কলিঙ্গ নামক দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। ঐ কলিঙ্গের মধ্যে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। এখানে বলা বাহুল্য যে মহাভারতে এই নির্দ্দেশ দ্বারা এমন কিছু বুঝায় না যে, তাম্রলিপ্তি রাজ্য ছিল না। অথবা তখন না থাকিলেও, বারশত বৎসর পূর্ব্বে যে ছিল তাহা নিশ্চয়।

উপরে দেশাদির অবস্থান সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, তাহাই এখানে যথেষ্ট হউক। এই সকল দেশাদির অবস্থান ইতিপূর্ব্বে "বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব" প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* । "স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত॥
এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।"

বনপর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়।

লোকনাথদাসের সীতাচরিত্র।

যে শিশু ভাবি-জীবনে জয়যুক্ত, দুগ্ধপোষ্য অবস্থাতেই তাহার কতক চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়; যে গাছ বাঁচিবে, অঙ্কুরেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গভাষার সুদূর অতীত আলোচনা করিলে আমরা এ কথার কতক প্রমাণ পাই। বঙ্গভাষার উৎপত্তির প্রাচীনতা যত দূরই হউক, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই এই অভিনব ভাষার শৈশব জীবনে এক বৈদ্যুতিক তেজ—সজীবতার বিশিষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হয়। তখনকার সুপ্রচারিত কাব্য চৈতন্যভাগবত,* ইহার—

"নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর,
ভাগীরথী তীরে তীরে।
যার পদধূলী, হই কুতূহলী,
সবেই ধরিল শিরে॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
শ্রীভুজ তুলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
বলে হরি হরি বাণী॥"

ইত্যাদি অংশ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তখনই বঙ্গভাষা কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সে সময়ের সুপ্রচারিত দার্শনিক গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত। নবীন বঙ্গভাষায় গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ব্যক্ত হইতে পারে, কঠিন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিবৃত করা যাইতে পারে, চরিতামৃত তখনই ইহা প্রদর্শন করিয়াছে। তখনই আমরা বঙ্গভাষায় গদ্যরচনার পরিস্ফুট চেষ্টা দেখিতে পাই। †

কিছুদিন হইল, আমরা গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত আরও একখানি গদ্য গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার নাম "আশ্রয় নির্ণয়।" ‡ ইহার আরম্ভ এইরূপ—

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩য় ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় "ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ" প্রবন্ধে অনবধানতাবশতঃ চৈতন্যভাগবত রচনার কাল ১৪৯২ শক লিখিত হইয়াছে; বস্তুতঃ ইহার অনেক পূর্ব্বে ১৪৫৯ শকে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত রচনা করেন। পূর্ব্বে ইহার চৈতন্যমঙ্গল নাম ছিল। ১৪৯২ সালে চৈতন্যভাগবত নামকরণ হয়। [জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

† আমরা অবগত আছি যে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৩০০ বর্ষের লিখিত একখানি বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ পাইয়াছেন। ১১৮০ সালের লিখিত আর একখানি গদ্য গ্রন্থ আমরা তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছি।

‡ ঐ নামে অন্যেও অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ দেখিয়াছি।

"অথ আশ্রয় নির্ণয়। আশ্রয় পঞ্চ প্রকার। নাম আশ্রয়। মন্ত্রাশ্রয়। ভাবাশ্রয়। প্রেমাশ্রয়। রসাশ্রয়। এই পঞ্চ প্রকার। তথাহি রসভক্তিচন্দ্রিকায়াং।" এই স্থানে পঞ্চ আশ্রয়ের ব্যাখ্যা পত্রে আছে। তৎপর—"ভক্তি বলি কারে? ভক্তি শ্রীগুরুর চরণ। ভক্তির অঙ্গ কি? নামাশ্রয় মন্ত্রাশ্রয় সদা সেবা। অঙ্গ ভাব। ভাব বলি কারে? সিদ্ধ দেহকে ভাব বলি। ভাবের অঙ্গ কি? সদা সেবা। সেবা কয় মত? সেবা দুই মত। সাধকরূপে বা সিদ্ধ রূপে। তথাহি"—এই স্থানে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যত্র—"অথ সিদ্ধদেহ। সিদ্ধদেহের আখ্যান তিন প্রকার। প্রবর্ত্তের দাস আখ্যান। সাধকের মঞ্জরী আখ্যান। সিদ্ধের সখী আখ্যান।" অতঃপর দশা বর্ণন ও ইহা হইতেও কিছু নমুনা দিতেছি—"অহেতু নবম দশা বড় বিষম। অন্তরে ব্যাকুল বাহিরে অচেতন। দশম দশা সহিতে পারি না। ভক্তি সে মরিকে চাহি তমালের তলে॥ এই দশম দশা শ্রীমতি রাধিকার। পূর্ব্বরাগ হৈতে নন্দের নন্দনে কিঞ্চিৎ রতি॥ রতি তিন প্রকার। সামর্থী। সামঞ্জসা। সাধারণী। সামর্থীরতির পাত্র শ্রীমতী রাধিকা। সামঞ্জসা রতির পাত্র রুক্মিণী। সাধারণী রতির পাত্র কুব্জা।" ইত্যাদি।

চৈতন্যচরিতামৃতে "কামগায়ত্রীর" ব্যাখ্যা যেরূপ লিখিত, ইহাতেও সেইরূপই লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থে একটী মাত্র ভণিতা আছে, তাহা পদ্যে লিখিত—

"শ্রীরাধা গোবিন্দ পাদাম্বুজে করি আশ।
আশ্রয়-নির্ণয় কথা কহে কৃষ্ণদাস॥"

এইরূপ গদ্যে ও পদ্যে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। যাহা হউক, পূর্ব্বকালে বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তাগণ সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। ঈদৃশ প্রতিভাশালী মহাজনগণের সহায়তা না পাইলে বঙ্গভাষা আজ বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইতে পারিত কি না, কে জানে? এইরূপ উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতগণের রচনা প্রায়ই জটিলতাবর্জ্জিত—প্রাঞ্জল। অদ্য আমরা বৈষ্ণব-জগতে পূজিত এইরূপই এক গ্রন্থকারের পরিচয় দিব; ইনি গৌরব মহিমায় শ্রীরূপাদির সমকক্ষ ছিলেন; ইঁহার রচনাও যথা সম্ভব সহজ ও সরস। আমরা লোকনাথ গোস্বামী প্রণীত সীতাচরিত্রের কথা বলিতেছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে নারীচরিত একখানির অধিক দেখি নাই, সেই একখানিই সীতাচরিত্র।[২]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান অনুসঙ্গী নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু। যশোহরের তাল-খড়ি গ্রামবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী এই অদ্বৈতের বাল্য সখী ছিলেন; পদ্মনাভ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং পরম পণ্ডিত ছিলেন।[৩] বৃদ্ধবয়সে পদ্মনাভের একটি পুত্র জন্মে

২। সীতা-চরিত্র মুদ্রিত হয় নাই। আমরা যে প্রতিলিপি পাইয়াছি, তাহা অতি প্রাচীন; কিন্তু লেখক তারিখ না দেওয়ায় প্রতিলিপির প্রাচীনত্ব বলিতে পারিলাম না।

৩। "পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী বিদিত সংসারে। প্রভু অদ্বৈতের অতি অনুগ্রহ যাঁরে।
পরম বৈষ্ণব কর্ম্মোচিত সর্ব্ব কাজ। সর্ব্ব গুণে পরিপূর্ণ রাঢ়ী বিপ্ররাজ॥"—নরোত্তমবিলাস।

ইহারই নাম লোকনাথ।[৪] লোকনাথের মাতার নাম সীতা।[৫] লোকনাথ বাল্যকাল হইতেই ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত। পিতার অভিপ্রায়ানুসারে লোকনাথ অদ্বৈত প্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন।[৬] অদ্বৈতের শিক্ষা ও সঙ্গ গুণে লোকনাথের হৃদয় কর্ষিত ও ভক্তিলতা শীঘ্রই প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই সময়ে গৌরচন্দ্র প্রচারিত প্রেম-ভক্তিতে বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, ভক্তির সুধাধারায় বিরসতা—কঠোরতা ভাসিয়া গিয়াছিল। লোকনাথ বালক হইলেও গৌরাঙ্গের প্রতি তাঁহার চিত্ত এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, একদা যশোহর হইতে একাকী নবদ্বীপে উপস্থিত হন; কিন্তু তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর "বিভোর" অবস্থা। লোকনাথ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তিনি লোকনাথকে অতি কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সঙ্গে থাকিতে দিলেন না, বিলুপ্ত তীর্থপ্রকাশার্থ তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।[৭] বৃন্দাবনে তীর্থপ্রকাশের জন্য বাঙ্গালীর এই সর্ব্ব প্রথম প্রয়াস (১০৭৭ শক)। লোকনাথের বৃন্দাবন যাইবার প্রায় দুই মাস পরেই[৮] শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। লোকনাথ বৃন্দা-বনে গেলেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গসুখে বঞ্চিত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এই জন্য তিনি বিরলে বসিয়া কখন কখন ক্রন্দন করিতেন।[৯]

লোকনাথ অদ্বৈত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত, অদ্বৈত শাখা গণনা-প্রসঙ্গে তাঁহার নাম আছে।[১০] অদ্বৈতের অন্যতম শিষ্য ঈশানদাসও স্বীয় গ্রন্থে একথা লিখিয়াছেন।[১১] কিন্তু মধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় প্রণালীতে দৃষ্ট হয় যে, লোকনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য।[১২] বৈষ্ণব-সমাজ-সম্মত এ সকল "গুরু-প্রণালী"কে অপ্রামাণ্য

৪। "পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি।
লোকনাথ হেন বৃদ্ধ কিরের সন্ততি॥"—ভক্তিরত্নাকর।

৫। "মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী॥"—ভক্তিরত্নাকর।

৬। "লোকনাথ কহে আইনু পড়িবার তরে॥"
"লোকনাথ কহে মোর পিতার সম্মত। শ্রীমদ্ভাগবত পড়া কৃষ্ণলীলামৃত॥"—অদ্বৈতপ্রকাশ।

৭। "যত দুঃখ যত সুখ জানে মোর মন। কেবল আছয়ে সাক্ষী বৃদ্ধ বৃন্দাবন॥
প্রভাতে উঠিয়া তুমি যাহ বৃন্দাবন॥"—প্রেমবিলাস।

৮। "কথা পৌষ মাস আছে মাঘ অৰ্দ্ধ পক্ষে। তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস করিল যেন দেখে॥"—প্রেমবিলাস।

৯। "প্রভু না দেখিব মোরা তোমার কারণ। বলিলাম আজ্ঞা মাত্র করিয়া ধারণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু যে করিলা লীলা। বঞ্চিত করিয়া মোরে এথা পাঠাইলা॥"—প্রেমবিলাস।

১০। "লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারী পণ্ডিত॥"—চৈতন্যচরিতামৃত ১২ পরি।

১১। "এত শুনি লোকনাথ আনন্দিত হৈলা।
গঙ্গা গর্ভে মোর প্রভু স্থানে মন্ত্র নৈলা॥"—অদ্বৈতপ্রকাশ।

১২। প্রেমবিলাসেও শ্রীমহাপ্রভুর নিকট লোকনাথের তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ ও তাঁহাকে লোকনাথের গুরু বলিয়া উল্লেখ আছে; যথা—"গুরু মুখে শুনিলে সব হবেত নির্দ্ধার॥"—প্রেমবিলাস।

বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ এ দুই কথার মূলেই সত্য আছে; অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে আমরা ইহার সমাধান দেখিতে পাই। তাহাতে লিখিত আছে যে, অদ্বৈতচন্দ্র আপন শিষ্য লোকনাথের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি আন্তরিক অত্যাশক্তি দর্শনে তুষ্ট হইয়া তাহাকে শ্রীমহাপ্রভুর হস্তে সমর্পণ করেন; এই হইতেই লোকনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য বলিয়া গৃহীত হন।[১৩]

অদ্বৈত প্রভুর দুই স্ত্রী,—শ্রী ও সীতা;[১৪] ইহারা দুই সহোদরা ভগিনী ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজের উপর সীতা দেবীর অল্প আধিপত্য ছিল না। লোকনাথ গুরুপত্নী সীতাদেবীর জীবন সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা সীতাচরিত্র গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সীতাচরিত্রে গ্রন্থকার আপন পরিচয় সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই। লোকনাথ যেরূপ বিনয়ী ছিলেন, তাহাতে তাঁহা হইতে তদীয় পরিচয় সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়ার প্রত্যাশা করা বৃথা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনার পূর্ব্বে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীগণের অনুমতি গ্রহণ করেন। এই অনুমতি-দানকালে লোকনাথ, কৃষ্ণদাসকে স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার বিষয় কোন কথা লিখিতে নিষেধ করিয়া দেন। ভয়, পাছে সুখ্যাতি হইয়া পড়ে।[১৫] চরিতামৃতে এইজন্য লোকনাথ সম্বন্ধে কিছুই লিখিত হয় নাই। এই লোকনাথ আপনি গ্রন্থে আপনার সম্বন্ধে যে কিছু বলিবেন, এ আশা করা যাইতে পারে না।

সীতাচরিত্র অতি বৃহৎ গ্রন্থ নহে, মোটে দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। গ্রন্থের শেষ এইরূপ—

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥
ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ হৈল সমাপিত।
শ্রীসীতার চরিত্র লিখিল লোকনাথ॥"

এই গ্রন্থে অধ্যায়গুলি নামনির্দ্দেশ পৃথক্ করা হয় নাই। এক একটি ভণিতায়

১৩। "এত কহি প্রভু (অদ্বৈত) ধরি লোকনাথের কর।
উপনীত হৈলা মহাপ্রভুর গোচর॥
প্রভু কহে অহে নিমাঞি কর অবধান।
লোকনাথে শিখাইবা তত্ত্বজ্ঞান॥
এত কহি প্রিয় শিষ্য গৌরে সমর্পিলা।
শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথে আত্মসাথ কৈলা॥"—অদ্বৈতপ্রকাশ ১০ম অধ্যায়।

১৪। "আচার্য্যের ভার্য্যা দুই জগৎপূজিতা।
সর্ব্বত্র বিদিত নাম শ্রী আর সীতা॥"—ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ।

১৫। ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।